জলভাত

তারাপদ রায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ☆ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৫

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—অপরূপ উকিল
মুদ্রণ—ব্লকম্যান প্রেসেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন রায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীসারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯ হতে পি কে পাল কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

বাণী ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে

বিষয়সূচী

ভাগলপুরের পাঞ্জাবী ১
পুজোর বাজার ৩
অপমান ৭
জীবজন্তু ৯
পুজোর ছুটি ১২
ক্রিমিন্যাল ১৪
ফুল ১৯
ফল ২২
ফলাফল ২৪
রবিবারের মহাভারত ২৭
আইনের আঙিনায় ৩০
খাজনা খাজনা, ৩২
বুদ্ধি ৩৫
জবাব ৩৭
চাওয়া পাওয়া ৪০
শাশুড়ি ৪৩
ছুটির দিনের সকাল ৪৫
শিকার কাহিনী ৪৭
ছেলেমেয়ে ৪৯
সুনিদ্রা ৫১
রেলগাড়ি ঝমাঝম ৫৩
মুরগি ৫৬
দেয়া নেয়া ৫৮
পরীক্ষা ৬০
অভিনয় নয় ৬২
হে হিসাব ৬৫
সুখের সন্ধানে ৬৭
মাছ ৭০
কুসংস্কার ৭২
ভালো আছি ৭৫
সুখ অসুখ ৭৮
জুয়া ৮০
ফিচা পিলা ৮২

আবার শৈশবে ৮৫
এসো বসি আহারে ৮৭
শুভ নববর্ষ ৮৯
চিকিৎসা ৯২
রমণী সমাজে ৯৭
চা ৯৯
রামচরণবাবু ১০২
চিড়িয়াখানা ১০৪
স্বপ্ন ১০৬
কলকাতা তিনহাজার তিনশ ১০৯
সমালোচনা ১১৫
কুকুর ও বিয়ার ১১৭
বইমেলা ১১৯
সাশ্রয় ১২২
স্বামী স্ত্রী ১২৫
পুনশ্চ স্বামী স্ত্রী ১২৬
শিকার বিষয়ে ১২৯
ভালবাসার গল্প ১৩১
খাদ্যাখাদ্য ১৩৩
এক সর্দারের গল্প (১) ১৩৫
এক সর্দারের গল্প (২) ১৩৮
এক সর্দারের গল্প (৩) ১৪০
জল ১৪১
বই পত্র ১৪৫
রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭

জলভাত

ভাগলপুরের পাঞ্জাবি

রেলগাড়ির কামরার জানালা দিয়ে অনেক দামদর করে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের হকারের কাছ থেকে একটা চাদর কিনেছিলাম। মধ্য রাত, বোধহয় ভাগলপুর স্টেশন ছিল সেটা, বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা।

ফিকে হলুদ রঙের। বেশ শক্ত বুনোট, লম্বায় চওড়ায় বেশ প্রমাণ সাইজের চাদর সেটা। বেশ একটা মুগা-মুগা ভাব আছে, লোকাল জিনিস, দামও তেমন বেশি ছিল না।

অল্প শীতে বাড়ির মধ্যে বা পাড়ার মধ্যে গায়ে দেওয়ার জন্যে চমৎকার চাদর। এবং তাই ভেবেই কিনেছিলাম।

কিন্তু কলকাতায় এসে যে কি দুর্মতি হলো অবশ্য কারণও একটা ছিলো, তখন সবে মোটা হতে শুরু করেছি, পুরানো জামা-প্যান্ট, পাঞ্জাবিগুলো কেমন টাইট হচ্ছে, ফিট করছে না, সেই ভাগলপুরি চাদরটা দরজির দোকানে নিয়ে সেটা কেটে একটা পাঞ্জাবি বানাতে বললাম।

ক্রমশ মোটা হয়ে যাচ্ছি এই চিন্তা মাথায় রেখে কিন্তু কথায় গোপন করে দরজিমশায়কে বললাম, 'একটু বড়সড় ঢিলেঢালা করে বানাবেন, কাপড়টা স্রিঙ্ক করতে পারে।'

দরজিভদ্রলোক অবশ্য ও জাতীয় নির্দেশের পক্ষপাতী নন, জামাকাপড় একটু চাপা, একটু বেশি ফিট করার দিকে তাঁর ঝোঁক। তিনি আমার অনুরোধ রাখেননি। পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলাম ঢিলেঢালা মোটেই করেননি, বরং একটু টাইটের দিকে।

যা হোক পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতে লাগলাম। এদিকে ঠিক সেই সময়ে আমার দেহে মেদের জোয়ার শুরু হয়েছে। বন্ধুবান্ধব আমার বুদ্ধির প্রশংসা করা আরম্ভ করেছে, বলছে, 'এতদিনে তোর বুদ্ধি খুলছে, তোর মাথার ফ্যাট, ঘিলুর চর্বি গলে শরীরে নামছে।'

বন্ধুবান্ধবের ঠাট্টা, অপমান, কোনদিনই আমি সে সব কিছু গায়ে মাখিনি, তা হলে আমার বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানগম্যি নিয়ে আমি করে খেতে পারতাম না।

বন্ধুদের এই কটুকথার মধ্যে অবশ্য একটা সত্যি ব্যাপার ছিল, দেহের ওজন বাড়লে স্বাভাবিক কারণেই লাফালাফি, দৌড়ঝাঁপ কমে যায়, জীবনে স্থিরতা আসে, ঠান্ডা মাথায় বসে চিন্তা করে কাজ করা যায়, বোকামি কমে।

তখন আমার বোকামি দ্রুত, অতি দ্রুত কমছে। সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন বাড়ছে, ওজনের সঙ্গে তাল রেখে আয়তন মানে প্রস্থ। প্রস্থ এত বাড়ছে যে মনে হচ্ছে, দৈর্ঘ্য কমে যাচ্ছে, আগে লোকেরা আমাকে লম্বা না হলেও বেঁটে ভাবতো না। আমাকে বেঁটে ভাবা তখন থেকেই আরম্ভ।

অফিস-কাছারি করি। সেখানে শার্ট-প্যান্ট পরেই যেতে হয়, সেটাই প্রচলিত

বিধি। আবার অবসরে রবিবার বা ছুটির দিনে কখনো পাঞ্জাবি গায়ে দেওয়ার সুযোগ জোটে।

এই ভাবে প্রথম মাস দুয়েকে দুতিন ঘণ্টা করে পাঁচসাতবার পাঞ্জাবিটা পরিধান করার সুযোগ মিললো।

অবশ্য ওটাকে সুযোগ না বলে দুর্যোগই বলা উচিত। কারণ তখন আমি প্রতিনিয়ত ফুলে ফেঁপে উঠছি। জগু বাজারের মত অকুস্থলে বাঙ্গালি দোকানদারেরা পর্যন্ত আমাকে বাজারে দেখলে, 'আইয়ে শেঠজি' বলে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে।

তখন আমার দমবন্ধ অবস্থা। পেটমোটা ওয়াটারকুলার বোতলের ছিপি হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশির কর্ক যেমন খাপে খাপে ফিট করে যায়, যেমন নিশ্ছিদ্র, না বাতাস—সেই ভাগলপুরি চাদরের পাঞ্জাবিটা সেই ভাবে আমার শরীরে চেপে বসে। দম আটকিয়ে আসে মনে হয় আমি ভীম ভবানী, বুকের ওপর হাতি নিয়েছি। জামার বোতাম আটকাই না, শুধু হাঁসফাঁস করি। অথচ নতুন পাঞ্জাবি, ফেলেও দিতে পারি না।

ভাগ্য ভালো, এই দু মাসের ব্যবহারে পাঞ্জাবিটা বেশ মলিন হয়েছিলো, সুতরাং এটি একদিন আমার সুলক্ষণা স্ত্রীর নজরে পড়লো তিনি সেটা ধোপাবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

সপ্তাহ খানেক বাদে ধোপাবাড়ি থেকে পাঞ্জাবিটা ফেরত এলো। ফিকে হলুদ ফিকেতর হলুদ হয়েছে তবে সর্বত্র নয়। একটু চিতাবাঘ চিতাবাঘ ভাব সেই সঙ্গে বুনোটটা আর তত জমজমাট নয় কেমন ঝ্যালঝেলে মনে হলো। ভয় হলো হয়তো আরও ছোট হয়ে গেছে।

পরের রবিবার দিন সকালবেলায় বাসায় এক সম্পাদিকার আসার কথা ছিলো, তাঁর সৌজন্যে ভয়ে ভয়ে ভাঁজ ভেঙে পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে দেখলাম, কতটা ছোট হয়েছে, গায়ে দেওয়া যাচ্ছে কি না। কিন্তু কি আশ্চর্য, পাঞ্জাবিটা মাথায় গলিয়ে গায়ে চাপিয়ে, আবিষ্কার করলাম মোটেই টাইট নয়। চমৎকার ঢিলেঢালা, হৃদয় থেকে নাভির মধ্যে চমৎকার বাতাস খেলছে।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে উঠলাম, ধরে নিলাম আমার মেদ ঝরছে, ওজন কমছে, আয়তন কমছে। গলির মোড়ের ওষুধের দোকানে একটা ওজনের মেশিন বসিয়েছে, সেখানে ছুটে গিয়ে গর্তে একটা আধুলি ঠেলে ওজন নিলাম। কিন্তু এ কি? আমার ওজন আরো দু কেজি বেড়েছে। তা হলে?

তা হলে? ব্যাপারটা বুঝলাম আর দেড়মাস পরে। ততদিনে ঐ পাঞ্জাবি আমার শরীরে আবার প্রায় প্রকৃতিদত্ত চামড়ার মত টাইট হয়ে বসে গেছে। অর্থাৎ আমি আরো প্রসারিত হয়েছি।

এদিকে পাঞ্জাবিটা আবার ময়লা হয়েছে, দেড় মাসের মাথায় ধোপাবাড়ি থেকে আরেকবার কেচে আসতে গায়ে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখলাম আমার শরীরে সুন্দর গলে যাচ্ছে, বেশ ঢিলেঢালা যেমন আমার পছন্দ। আমার মেদাধিক্য এবং ভুঁড়ি দুইই বেশ ঢাকা পড়েছে। কাচতে দেওয়ার আগের সেই টাইট অবস্থাটা আর নেই

তবে একটা অসুবিধে হয়েছে জামার ঝুল এবং সেইসঙ্গে হাতা দুটো খুব বেড়ে গেছে। আজকাল লম্বা ঝুল পাঞ্জাবি চলছে, সে যাহোক, কিন্তু হাতা দুটো প্রায় ছয় ইঞ্চি বেড়ে গেছে, একসঙ্গে হাতা ও দস্তানার কাজ করছে, তার মধ্য থেকে হাত দুটো বের করে আনা বেশ কঠিন। কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে গৃহিণী সে সমস্যা দূর করলেন।

ইতিমধ্যে আমার মনে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। পরের বারে পাঞ্জাবিটা ধোপার বাড়িতে না পাঠিয়ে এক ছুটির দিনের সকালে আমি নিজেই কাচলাম। কেচে একটা হ্যাঙ্গারে করে তারে ঝুলিয়ে দিলাম।

এর পর কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম পাঞ্জাবি বেড়ে যাচ্ছে, ধীরে ধীরে ঝুল এগোচ্ছে, হাত লম্বা হচ্ছে। বিকালে শুকোনোর পর গায়ে দিয়ে দেখি আমার মোটা হওয়ার সঙ্গে তাল রেখে পাঞ্জাবিটা বেড়েছে, একটু বেশিই বেড়েছে, একটু ঢিলেই হয়েছে, যেটা আমার পক্ষে বেশ ভালো।

ইতিমধ্যে গত কিছুকাল ধরে আমি প্রবল স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়েছি। কত দামি দামি সৌখিন জামাকাপড় ছোট হয়ে গেছে, বরবাদ হয়ে গেছে।

কিন্তু পাঞ্জাবিটা আছে। ঝুল এখন সেমিজের মত প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত, আলখাল্লাই বলা চলে তবে হাতা দুটো প্রত্যেকবার কাচার পরে তিন ইঞ্চি করে ছেঁটে নিই, না হলে একটু অসুবিধা হয়।

পুজোর বাজার

পুজোর বাজারে পুজোর লেখাই লিখতে হবে তেমন কোনও কথা নেই। আর আমি ঠিক সেরকম বাঁধাধরা জাতের লেখকও নই, যা ইচ্ছে যেমন ইচ্ছে উলটো-পালটা বাজে লেখাতেই আমার বেশি ফূর্তি। বেশি আনন্দ।

তবু শিরোনামের অমর্যাদা করা উচিত হবে না। বাজারটা অল্প একটু ছুঁয়ে যাই।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন। বলবান স্বামী সদ্যকেনা সামগ্রীসমূহসমেত ক্ষীণপ্রাণা অর্ধাঙ্গিনীকে দুই সমর্থ বাহুতে জাপটিয়ে ধরে ঝাঁপিয়ে রাস্তায় এসে পৌঁছেছেন। স্ত্রীর হাতে দলামোচড়া-পাকানো কয়েকটি নোট, বোধহয় শেষ দোকানের ভাঙানি।

বাইরে বেরিয়ে এসেই স্ত্রীর হাত থেকে ছোঁ মেরে টাকাগুলো তুলে নিলেন পতিদেবতা এবং হঠাৎ একটি দশ টাকার নোটের দিকে বেঞ্চে একটু জিরনোর জন্যে বসে ভাবলাম এই গরমের বাজারে চা না খেয়ে বরং লস্যি বা সরবত জাতীয় ঠাণ্ডা কিছু খাই।

সর্দারজিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সর্দারজি ঠাণ্ডা কিছু আছে?' একটু চিন্তা করে সর্দারজি জানালেন, 'কাল রাতে ভাজা ঠাণ্ডা সিঙ্গাড়া আছে।'

অগত্যা চায়ের অর্ডার দিলাম।

কিনেছি, ভদ্রলোকের এই বাতুল প্রশ্ন শুনে বললাম, 'সে কি করে সম্ভব?'

একটু থেমে, একটু হেসে ভদ্রলোক আবার আমাকে বললেন, 'ভাবতে পারেন টাকায় আধ ডজন করে আনারস। পাকা মিষ্টি দিশি আনারস।'

আমার চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, এ ভদ্রলোকের হাত এড়ানোর জন্যে তাড়াতাড়ি উঠতে যাচ্ছি হঠাৎ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড়দা এত তাড়াতাড়ি কিসের, একবার ভাবনু না আড়াই তোলার একটা সোনার বিছেহার ষাট টাকা দাম। দোকানদার 'আয়' 'আয়' করে ডাকছে।'

অবশেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম, 'এসব কোথায়? কবেকার কথা বলছেন?' এলোমেলো ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তা জেনে করবেন কি। শুধু ভাবুন, একবার মনে মনে ভাবুন পাঁচ টাকা জোড়া ইলিশ, ফিনলের ধুতি সাড়ে তিন টাকা, সোনা বাইশ টাকা তোলা, ভাবুন আরও ভাবুন এই পুজোর বাজারে মন ভাল হয়ে যাবে। মনের মধ্যে শিশির ভেজা শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসবে। মন ভাল হয়ে যাবে।'

মন ভাল হওয়ার গল্পটা তেমন জমল না। তাই না?

অতঃপর পুজোয় কলকাতা ভ্রমণের একটা গল্প বলি।

রামলোচন সিং এবং মহম্মদ মোকাররম হোসেন পুজোর বাজারে কলকাতায় আসেন সুদূর আরা জেলা থেকে। তাঁরা আসেন ট্রামে বাসে পকেট মারতে। তাঁদের বিশেষ কোন দোষ নেই। পুরুষানুক্রমে তাঁরা কলকাতায় পুজোর মরসুমে আসেন। তাঁদের বড় থেকে বড় ঠাকুরদা আসতেন গাঁট কাটতে, গঙ্গায় ভাড়াটে নৌকো করে আসতেন সুতানটি কিংবা চেতলার হাটে।

কালক্রমে তাদের ঠাকুরদা আসতেন কিঞ্চিৎ হেঁটে কিঞ্চিৎ এক্কায় এবং বাকিটুকু রেলগাড়িতে, তিনি গঙ্গা পার হয়ে সোজা বড়বাজারে চলে যেতেন জোব্বা কাটতে।

রামলোচনের ঠাকুরদা ক্ষণজীবী ছিলেন। জোব্বা কাটার যুগেই তাঁর জীবনাবসান হয়। কিন্তু মোকাররম হোসেনের পিতামহকে এক জীবনে জোব্বা কাটা থেকে পিরানকাটায় পরিণত হতে হয়।

ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। জোব্বার চেহারাটা লম্বাচওড়া, ঢিলেঢালা, একদম উনবিংশ শতাব্দীর মত। হৃদপিণ্ডের একটু নিচে ছড়ানো, প্রশস্ত একটাই পকেট জোব্বার।

কিন্তু পিরান নিয়ে বড় সমস্যা। তার বাঁয়ে, ডাইনে, বুকে, বুকের ডান পাশে বাঁ পাশে, ভিতরে পকেটের পর পকেট। কোন পকেটে সুগন্ধি আতরমাখানো লাল তুলোট কাগজে সৌদামিনী দেব্যার 'যাও পাখি বলো তারে' চিঠি ভাঁজ করে রাখা আছে, কোন পকেটে আছে লম্বা ফর্দ সিঁথির সিঁদুর থেকে পায়ের আলতা পর্যন্ত, কিংবা চাবির তোড়া বা রুমাল। ধরাই কঠিন টাকাপয়সা বা দামী জিনিস পিরানের ঠিক কোন পকেটে আছে, অথচ জোব্বার ছিল মাত্র একটা পকেট, সহজেই লক্ষ্যভেদ করা যেত।

সে যা হোক জোব্বাকাটা, পিরানকাটা যুগও বহুদিন অবসান হয়েছে। এখন

চলেছে সরাসরি পকেটকাটার যুগ। কোটের পকেট, প্যান্টের পকেট, পাঞ্জাবির পকেট, পাজামার পকেট, শালোয়ারের পকেট, কামিজের পকেট, ফ্রকের পকেট, পেটি-কোটের পকেট আরও কতরকম কত খারাপ খারাপ জায়গায় খারাপ খারাপ পকেট।

পুজোর মরসুমে সারা ভারতবর্ষ আর বাংলাদেশ থেকে ব্যাপারি, ভিখিরি, বাঈজী, বেশ্যা, চোর, জোচ্চোর, পকেটমার তাদের তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় ছুটে আসে। ভিড়ের শহরে যে যার ব্যবসা পুরোদমে চালায়। আমাদের এই উপকাহিনীর রামলোচন এবং মোকাররমও আসে, ব্যবসা চালায়।

এরা দুজনেই দক্ষ কারিগর। তাছাড়া আরা জেলার পকেটমারেরা একটু সাব-ধানীও বটে, চট করে তারা ধরা পড়ে না।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বিপরীত। নেহাতই চাকরির প্রয়োজনে আমি কয়েকবছর কারা কল্যাণ পরিদর্শক সমিতির মেম্বার ছিলাম, মানে মাসে একবার দেখতে যেতে হত কারাবাসী মহাজনদের সুখ-সুবিধের কোনও অন্তরায় আছে কিনা, তাদের কোন অভিযোগ আছে কিনা।

পরপর কয়েকবছর শীতকালে জেলখানায় রামলোচন আর মোকাররমের সঙ্গে দেখা হল। রীতিমত চেনা পরিচয় যাকে বাংলায় বলে 'জানপয়ছান' তাই হল।

তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পরে অবশেষে একদা জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা প্রত্যেকবার জেলে আসেন? প্রত্যেকবার ধরা পড়ার জন্যে সেই আরা থেকে কলকাতায় আসেন?

দুজনেই মিটমিট করে হেসে যা বললেন, তার গূঢ়ার্থ হল, 'বাবুমশায়, আমরা ধরা পড়ি না, ধরা দিই।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। তখন তাঁরা বুঝিয়ে বললেন তাঁদের যা কাজ কারবার সেসবই মহালয়া থেকে শ্যামাপুজোর মধ্যে শেষ হয়ে যায়, যা কিছু আয় উপার্জন হয় এই একমাসে, সব বিশ্বস্তসূত্রে দেহাতে পাঠিয়ে তাঁরা অবশেষে একদিন পুলিসের কাছে খেলাচ্ছলে ধরা দেন।

কিন্তু কেন?

পকেটমার মহোদয় বললেন, আরায় বড় শীত। পকেটমারিতে জেল হয় তিনমাস। একমাস বিচার। সবসুদ্ধু নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি এই চারমাস কলকাতার জেলে উষ্ণ আরামে কাটিয়ে ঠিক ফসল কাটার মরসুমে তাঁরা বাড়ি ফেরেন। সবচেয়ে বড় কথা এই চারমাস তাঁদের কোন খাইখরচা, থাকা খরচা, কিছুই লাগে না।

পুনশ্চ ঃ

অবশেষে একটা সত্যিকারের লোমহর্ষক গল্প বলি।

এই শরতে এক বিদেশি আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিলেন। খাঁটি বিলিতি ইংরেজ সাহেব।

কলকাতার তিনশ বছরের কি একটা ব্যাপার নিয়ে এই শহরে আজ কিছুদিন হল, ঘুরঘুর করছেন। স্বভাবতই ঐতিহাসিক নিশীথরঞ্জন রায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গেও হয়েছে। আর বিদেশিরা কলকাতায় এলে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তো একবার দেখা করবেই কিংবা দেখা করার চেষ্টা করবেই।

এইসব প্রধান রায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তিনি যখন জানলেন যে আমারও পদবি রায়, তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন, এত 'রায়' কেন, এত 'রায়' পদবি কোথা থেকে এল।

আমি অনায়াসে আমার আশ্চর্য ইংরেজিতে সাহেবকে বোঝাতে পারতাম যে 'রায়' ঠিক পদবি নয়, 'রায়' হল উপাধি। মুসলমান আমল থেকে চলে আসছে খুব সম্ভব নবাবদের দেওয়া উপাধি ইত্যাদি কথা সাহেবকে বলতে পারতাম।

কিন্তু তা করিনি। সাহেবকে একটা ট্যাক্সিতে করে গরচায় নিয়ে গেলাম। সেখানে একটা ছোট কারখানা করেছে আমার এক জ্ঞাতিভাই।

কারখানার নাম 'রায় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি'। বেশ বড় বড় করে ইংরাজিতে সাইনবোর্ড লেখাঃ 'RAY MANUFACTURING COMPANY'

একটু দূরে ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে, গাড়ির জানলা দিয়ে অঙ্গুলিনির্দেশ করে সাহেবকে সাইনবোর্ডটা দেখালাম। অনেক সাহেবরা একটু মাথামোটা হয়, তাই ভাল করে বুঝিয়ে বললাম, 'ঐ হল রায় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি, এবার বুঝতে পারছ তো এত রায় কোথা থেকে আসে?'

এই পুজোর বাজারে পুনশ্চের পরেও একটা ঘটনা বাকি থেকে যাচ্ছে। এইমাত্র শুনলাম আমার ভাই বিজনের কাছ থেকে, সে কলেজ স্ট্রিটে গিয়েছিল এক-জোড়া চটি কিনতে।

ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত, ছেঁড়া জামা, উড়ুক্কু চুল দুই রঙের দুইপাটি চটি তার মধ্যে একটা লেডিস চটি কোলে করে বিজন বাড়ি ফিরল।

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বিজন বলল, 'দাদা, এই পুজোর বাজারে অনেক লোক পাগল হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তা তো হবেই, কিন্তু তোমার মাথার কি অবস্থা।'

বিজন বলল, 'আমার মাথার কথা বাদ দাও, এইমাত্র কলেজ স্ট্রিট ডাবপট্টিতে একসঙ্গে দুটো পাগল দেখে এলাম।'

আমি বললাম, 'তারা কি করছে? কি করে বুঝতে পারলে তারা পাগল?'

বিজন চমৎকার বলল, 'পাগল না হলে একটা লোক একশ টাকা নোটের তাড়া হাতে নিয়ে একটা একটা করে নোট রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে! আর অন্য লোকটা সেই নোটগুলো বারবার কুড়িয়ে ফেরত এনে তাকে দেয়! প্রথম লোকটা আবার ছোঁড়ে দ্বিতীয় লোকটা আবার ফেরত দেয়।'

আমি বললাম, 'কেন এরকম করছিল তারা?'

বিজন বলল, 'পুজোর বাজার। পাগল হয়ে গেছে।'

অপমান

…অপমানে হতে হবে
তাহাদের সবার সমান'…
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের এই বহুখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি পাঠ করেনি এবং শোনেনি এমন বঙ্গভাষী খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকেই ছাত্রজীবনে পরীক্ষার খাতায় এই পঙ্‌ক্তির ব্যাখ্যা লিখেছেন, এখনো হয়তো অনেকের মুখস্থ আছে সম্পূর্ণ অণুচ্ছেদটি, হয়তো বা পুরো কবিতাটিই।

'অপমানিত' নামের এই কবিতাটি শুধু বাংলাতেই নয়, ভাষান্তরিত হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও যথেষ্ট সুপরিচিত।

এই কবিতার মূল কথা ছিল—"যাকে তুমি নিচে ফেল সে তোমাকে নিচে বাঁধবে, তুমি যাকে পেছনে রেখেছ সে তোমাকে পেছনে টানছে"।

সবাই জানেন, এই 'তুমি' কোনো মানুষ নয়, এখানে সমাজের কথা বলা হয়েছে। এই সামান্য তরল রচনায় সমাজ নিয়ে কোনো রসিকতা করার সাহস আমার নেই, বিশেষ করে যেখানে রবীন্দ্রনাথকে প্রথমেই জড়িত করে ফেলেছি।

আমি বরং ব্যক্তিগত মান-অপমানের তুচ্ছ কাহিনীতে যাই ; সেখানেও অবশ্য অপমানিত লোকটিকে যতক্ষণ চেনা না যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্তই আমি নিরাপদ।

প্রথমে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে এক রাজনৈতিক নেতাকে স্মরণ করি। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় একটি সাহিত্যসভায় আমরা কিছু না বুঝে ভুল করে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম।

গিয়ে দেখি এই বিতর্কিত নেতা, মেধার থেকে পেশীর জন্যেই যিনি বেশি পরিচিত, তিনি সেই সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

যেমন হয়, আমাদের সঙ্গে নেতা ভদ্রলোক অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন, আমরা তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ হলাম। তাঁর বিষয়ে আমাদের মনে-মনে যে একটা ভুল ধারণা ছিল তার জন্যে মনে-মনেই লজ্জিত বোধ করলাম।

সে যা হোক, আসল ঘটনা অন্য। আসল ঘটনা হল ভদ্রলোকের বক্তৃতা। আমাদের সুস্বাগতম জানিয়ে ভদ্রলোক উদ্বোধনী বক্তৃতায় বললেন, 'আপনারা এত গুণীজন এখানে এসেছেন, সেজন্যে সামান্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপনাদের অপমান করতে চাই না।'

এবং ঠিক পরেই তিনি বললেন, 'আমি আপনাদের প্রত্যেককে শতশত ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

জানি না, সেদিন আমরা সত্যি-সত্যি অপমানিত হয়েছিলাম কিনা।

কিন্তু আমরা তো এমন অনেক লোককে জানি, যাঁরা কোনোদিন অপমানিত হননি। কেউ তাঁদের কোনোদিন অপমান করতে পারবে না। তাঁদের অপমানবোধই নেই।

এই সূত্রে একটি পুরনো চিঠি আগাগোড়া উদ্ধৃত করছি। এটি ঠিক হাসির নয়, একটি করুণ কাহিনী

শ্রীদুর্গা শরণম্

কলিকাতা

৭ই ভাদ্র

প্রিয় গদাধর,

কলিকাতায় আসিবার পর গত আড়াই মাস নানা কারণে আমি তোমাকে কোনো পত্র দিতে পারি নাই।

ইহার মানে এই নয় যে আমি তোমাদের ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু যাহাকে বলে "মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল" ও আমার সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

এখানে জয়রামবাবুর বাড়িতে যখন আমি বাজার সরকারের চাকুরি লইয়া আসিলাম, তুমি সকলই জান, আশা ছিলো বেতন কম হইলেও সৎভাবে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক।

এখানে আসিবার দুই-তিনদিনের মধ্যে ইহাদের ব্যবহারে আমি তাজ্জব হইয়া গিয়াছি। ইহারা কী চায়, কিছুই বুঝিতে পারি না।

একদিন বড়ো বড়ো বেগুন আনিলাম, খুব রাগারাগি করিল, বড়ো বেগুন যেন বিষ। পরের দিন ছোটো ছোটো আলু আনিলাম, আলুর ব্যাগ রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

অন্যান্য ব্যাপার আরো জটিল। একদিন এ-বাড়ির বড়ো গিন্নিমা সন্ধ্যে-বেলা আমাকে সদরের দরজা ভেজাইয়া দিতে বলিলেন। আমি জানি ইহা আমার কাজ নয়, সুতরাং নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গলির মোড়ের টিউবওয়েল হইতে চারি বালতি জল আনিয়া বাহিরের দরজা ভেজাইলাম, সে বড়ো গিন্নিমার আদেশ বলিয়াই। কিন্তু ইহার পরিণাম কী হইল? বাড়ির সমস্ত লোক, এমন কি ঝি-চাকর পর্যন্ত উল্লুক, বেল্লিক, গাধা বলিয়া গালাগাল করিতে লাগিল।

এইরকম অনবরত চলিতেছে।

সেদিন বিকালে ছোটসাহেব একজোড়া কোট-প্যান্টলুন তাড়াতাড়ি ধোপার বাড়ি হইতে ইস্তারি করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। বলিলেন, সন্ধ্যেবেলা পার্টি আছে, এই পোশাক পরিয়া যাইবেন। আমি কী করিয়া জানিব বাড়ির সামনের কাঁচের জানালা-দরজা দেওয়া দামী দোকানে জামাকাপড় ইস্তারি করা হয়। আমি রাস্তায় রাস্তায় ভাঁটিখানা খুঁজিলাম, কিন্তু কোথাও দেখিতে না পাইয়া অবশেষে বহু পথ ঘুরিয়া, বহু পথ ঘুলাইয়া চেতলা হইতে রাত বারোটা নাগাদ কোট-প্যান্ট ইস্তারি করিয়া যখন পরিশ্রান্ত, ঘর্মাক্ত, অভুক্ত অবস্থায় আসিয়াছি তখন ছোটোসাহেব অন্য এক পোশাকে, (সেটি কিঞ্চিৎ ময়লা, দোমড়ানো) পার্টি হইতে টলিতে টলিতে ফিরিতেছেন। হঠাৎ আমাকে ধোপদুরস্ত টাটকা ইস্ত্রি-করা কোট-প্যান্ট হাতে সম্মুখে দেখিয়া তিনি কেমন উত্তেজিত হইয়া শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলিতে লাগিলেন। বাচ্চা তবু পূর্বে শুনিয়াছি,

ছোটোসাহেব আরো কিছু-কিছু অশ্রাব্য শব্দের পুত ও ভাই বলিয়া আমাকে সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

ভয়াবহ ঘটনা ঘটিয়াছে পরশুদিন, ৫ই ভাদ্র, শনিবার সন্ধ্যেবেলা। প্রতি শনিবার এ-বাড়িতে বড়োসাহেব পার্টি দেন। একতলার বাইরের ঘরে পার্টি হয়। আট-দশজন লোক আসে, মদ খাওয়া হয়। আমি বাড়ির মধ্যে রান্নাঘর হইতে মাছভাজা, মাংসের বড়া এইসব আনিয়া দিই। ফ্রিজ খুলিয়া সোডা, বরফ, জল।

পরশুদিন রাত্রিতে হঠাৎ সোডা ফুরাইয়া গেল। বড়োসাহব আমাকে রাস্তার দোকান হইতে সোডা আনিতে বলিলেন। আমি বুদ্ধি করিয়া বড়োবাবুকে খুশি করিবার জন্য আইসক্রিম সোডা আনিলাম। আমি যদিও কোনোদিন মদ খাই নাই ; সোডা খাইয়া দেখিয়াছি, সোডা অতি বিস্বাদ। একদিন আইসক্রিম-সোডা খাইয়াছিলাম, খুব ভালো লাগিয়াছিল। তাই যত্ন করিয়া আইসক্রিম-সোডা আনিয়া বড়োসাহেব ও তাঁহার ইয়ারদের পানীয়ের গেলাসে ঢালিয়া দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে তাহারা খেপিয়া গেল। ওয়াক থুঃ, ওয়াক থুঃ করিতে লাগিল। উহারা নাকি হুইস্কি খাইতেছিল। হুইস্কির সঙ্গে আইসক্রিম-সোডা মিশাইয়া খাইলে নাকি বমি আসে। যখন সবাই জানিতে পারিল আইসক্রিম-সোডা আমিই আনিয়াছি, সবাই আমাকে তাড়া করিয়া আসিল। এক মাতাল স্টুপিড, স্কাউন্ড্রেল বলিয়া আমার কান মলিয়া দিল। বড়োসাহেব নিজে পা হইতে চপ্পল খুলিয়া সেই চপ্পল আমার মুখে মারিয়া ঠোঁট ফাটাইয়া দিলেন।

ভাই গদাধর, আর কি লিখিব। সবই তো বুঝিলে। ইহারা আমাকে অহর্নিশি গালাগাল করিতেছে। "শুয়োরের বাচ্চা," "পুঙ্গির পুত" এইসব বলিতেছে, জুতা মারিয়া ঠোঁট ফাটাইয়া দিয়াছে।

আমি ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তায় আছি। ইহার উপরে ইহারা আবার আমাকে অপমান না করে। যতই কষ্ট হউক, গদাধর, তুমি আমাকে জানো, অপমান করিলে আমি এই কাজ তখনই ছাড়িয়া দিব।

না-খাইয়া থাকিব তবু ভালো, তবু অপমানিত হইয়া কাজ করিব না।

ইতি

তোমার বন্ধু

ভবনাথ

জীবজন্তু

জীবজন্তু নিয়ে রসিকতার গল্পগুলি অধিকাংশই নেহাতই আজগুবি।

রূপকথা কিংবা ঠাকুরমার ঝুলির জন্তুজানোয়ারেরা যেমন মানুষের মতো কথা বলতে পারে, হাল্কা গল্পের পশুপাখিও তাই।

তবে আমরা আপাতত সরাসরি শুধু পশুপাখির গল্পে যাচ্ছি না। যেসব গল্পে পশুপাখির সঙ্গে মানুষ জড়িত আছে, সে গল্পগুলোকেই বলছি।

প্রথমে গল্প নয়, একটা সাবেকি ধাঁধা স্মরণ করি।

উটপাখির গলা অত লম্বা কেন ?

এই প্রশ্নের সরলতম উত্তর হল উটপাখির মাথাটা শরীর থেকে এত দূরে যে তার গলা অত লম্বা না হলে শরীরের সঙ্গে মাথা জুড়ে থাকত না।

যেমন এক ধরনের বেঁটে জাতের কুকুর আছে যাদের পা খুব ছোটো ছোটো। এই কুকুরের ব্যাপারটা উটপাখির ঠিক উল্টো। কচ্ছপের মতো ছোটো পা। তাই দেখে কুকুরের মালিককে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার কুকুরের পা এত ছোটো যে নেই বললেই চলে।'

কুকুরের মালিক গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'তা বলছেন কেন? যতটুকু লম্বা হওয়া প্রয়োজন তা তো আছে, পাগুলো মেঝে তো ছুঁয়েছে।'

এই কুকুরটিই একবার হারিয়ে গিয়েছিল। প্রিয় কুকুরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে কুকুরের প্রভু এপাশে-ওপাশে চারিদিকে সেটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

অবশেষে যখন কিছুতেই কুকুরের খোঁজ পাওয়া গেল না, এক শুভানুধ্যায়ী পরামর্শ দিলেন, 'আপনি একটা কাজ করুন, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখুন।'

কুকুরের মালিক ভদ্রলোক বিরাগকণ্ঠে বললেন, 'তাতে আর লাভ কী হবে? আমার কুকুর তো আর পড়তে পারে না।'

ঠিক এই জাতের আর-একটা গল্প আছে।

সে গল্পে এক ভদ্রমহিলা তাঁর বেড়ালের দুধ খাওয়ার জন্যে একটা কাঁসার বাটি কিনতে গিয়েছিলেন দোকানে। তিনি অনেক বাছাই করে চমৎকার একটি পদ্মকাটা রেকাবি কিনলেন তাঁর বেরালের জন্যে। দোকানদারকে এ-কথা বললেনও যে, 'এই রেকাবিটা কিনেছি আমার পোষা বেড়ালের জন্য।'

দোকানদার তাই শুনে বললেন, 'আপনার এত আদরের বেড়াল, নিশ্চয়ই তার একটা নাম আছে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তা থাকবে না কেন? আমার বেড়ালের নাম পুঁটিরানী।'

তখন দোকানদার বললেন, 'চমৎকার নাম আপনার বেড়ালের। পুঁটিরানী নামটা রেকাবির গায়ে লিখিয়ে দেব! পঞ্চাশ পয়সা করে চার অক্ষরে মাত্র দুটাকা লাগবে।'

ভদ্রমহিলা কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'না। নাম লেখার দরকার নেই। আমার বেড়াল তো পড়তে-টড়তে মোটেই পারে না।'

কুকুর-বেড়াল কেন, কোনো জন্তুই পড়তে পারে না। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু গৃহপালিতই হোক অথবা বুনো জন্তুই হোক, তাদের অশিক্ষিত বলা যাবে না। তাদের জীবনচর্চা মানুষের চেয়ে বহুক্ষেত্রেই অনেক পরিচ্ছন্ন।

ওয়ালট হুইটম্যান বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় জীবজন্তুর সঙ্গে আমি বেশ বসবাস করতে পারব, থাকতে পারব। তারা কেমন নির্লিপ্ত ও আত্মনির্ভর। আমি অনেক সময় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করি। তারা কখনো কী হবে, কী হতে পারে—তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। রাতের ঘুম বিসর্জন দিয়ে অন্ধকার বিছানায়

জেগে থাকে না, নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে পরিতাপ করে না। তারা কখনোই অসন্তুষ্ট নয়, তারা কিছু জমায় না, কিছু নেই বলে তারা দুঃখিতও নয়।'

এতখানি জ্ঞানগর্ভ কথার পরে এবার ঘোড়ার গল্পে যাই। ঠিক ঘোড়া নয়, বলা উচিত মানুষের গল্প।

এক ঘোড়ার মালিকের পোষা ঘোড়াটি বুড়ো হয়ে যাওয়ার জন্যেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, কিছুতেই চলতে চায় না। ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে টুকুস-টুকুস করে চলে। ঐ যাকে বেতো ঘোড়া বলে তাই আর কি।

অবশেষে একদিন ঘোড়ার মালিক ঘোড়াকে নিয়ে গেল পশু চিকিৎসকের কাছে। পশু চিকিৎসক জানতে চাইলেন, 'এর হয়েছেটা কী?' ঘোড়ার মালিক বলল, 'তা আমি বলতে পারছি না। একটু বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু তাছাড়া আর-কিছু অসুখ তো দেখতে পাচ্ছি না।'

পশু চিকিৎসক বললেন, 'ঠিক আছে, কোনো চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি। আমি একটা স্পেশাল টনিক বানিয়েছি, সেটা এক চামচে খাওয়ালেই ভালো হয়ে যাবে।'

যে কথা সেই কাজ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে এক চামচে স্পেশাল টনিক মুখে পড়ামাত্র ঘোড়াটা চিঁহিহি হ্রেষাধ্বনি করে বিদ্যুদ্‌বেগে ছুট লাগাল। সে তার যৌবনেও কোনোদিন এত জোরে ছোটেনি।

ঘোড়ার মালিক সেই দৃশ্য দেখে চমৎকৃত হয়ে পশু চিকিৎসককে বলল, 'আপনার ওষুধের দাম কত?'

পশু চিকিৎসক বললেন, 'এক চামচে টনিক দশ টাকা লাগবে।'

ঘোড়ার মালিক পকেট থেকে তিরিশ টাকা বার করে পশু চিকিৎসককে দিয়ে বলল, 'আর দু চামচ আপনার ঐ স্পেশাল টনিক আমাকে দিন, আমাকে যে এখন ছুটে গিয়ে ঘোড়াটা ধরতে হবে। এর মধ্যে সেটা কতদূর চলে গেল কে জানে। ওর ডবল জোরে দৌড়তে হবে।'

অবশেষে ভেড়ার গল্প। এ গল্পটাও পুরানো।

একটি ছেলে তার বাবার সঙ্গে কলকাতার ময়দানে বেড়াতে গেছে। যেমন হয়, এক জায়গায় দলবেঁধে অনেকগুলো ভেড়া চরছে।

ছেলে অনেকক্ষণ ধরে নানারকম বায়নাক্কা করছিল। আইসক্রিম খাব, বাদাম কিনব, বাঁদরনাচ দেখব ইত্যাদি। ছেলেকে অন্যমনস্ক করার জন্য বাবা বললেন, 'গোনো তো কটা ভেড়া আছে।'

ছেলে মন দিয়ে গুনছে তো গুনছেই, গোনা আর শেষ হয় না। বাবা বিস্মিত হলেন, ভেড়ার সংখ্যা তো বেশি নয়, এত সময় লাগছে কেন গুনতে।

অবশেষে ছেলেটি বলল, 'একত্রিশটা ভেড়া আছে।'

বাবা বললেন, 'মাত্র একত্রিশটা ভেড়া গুনতে তোমার এত সময় লাগল?'

ছেলে বলল, 'আগে ভেড়াগুলোর পায়ের সংখ্যা গুনে বার করলাম একশো

চবিশটা। তার পরে সেটাকে চার দিয়ে ভাগ করে পেলাম একত্রিশটা ভেড়া।'

পুজোর ছুটি

সেই যে অনেকদিন আগে ছোটদের কাগজের এক পুজো সংখ্যায় কে এক-জন ছড়াকার ইনিয়ে বিনিয়ে লিখেছিল।

'জানেন ছোটবাবু
আমার ছুটি নাই।'

সেই লোকটা ছড়া লিখে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি, কিন্তু তার ছড়ার এই ভাঙা পংক্তি দুটো এখনও আমার মাথার মধ্যে ঘোরে। বিশেষ করে যখন বৃষ্টিধোয়া ঝলমলে নীল আকাশে মাথানড়া তুলোর পুতুলবুড়োর সাদা চুলের মতো মেঘ আর পুরনো দিনের কটন মিলের নতুন ধোলাই ধুতির মতো ধবধবে ফিনফিনে সাদা রোদ, সেই সঙ্গে বাতাসে উত্তরের হিম আভাস আমার কেমন যেন মনে হয় এ জীবনে ছুটি বড় কম, এমন ভালো ভালো দিন হেলায় চলে যাচ্ছে।

ইয়োর অনার, মি লর্ড, উকিলবাবু, ব্যারিস্টার সাহেব আমি আপনাদের হিংসে করি। মাস্টারমশাই, প্রফেসার স্যার আমি আপনাদের ঈর্ষা করি।

কত দীর্ঘ শারদীয় অবকাশ আপনাদের, আশ্বিনের আশ্চর্য দিনগুলি, তার শিউলির সৌরভ, শিশিরের স্নিগ্ধতা, তার আলোছায়ার কারুকাজ—সবই শুধু আপনাদের জন্যে। আমাদের জন্যে ভিক্ষুকের ভাঙা এনামেলের তোবড়ানো বাটিতে পয়সা ছোঁড়ার শব্দের মতো টুংটাং সামান্য দু'চারদিন।

ইংরেজ কবি এপ্রিল মাসের কথা বলেছিলেন, বলেছিলেন, এপ্রিল হলো নিষ্ঠুরতম মাস। সাদা বাংলায় এপ্রিল নয়, আশ্বিন হলো নিষ্ঠুরতম মাস। মনে হয়, এই বুঝি সব ফিরিয়ে দিলো, যা কিছু হারিয়ে গিয়েছিল জীবন থেকে। যা কিছু ভুলে গিয়েছিলাম, গন্ধময় কুসুম, শুভ্রতাময় মেঘ, হাস্যময় রোদ আর স্নেহময় শিশির—সবই ঘরের কাছে পেঁছে দেয় আশ্বিন কিন্তু পাওয়ার আগেই সব কিছু মিলিয়ে যায়, বেজে ওঠে ছুটি শেষের ঘণ্টা, তালা খোলে অফিসের দরজার।

পুজোর ছুটি মানেই বেড়াতে যাওয়া, বাক্স প্যাটরা বাঁধা, রেলের টিকিট কাটা, বাঙালীর একটাই বিলাস, ভ্রমণ।

পরশুরাম তাঁর বিখ্যাত গল্প কচি সংসদে লিখেছিলেন,…'আর বৃষ্টি হইবে না।…জলে স্থলে মরুৎ-ব্যোমে দেহ মনে শরৎ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগবিজয়ে যাইতেন।…ভ্রমণের নেশা আমার মাথা খাইয়াছে …এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। বড় বড় মাঠ, সারি সারি তাল গাছ, ছোট ছোট পাহাড়, নিমেষে নিমেষে

পট পরিবর্তন…'

বেড়ানো আবার একেকজনের একেকরকম। কেউ একই জায়গায় বছরের পর বছর যায়, কেউ একেক বছর একেক জায়গায় যায়।

প্রত্যেক বছর পুজোর ছুটিতে আমার এক প্রবীণ আত্মীয় হাজারিবাগে যেতেন, হাজারিবাগ ছাড়া তিনি আর কোথাও যাবেন না। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বারবার হাজারিবাগ কেন? একঘেয়ে লাগে না?'

তিনি বলেছিলেন, 'একঘেয়ে লাগলে কী হবে, ওখানকার জল হাওয়ার কোনও তুলনা হয় না।'

আমি বলেছিলাম, 'খুব ভালো জল হাওয়া?'

তিনি বললেন, 'ভালো মানে কী? গত তিন বছরে ওখানে মাত্র পাঁচজন লোক মারা গেছে। তার মধ্যে তিনজন হলো ওখাকার শ্মশানের ডোম, আর বাকি দুজন হলো কবরখানার মজুর। বেচারারা দিনের পর দিন কোনও কাজ না পেয়ে পয়সার অভাবে না খেয়ে মারা গেছে।'

এ অবশ্য নিতান্ত বাজে গল্প।

শুধু পুজোর ছুটি নয়, তবু আমার মতো করে বলছি।

এক সওদাগরি অফিসের বড় কর্তা অর্থাৎ মালিকের কাছে একবার জানতে চেয়েছিলাম, 'আপনার অফিসের সাধারণ কর্মচারিরা, কেরানি পিওন—এঁরা বছরে কতদিন ছুটি পান?'

ভদ্রলোক বললেন, 'এক মাস।'

আমি সরকারি কাজে গিয়েছিলাম। আগে থেকেই কিছু কিছু খবর আমার হাতে ছিল, কর্মচারি ইউনিয়নগুলি সেসব তথ্য সরবরাহ করেছিল, আমি সেই তথ্যের ওপরে নির্ভর করে বললাম, 'কিন্তু আমি শুনলাম, এক মাস নয়, বছরে পনেরো দিন ছুটি দেন আপনি।'

কিঞ্চিৎ গম্ভীর হয়ে, কিঞ্চিৎ চিন্তা করে তারপরে ব্যবসায়ী মহোদয় বললেন, 'আপনি ঠিকই শুনেছেন কিন্তু ব্যাপারটা তো ঠিক তা নয়। ওরা পনেরো দিনের ছুটিই পায়, কিন্তু আসলে সেটা এক মাস।'

আমি বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ভদ্রলোক বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন, বছরে আমিও পনেরো দিনের ছুটি নিই। সেই পনেরো দিন আমি নেই, সুতরাং অফিস ভোঁ ভোঁ, এদেরও পুরো ছুটি। তাই পনেরো দিন প্লাস পনেরো দিন, এক মাস বলেছি।'

অনুমান করি, এবার পুজোর ছুটিতে খুব বেশি লোক বাইরে যাবেন না। কাগজে দেখছি দার্জিলিং যাওয়ার খুব ভিড়। কারণ দার্জিলিং নিরাপদ। কাশ্মীর বা পাঞ্জাব যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া অসম বা শিলং যেতেও অনেকে ভরসা পাচ্ছেন না। উত্তর, পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতেও রেল অবরোধ, সড়ক অবরোধ। কোথাও গিয়ে, পৌঁছিয়ে নামতেই হয়তো দেখা যাবে সেদিনই আটচল্লিশ ঘণ্টার বন্‌ধ ডাকা হয়েছে।

যাঁদের টাকা পয়সা আছে, তাঁরা যদি এই পুজোর ছুটিতে ব্যাঙ্কক বা সিঙ্গাপুর, ইউরোপ বা আমেরিকায় যান তাঁদের কথা আলাদা। তবে আমাদের মতো লোকের পক্ষে এই পুজোয় কলকাতায় থাকাই সবচেয়ে সোজা ও ভালো; অন্তত পুজোর কয়দিন যে কলকাতায় কোনও গোলমাল হবে না, এমনকি হয়তো লোডশেডিং পর্যন্ত নয়—এ কথা কলকাতার অতি বড় নিন্দুকেও জানে।

সুতরাং কোথাও যাবো না, গলিতেই থাকবো।

পুজোর ছুটির পর কেউ হয়ত জানতে চাইবেন, 'পুজোর ছুটিতে পুরী যাবেন বলেছিলেন, কেমন লাগলো পুরী?'

আমি বলবো, 'পুরী তো গত বছর যাওয়ার কথা ছিল, গত বছর পুরী যাইনি। এ বছর তো দিল্লি যাবো বলেছিলাম।'

তিনি হয়তো জানতে চাইবেন, 'কেমন লাগলো এবার দিল্লিতে?'

আমি ম্লান হেসে বলবো, 'দিল্লিও যাইনি।'

ক্রিমিন্যাল

আগে দুষ্কৃতকারী শব্দটি ব্যবহার হতো। সম্প্রতি বাংলা খবরের কাগজে ক্রিমিন্যাল অর্থে দুষ্কৃতি শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার ধারণা ছিলো দুষ্কৃতি শব্দটি শুদ্ধ নয়, কিন্তু চলন্তিকায় দেখছি শব্দটি রয়েছে, বরং রাজশেখর বসু দুষ্কৃতকারী শব্দটি গ্রহণ করেননি।

সুবলচন্দ্র মিত্রের আধুনিক বাঙলা অভিধানেও দেখছি দুষ্কৃতি বা দুষ্কৃতকারী নেই। অনুমান করি, হত্যাকারীর অনুকরণে দুষ্কৃতকারী শব্দটি কখনো রচিত হয়েছিলো এবং তখন বিবেচনা করা হয়নি দুষ্কৃতি বলে একটি শব্দ আছে।

দুষ্কৃতির ব্যাকরণের অনেক বেশি আকর্ষণীয় দুষ্কৃতি বিষয়ক ক্যাহিনী-গুলি।

প্রথমে চোর দিয়ে আরম্ভ করাই উচিত।

এক ব্যক্তিকে পুলিস গ্রেপ্তার করেছিলো চুরির অপরাধে। সে নাকি এক গয়নার দোকানে চুরি করেছিলো, বেশ কিছু গয়নাগাঁটি।

সে এক উকিলবাবুর কাছে গেলো। সেই উকিলবাবু আবার খুব সাধু মানুষ, কখনো কোনো মিথ্যে মামলা নেন না।

তা এই মক্কেলটি উকিলবাবুর কাছে গিয়ে তার মামলার কথা বলতে উকিলবাবু বললেন, 'দেখুন দুটো শর্তে আমি আপনার এই মামলা নিতে পারি। এক নম্বর হলো, আপনি সত্যিই নির্দোষ, চুরি করেননি। এবং দুই নম্বর হলো, আপনি আমাকে পাঁচশো টাকা ফি দেবেন।'

মক্কেল সব শুনে যথেষ্ট চিন্তা করে ঘাড় চুলকিয়ে বললে, 'হুজুর, আপনার ঐ এক নম্বর তো ঠিক আছে কিন্তু দুই নম্বর মানে আপনার ফিয়ের ব্যাপারটা, স্যার খুব টানাটানি চলছে, বিপদেও পড়েছি, একটা অনুরোধ করি দুশো টাকা নগদে

দেবো আর দুটো কানের দুল সঙ্গে একটা আংটি দেবো। খাঁটি সোনা, বড় জুয়েলারির দোকানের মাল স্যার।'

চুরির পরে ছেনতাই।

ছেনতাইয়ের মত রোমহর্ষক কাহিনী কলকাতার পটভূমিকায় না রেখে নিউইয়র্কে নিয়ে যাই। আসলে সেখানেই এ ব্যাপারটা খুব বেশি ঘটে কি না।

যা হোক সেই নিউ ইয়র্কের গহনে এক গলিতে এক বাঙালিনী হেঁটে একজনের বাড়ি খুঁজে যাচ্ছিলেন। পুরনো নিউইয়র্কের রাস্তাঘাট জটিল এবং কালক্রমে তিনি এক কৃষ্ণবর্ণ ছেনতাইকারীর মুখোমুখি হলেন।

ভদ্রমহিলা সরল হলেও বুদ্ধিমতী, ছেনতাইকারী দাবী করা মাত্র বিনা প্রতিবাদে তিনি তাঁর হাতব্যাগটি দুষ্কৃতকারীর হাতে তুলে দিলেন। মহিলার সারল্য এবং তদুপরি বিনা বাধায় মাল পেয়ে যাওয়ায় ছেনতাইকারী নিগ্রোটি একটু খুশি হয়ে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মহিলাকে দিয়ে বললো, 'মেমসাহেব আমার এই কার্ডটা রাখুন, এ পাড়ায় অনেক খারাপ ছেনতাই পার্টি আছে, তারা আপনাকে মারধোর করতে পারে, আপনার গলার হার, কানের দুল ছিঁড়ে নিতে পারে, আরো খারাপ কাজ করতে পারে। আপনি এ পাড়ায় এলে আমার এই কার্ডটা লোককে দেখাবেন। তারা আমার কাছে পৌঁছে দেবে, তখন শুধু হাত-ব্যাগটা দিয়ে চলে যাবেন।'

চুরি, ছেনতাইয়ের পর অবশ্যই খুন, রাহাজানি। তবে একটা কথা বলে রাখি রাহা মানে পথ। রাহাজানি আর পথে ছেনতাই একই ব্যাপার।

সে ঠিক আছে, খুন নয়, এই মুহূর্তে অতটা সইবে না।

আগে একটা পরপোকারী ডাকাতের গল্প বলি।

না ইনি মহামহিম রঘু ডাকাত নন, রবিন হুড নন, এমনকি অতীতের অনন্ত সিংহও নন।

ইনি একজন সাধারণ, অতি সামান্য ব্যাঙ্ক ডাকাত।

ইনি ভুল করে একদিন দলবল নিয়ে এক প্রত্যন্ত বিন্যাসিত সরকারি ব্যাঙ্ক শাখায় ঢুকেছিলেন।

এই কাল্পনিক ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থেকে দারোয়ান সবাই তস্কর, সবাই ডাকাত, সবাই দস্যু। যেমন যেমন টাকা সরকার থেকে এসেছে, গ্রাহকদের কাছ থেকে জমা পড়েছে এঁরা সবাই মিলে ভাগেযোগে কিছু খাতায় মানে লেজারে তুলেছেন, কিছু নিজেদের পকেটে তুলেছেন।

তিনি ব্যাঙ্কে প্রবেশ করে রিভলবার তুলে যেই বললেন যে সবাই মাথার ওপরে হাত তুলুন, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার থেকে পেয়াদা পর্যন্ত সবাই মাথার ওপরে হাত তুলে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন।

এঁদের একরকম আহলাদের কারণ কিছুই বুঝতে না পেরে দস্যু মহাশয় জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার?'

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বললেন, 'কিছুই ব্যাপার নয় স্যার। ঐ ভল্টে টাকা রয়েছে, আপনি সব টাকা নিয়ে যান আর সেই সঙ্গে আমাদের এই সব হিসেবের খাতা

লেজার বুক এগুলোও নিয়ে যান।'

অর্থাৎ, ডাকাতরা খাতাপত্র নিয়ে গেলে এঁদের আর তহবিল তছরুপ ধরা পড়বে না, এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যাবেন।

অতঃপর খুন, মার্ডার।

সরোজবাবুর প্রতিবেশী কাল রাত সাড়ে দশটায় খুন হয়েছেন।

এখন থানায় সরোজবাবুকে পুলিশ জেরা করছে।

পুলিশ ঃ কাল রাত দশটার সময় আপনি কি করছিলেন ?

সরোজবাবু ঃ বাসায় ছিলাম।

পুলিশ ঃ বাসায় কি করছিলেন ?

সরোজবাবু ঃ আমার স্ত্রী ভুনি খিচুড়ি রান্না করেছিলেন, তাই দিয়ে রাতের খাওয়া সারছিলাম।

পুলিশ ঃ ঠিক আছে। তারপরে রাত সাড়ে দশটার সময় কি করছিলেন ?

সরোজবাবু ঃ শোয়ার ঘরে বিছানায় শুয়ে পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরাচ্ছিলাম।

পুলিশ ঃ প্রমাণ কি ?

সরোজবাবু ঃ আপনি আমার স্ত্রীর রান্না ভুনিখিচুড়ি একবার খেয়ে দেখুন তারপর বুঝতে পারবেন, আমি সত্য বলছি কি না ?

অনেকগুলো বাজে গল্প হলো, এবার একটা বলি সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

কলকাতার ভিড়ের ট্রামে একবার এক পকেটমার আমার প্যাণ্টের পকেটে হাত গলিয়েছিলেন।

তখন টাইট প্যাণ্টের যুগ। আমি তার পেলব করস্পর্শ টের পেয়ে একটু কোনাকুনি ঘুরে যেতেই তার হাতটা আমার পকেটে আটকে গেলো।

লোকটি কাকুতিমিনতি করতে লাগলো, বললো, 'দাদা, একটু সোজা হয়ে দাঁড়ান, হাতটা বার করতে পারছি না, হাতটায় ব্যথা করছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমার পকেটে আপনার হাত কি করছে ?

সে বললো, 'খুব ঘেমে গিয়েছিলাম। ভাবলাম শুকনো রুমাল যদি থাকে।'

আমি বললাম, 'তা আমাকে বলতে পারতেন।'

লোকটি বললো, 'ছোট বয়সে মা বারণ করে দিয়েছিলেন রাস্তাঘাটে অচেনা লোকের সংগে কথা বলবি না, সেই জন্যেই তো।

নেহাৎ সাদা বাংলায় ক্রাইম শব্দের মানে অপরাধ, ক্রিমিন্যাল অপরাধী।

অপরাধীর মত সোজা এবং গ্রহণযোগ্য শব্দ হাতের কাছে থাকতেও কেন দুষ্কৃতী বা দুষ্কৃতিকারী শব্দের দরকার পড়লো ক্রিমিন্যাল বোঝাতে, সে আমার ঠিক বোধগম্য নয়।

হয়তো এমন হতে পারে অপরাধী শব্দটা তেমন জোরদার নয়। একথা ঠিক যে দোষ করা বা অপরাধ করা এক জিনিস আর ক্রাইম অন্য জিনিস। দোষী বা অপরাধী বললে মনে যে রেখাপাত হয় তার চেয়ে অনেক স্পষ্ট, অনেক তীক্ষ্ণ

ক্রিমিন্যাল বা দুষ্কৃতি শব্দ।

আমি জানি আমার পাঠকেরা শব্দতত্ত্ব থেকে গালগল্পে অনেক বেশি আগ্রহী তাই আমাকে মানে মানে পশ্চাদপসরণ করতে হচ্ছে।

এই সামান্য নিবন্ধে ইতিমধ্যে চোর ডাকাত, খুন রাহাজানি এমনকি পকেটমারের কাহিনী বলা হয়ে গেছে।

এবার অপহরণে আসি। মানুষ অপহরণ।

অপহরণ কোনো নতুন যুগের অপরাধ না। এক যুগে তো অধিকাংশ বিয়েই হতো কন্যা অপহরণ করে। রামায়ণের সীতা হরণের কাহিনী সর্ববিদিত, যদিও সেখানে অপহরণকারী রাবণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, তাকে সবংশে নিধন হতে হয়েছিলো।

মহাভারতেও রয়েছে অর্জুন কর্তৃক বলরাম শ্রীকৃষ্ণ ভগিনী সুভদ্রা হরণের এবং পরে সুভদ্রা বিবাহের কাহিনী। সম্প্রতি আবার অপহরণ ব্যাপারটা নানা জায়গায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কোথাও হয়তো বিপ্লবীরা মন্ত্রীতনয়া অথবা কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধানকে অপহরণ করে গোয়েন্দা চক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রেখে তাদের বিনিময়ে সরকারের হাতে বন্দী স্বপক্ষীয় বিপ্লবীদের মুক্তি দাবী করছে। আবার কোথাও হয়তো মামুলি অপহরণ, কিডনাপিং, বড়লোকের ছেলেকে বা মেয়েকে তুলে নিয়ে রাখা হচ্ছে গোপন জায়গায় তার মুক্তিপণ হিসেবে চাওয়া হচ্ছে বিশাল টাকা।

এই রকম একটি অপহরণের গল্প সম্প্রতি আমার কানে এসেছে।

বড়বাজারে জরির আর পানের তবকের ব্যবসায়ী মুলচাঁদ খুরানা। ধনকুবের, তার টাকার কোনো হিসেবনিকেশ নেই। যৎকিঞ্চিৎ হিসেবনিকেশ আয়কর দপ্তর জানে কিন্তু সেটাও ভয়াবহ।

যা হোক মুলচাঁদবাবুর দুই ছেলে। যমজ, এখন বালক তারা। ফুলচাঁদ খুরানা এবং দুলচাঁদ খুরানা। দুজনেই ডনবসকোতে পড়ে।

শুধু যমজ নয়। দুলচাঁদ আর ফুলচাঁদ একেবারে একরকম দেখতে। আকারে-প্রকারে, আচারে, আচরণে, গাত্রবর্ণে, মুখশ্রীতে, কণ্ঠস্বরে চলাবসায় কারো সাধ্য নেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অথবা বন্ধুর ধরার জো নেই কে ফুলচাঁদ, কে দুলচাঁদ?

পূর্ব কলকাতার বিখ্যাত বিহারী মস্তান ফেচু সিং এবং আবুল কালাম বহুদিন ধরেই ফুলচাঁদ আর দুলচাঁদের দিকে নজর রাখছিলো, অবশেষে একদিন সুযোগ পেয়ে দুপুর বেলা ইস্কুলের কাছে পার্ক সার্কাসের মোড়ে একলা পেয়ে দুজনকে তুলে মেটিয়াবুরুজে আবুলকালামের শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে লুকিয়ে ফেললো, তারপর যেমন হয়ে থাকে।

অস্বাক্ষরিত একটি পত্র পেলেন মুলচাঁদ খুরানা। বড়বাজারে তাঁর গদিতে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি চিঠিটা পৌঁছে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেলো।

চিঠিটির বয়ান,

মুলচন্দের সাহেব,

আপনার দুই ছেলে ফুলচাঁদ আর দুলচাঁদকে আমরা Kidnap করিয়াছি। তারা এখনো নিরাপদে আছে। আপনি যদি দশ লাখ টাকা তাদের বিনিময়ে দেন তাহারা ছাড়ান পাইবে না হইলে মৃত্যু অনিবার্য। দিতে চাহিলে চৌরঙ্গী থিয়েটার রোডের মোড়ে যে মাথাভাঙা ফাটা ল্যাম্প পোস্ট আছে তাহার ফোকরে আজ সন্ধ্যায় একটি চিঠি রাখিয়া যাইবেন। সেই চিঠিতে যেন লেখা থাকে কি নগদ টাকা দিতে পারিবেন। আমাদের লোক নিকটেই থাকিবে, চিঠিটি সঙ্গে সঙ্গে লইবে এবং পরবর্তী সংবাদ গদিতে পাইবেন।

সাবধান পুলিসে খবর দিবেন না। বালকদ্বয়ের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবেন না।

নমস্কার

এই চিঠি পেয়ে মুলচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, তাঁর বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কিন্তু মুলচাঁদজী ঠাণ্ডা মাথার মানুষ, তিনি ভেবে দেখলেন পুলিসে খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই। টাকা দিয়ে দেওয়াটা ভালো। কিন্তু দশ লাখ টাকা তিনি দেবেন না। ফুলচাঁদ আর দুলচাঁদ দুজনে তো একই জিনিস, আগাগোড়া একরকম। একজনকে পেলেই চলে যাবে। কয়েকদিনের মধ্যে অন্যজনের দুঃখ ভুলে যাবেন।

মুলচাঁদ খুরানা চিঠি দিলেন, 'দশ লাখ টাকা নেই। তবে আপাতত একজনকে ছেড়ে দিলে পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারি।'

চিঠি পেয়ে অপহরণকারীরা বুঝলো যে মুলচাঁদজী তাদের ওপরে ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্রয়োগ করেছেন। তবে তারাও ছাড়বার লোক নন, তারা জানালো ঃ

মুলচাঁদজী,

আপনার মতই আমাদের পাইকারি হিসাব।

ফুলচাঁদ দুলচাঁদ দুইজনের একত্রে ফেরত মূল্য দশ লাখ টাকা বটে তবে খুচরা লইতে গেলে একেক জনের জন্যে সাত লাখ টাকা লাগিবে।

কি করিবেন। জানাইবেন।

নমস্কার

অতঃপর মুলচাঁদজী কি করেছিলেন তা আমার এই রম্য নিবন্ধের বিষয় নয়। ক্রিমিন্যালের শেষ বিষয় প্রতারণা। কয়েক বছর আগের ব্যাপার এটা।

আমেরিকা না কোথা থেকে এক সাহেব এসেছিলো দিল্লিতে। বিখ্যাত লোকদের নামের সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের জিনিস বহুমূল্যে সে সংগ্রহ করেছিলো। যেমন মতিলাল নেহরুর জুতো, জহরলালের টুপি, রাজেন্দ্রপ্রসাদের কোট, রবীন্দ্রনাথের সেভিং সেট, সরোজিনী নাইডুর টুথব্রাশ।

মহাপুরুষের উত্তরাধিকারীরা কিংবা এই সব জিনিস যাদের কাছে আছে, যারা যত্ন করে রেখে দিয়েছে তারা যদি এগুলো চড়া দামে সংগ্রাহকের কাছে বেচে দেয়

তাহলে আইনত বিশেষ কিছু করার নেই।

পুলিস তাই এ নিয়ে মাথা গলায়নি। কিন্তু গোপনসূত্রে পুলিসের কাছে খোঁজ এলো আমেদাবাদের এক আশ্রম থেকে একজন লোক মহাত্মা গান্ধীর খসে পড়ে যাওয়া পুরনো দাঁত যা সেখানে রক্ষিত ছিলো সেগলো চুরি করে এনে বেচেছে।

পুলিসের বেশি সময় লাগলো না লোকটিকে পাকড়াও করতে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার লোকটিকে গ্রেপ্তার করার পর তার কাছে পাওয়া গেলো বড় একটা রেশমের ঝোলা, সেই ঝোলার গায়ে গুজরাটিতে লেখা, 'মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র দাঁত।' ঝোলার মধ্যে বহু দাঁত, পুলিস গুনে দেখলো দাঁতের সংখ্যা একশো চুয়ান্ন।

এত দাঁত ছিলো মহাত্মার ?

ফুল

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রথম রচনার নাম 'ফুল'।

অনেককাল আগে এক মহাকবি বলেছিলেন, যে মানুষ গান ও ফুল ভালবাসে না সে খুন করতে পারে। 'শ্রীকান্ত' দ্বিতীয় খণ্ডে গানের সূত্রে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন।

'কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি তাঁহার (মহাকবির) জানা ছিল না।...কাবুলিওয়ালা গান গায় এ কথা কে ভাবিতে পারে।'

অবশ্য ফুলের ব্যাপারে এমন মারাত্মক কটূক্তি করা সম্ভব নয়। সৌরভহীন অথবা সুগন্ধময়, রঙিন অথবা সাদা পৃথিবীতে এমন কোন ফুল থাকা সম্ভব নয়, যা দেখলে কারও মাথায় খুন চেপে যেতে পারে। তবে এমন অজস্র খুনী আছে, হ্যাকারী রয়েছে এই জগতে যারা ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে গালিচার ওপর বসে সুন্দরী বাঈজীর গান শোনে। যারা গান এবং ফুল ভালবাসে তারা কিন্তু খুনও করে।

খুনোখুনির ব্যাপারটা আমার ভাল আসে না। সুতরাং সরাসরি মূল বিষয়—ফুলে ফিরে যাই।

পৃথিবীতে হাজার রকম ফুল আছে। একেক দেশে একেক রকম ফুল। একেক রকম ফুলের নানা রকম নাম। সবাই সব ফুল চেনে না, চেনার কথাও নয়। বহুকাল কনকচাঁপা ফুলকে আমি কাঠচাঁপা ভাবতাম। আমাদের জানলার নিচে একটি ঝোপের মধ্যে এক কাঁঠালিচাঁপার গাছ ছিল। বর্ষার সন্ধ্যায় তার গায় গন্ধ আমাদের বিহ্বল করত, আমার অনেক লেখায় সেই গায় গন্ধের উল্লেখ আছে, কিন্তু অনেককাল পরে এখন জেনেছি কাঁঠালিচাঁপা নয় ওটা ছিল হাসনুহানার গন্ধ।

অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ হয়েছিল একটি ছোট মেয়ের আর তত-ছোট-নয় দিদি। দিদিটি চুলে একটি ফুল গুঁজেছে। ছোট বোন সেটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, চুলে ফুল গুঁজেছিস ?'

বোনকে বিশেষ পাত্তা না দিয়ে দিদিটি বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছিস।'

একটু থেমে বোন বলল, 'তোর চুলে এটা কি ফুল রে দিদি? গোলাপ না কি রে?'

দিদি এবার খুব গর্বের সঙ্গে বলল, 'না, গোলাপ নয়, এটা ক্রিসেন্থেমাম।'

বোন এ রকম ফুলের নাম আগে শোনেনি। সে অবাক হয়ে বলল, 'ক্রিসেন্থেমাম?'

দিদি বলল, 'হ্যাঁ, ক্রিসেন্থেমাম।'

সরলা বোনটি এবার জানতে চাইল, 'দিদি, ক্রিসেন্থেমাম বানান কি হবে রে?'

দিদি ওপরের দাঁতের পাটি দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কিছুক্ষণ চেপে ধরে তারপর, 'ক'য় ঋ ফলা, না, না, ক'য় র ফলা হ্রস্ব ই না দীর্ঘ ঈ। তালব্য ল। না, না, দন্ত্য স…' এই ভাবে কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে তারপর বলল, 'না রে তোকে বানিয়ে বলেছিলাম। এ ফুলটা ক্রিসেন্থেমাম নয়, এটা হল গোলাপ। গ'য় ওকার গো, ল'য় আ লা আর প'গোলাপ।'

এবার ফুলের অন্য একটা গল্প বলি। সেটা মোটেই হাসির নয় বরং বেদনার।

এক মৃত্যুপথযাত্রিনী তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওগো আমি মারা গেলে, তুমি অনেক ফুল দেবে আমার বিছানায়, আমার শরীর ফুলে ফুলে ছেয়ে দেবে?'

স্বামী বলল, 'এসব কথা কেন?'

অকালমৃত্যুগামিনী ম্লান হেসে বলল, 'তুমি দেবে না ফুল?'

স্বামী বিচলিত হয়ে বলল, 'কেন এসব কথা বলছ। বাজারে যত ফুল পাওয়া যায় সব দিয়ে সেদিন তোমাকে সাজিয়ে দেব।'

এই কথা শুনে সতীসাধ্বী করুণ কণ্ঠে বলল, 'ওগো, তুমি তাহলে আমি মরার আগেই, বেঁচে থাকতেই আমাকে কয়েকটা ফুল এনে দাও না। আমি যে ফুল বড় ভালবাসতাম।'

এই বিলিতি গল্পটার মতোই একটা খুব জনপ্রিয় বাংলা গান ছিল, পুরনো দিনের, আমাদের যৌবন কালের গান

জীবনে যারে তুমি দাওনি মালা,
মরণে কেন তারে দিতে এলে ফুল।…'

ফুল মানেই ফুলের গন্ধ মানে পরিমল। সেই শিশুপাঠ্য গ্রন্থে শুরু হয়েছে, 'পরিমল লোভে অলি সকলই জুটিল।' এরই বিপরীত প্রান্তে এক আধুনিক কবিতায়, একটু অন্যরকম ভাবে

'কয়েকটি নতুন ফুল ফুটবে
হালকা সোনার কলিতে ঈষৎ দুঃখের মত
গত জন্মের সৌরভ
শালিকদের যাতায়াতের পথে ট্রাফিক আলোর
মত
কয়েকটি নতুন ফুল।'

অন্য এক বিখ্যাত কবি একবার ঘোষণা করেছিলেন 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত', এবং তিনিই পরে বলেছিলেন, 'ফুল জমতে জমতে পাথর হয়ে যায়।'

পাথরের কথা আপাতত উহ্য থাক। ফুলের সৌরভের কথা বলি। একদা এক বিদেশী বলেছিলেন, ভাল কবিতার সঙ্গে মোটা পদ্যের যে ফারাক সেই ফারাক, ফুলের গন্ধের সঙ্গে পারফিউম, সেণ্ট বা আতরের। একটা খাঁটি, বিশুদ্ধ অপরটা কষ্টপ্রসূত।

আরেকজনের কথা বলি। গত শতকের খ্যাতনামা মার্কিন যাজক, ব্রুকলিন গির্জার হেনরি ওয়াট বীচার। বীচার সাহেব চমৎকার বলেছিলেন, ফুলই হল ভগবানের তৈরী সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। তবে ভগবান একটা ভুল করেছিলেন, ফুল তৈরি করার পর তার অন্তরে একটি আত্মা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

ফুল সম্পর্কে কোন আলোচনায় রবীন্দ্রনাথকে একবার না ছুঁয়ে যাওয়া মহাপাপ হবে। সেই অবিস্মরণীয় তিনটি পঙক্তি স্মরণ করছি।

ফুলগুলি যেন কথা
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা

অবশেষে এই কোটেশন কণ্টকিত অরম্য নিবন্ধের শেষে একটা হালকা গল্প বলি।

গল্পটা পুরনো কিন্তু বড় ভাল। বার বার বলা চলে।

ছুটির দিনে সকালে বিকেলে দু'বেলাই পাড়ার ক্লাবে তাস খেলে অনিমেষ। অনিমেষের বৌ বড় দজ্জাল, সেটা সবাই জানে। কিন্তু তাস খেলার সময় তো আর কারও হুঁশ থাকে না। সেদিন সকালবেলা তাস খেলা শেষ হতে দুটো বেজে গেল। ভীত, সন্ত্রস্ত অনিমেষ পা টিপে টিপে বাড়ি ফিরল।

সবাই আশঙ্কা করেছিল অনিমেষ আর বিকেলে খেলতে আসতে পারবে না, কিন্তু সে এলো তবে তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

সবাই কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করল, 'কি হল মাথা ফাটলো কি করে? মাথাময় ব্যাণ্ডেজ কেন?'

অনিমেষ বলল, 'বৌ ফুল ছুঁড়ে মেরেছিল।'

বন্ধুরা তো এ কথা শুনে অবাক। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় শুনেছি, কিন্তু মাথা ফাটার কথা কখনো শুনিনি।'

ধরা গলায় অনিমেষ জানালো, 'আরে, আমার বৌকে তো জানো। ফুলের সঙ্গে পেতলের ফুলদানিটিও ছুঁড়ে মেরেছিল।'

পুনশ্চ ঃ যাঁরা বাগান করেন, ফুল ফোটান তাঁদের জন্যে একটি সদুপদেশ।

ফুলগাছগুলোকে যেমন ভালবাসবেন, যত্ন করবেন, সেই সঙ্গে আগাছাগুলো গুণো করতে ভুলবেন না, একেবারে উপড়িয়ে ফেলে দেবেন, তা না হলে ফুল ভাল ফুটবে না।

ফল

ফুলের কথা লেখা হয়ে গেছে।

এবার তবে ফলে যাই।

মহাজ্ঞানী মহাজন দিয়েই আরম্ভ করা যাক। এখন রমরমা মহাভারতের যুগ চলেছে, কয়েক সপ্তাহ আগে দূরদর্শনে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করা গেল। প্রথমেই আমরা গীতার আশ্রয় নিচ্ছি।

'মহাস্থবির জাতক'-খ্যাত অবিস্মরণীয় লেখা প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর (মহাস্থবির) জন্ম শতবর্ষ এ বছর। এই উপলক্ষে একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিকে পিতৃবন্ধু প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর স্মৃতিচারণ করেছেন শ্রীযুক্ত শতদল গোস্বামী। স্বর্গত পরিমল গোস্বামীর পুত্র।

শতদলবাবু লিখেছেন যে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী কখনও ফল খেতেন না, বলতেন, 'এব্যাপারে আমি গীতায় শ্রীভগবানের বাণী মেনে চলি। সেই বাণীটি হল বহুখ্যাত—'মা ফলেষু কদাচন।'

শাস্ত্রের কথায় মনে পড়ছে সংস্কৃতে 'ফল' শব্দটি ক্লীবলিঙ্গ। ফলের মধ্যে থাকে বীজ সেই বীজ থেকে হয় গাছ। লতা-গুল্ম-মহীরুহ, বট-অশ্বত্থ। সেই ফলই যদি ক্লীব হয় তা হলে শাস্ত্রকার পণ্ডিতদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে চিন্তায় পড়তে হয়।

আর সে জন্যে আমাদের কষ্টও কি কম ছিল।

নরঃ, নরৌ, নরাঃ এই প্রচলিত অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ ফলের বেলায় গ্রাহ্য নয়, সেখানে ফল ক্লীবলিঙ্গ হওয়ায় তার শব্দরূপ হবে ফলম্, ফলে, ফলানি ইত্যাদি। অর্থাৎ পড়ুয়ার আর এক কিস্তি দুর্ভোগ।

সংস্কৃত কচকচানি এই হালকা কলমে মানায় না। তাই এখনকার মতে 'নরঃ, নরৌ, নরাঃ,' 'ফলম্, ফলে, ফলানি' মানে সোজা কথায় ব্যাকরণ দূরে রেখে এর পরেই তরলতার প্রসঙ্গে যাব আমরা।

কিন্তু তার আগে একটা বড় কাজ বাকি আছে গীতা যখন ছুঁয়ে ফেলেছি, পবিত্র বাইবেল একবার ছুঁয়ে যাই।

খুব আলতো করে ছুঁয়ে যাবো, দ্রষ্টব্য নিউ টেস্টামেন্ট (মেথ্যু)। সপ্তম পর্ব, ষোড়শ শ্লোক।

সেখানে পরিষ্কার বলা আছে, 'মানুষ চিনবে তাদের ফল দিয়ে'।

এই ফল কর্মফল নয়, গাছের ফল। কারা আঙ্গুর খায়, কারা ডুমুর খায় তাই দিয়ে বুঝতে হবে তারা কেমন।

কবে এক রহস্যময় লোকগীতিতে শুনেছিলাম, বামুন চিনবে পৈতে দিয়ে কিন্তু বামুনি চিনবে কি দিয়ে?

উপরোক্ত বাইবেলের প্রশ্নোত্তর যত সরল ও স্পষ্ট, এই লোকগীতির প্রশ্নটি তেমন নয়,

স্নেহের পাঠিকা,

তুমি নিশ্চয় আমিষ গন্ধ পাচ্ছ।

আমিষ পাচ্ছি। চল নিরামিষ সংসারে যাই।

ফল মানে নিরামিষ। এঁচড় মানে কাঁচা কাঁঠালকে কেউ কেউ রসিকতা করে গাছপাঁঠা বললেও ফলের চেয়ে নিরামিষ আর কিছু নেই। যে কোন তরকারি রান্না করতে গেলে যত কমই হোক তেল বা স্নেহপদার্থ লাগে, সে তেল লার্ড হতে পারে, জমানো চর্বি হতে পারে, এমনকি মাখন হলেও যেহেতু সেটা দুধ প্রসূত তাই আমিষ। কিন্তু এঁচড় ফল নয় তরকারি।

গল্পের আগে ফলের বিচার আরেকটা সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়ছে। প্রবচনটি প্রাচীন ও বিখ্যাত, সকলেরই জানা, চলিত গল্পের এটি একটি প্রশ্নোত্তর।

গাছকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, 'গাছ, তোমার পরিচয় কি ?'

গাছ উত্তর দিচ্ছে, 'ফলেই আমার পরিচয়।'

মূল সংস্কৃত শ্লোকটি কিন্তু অনেক বেশি সুন্দর ও কাব্যময়। হয়ত কারো মনে পড়তে পারে, কারো ভাল লাগতে পারে এই আশায় মূল শ্লোকটি স্মরণ করছি ঃ

'একভূরু ভয়োরেক দলায়োরেক
কাণ্ডয়ো।
শালিকাশ্যামাকয়োভেদঃ ফলেন
পরিচীয়তে' ॥

শ্লোকের অর্থটা খুব সরল—

'একই মাঠে শালিধান ও শ্যামাধান জন্মায়। উভয়েরই দল কাণ্ড প্রভৃতি এক রকম, কিন্তু ফলের দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ জানা যায়।'

অতঃপর সরস নিরামিষ গল্পে প্রবেশ করি।

আপেল সাহেবদের খুব প্রিয় ফল। ছোটবেলায় আমরা ফার্স্টবুকে পড়েছি আপেল মানে আতা, সেখানে লাল আপেলের ছবি দেখে ভেবেছি এ কেমন আতা ? আসলে আপেল আর আতা এক জিনিস নয়। আপেল আপেলই, আতার সঙ্গে তার কোন মিলই নেই।

সে যা হোক একসময় সাহেবরা আপেলকে দিব্যফল মনে করত, মনে করত এই ফল সর্বরোগহর। এখন অবশ্য জানা গেছে আপেল ফল হিসেবে ভালই তবে শ্রেষ্ঠ বা দিব্যফল বলা চলে না, দ্রব্যগুণে আম, আতা কিংবা সামান্য পেয়ারাও কম যায় না।

আপেলকে এত ভাল ফল মনে করা হত যে ইংরেজি প্রবাদই ছিল, 'এ্যান এ্যাপেল এ ডে কিপস্ দি ডক্টর এ্যাওয়ে' (An apple a day keeps the doctor away) অর্থাৎ কিনা দৈনিক একটা করে আপেল খেলে ডাক্তার দূরে থাকে।

তা এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছেন। ব্যবসার কাজে ভদ্রলোককে প্রায়ই বাইরে যেতে হয়, দু'চার দিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয়।

এতদিন ভালই চলছিল কিন্তু আজ কিছুকাল হল এক সুদর্শন তরুণ চিকিৎসক তাঁর প্রতিবেশী হয়ে এসেছেন। ভদ্রলোকের তরুণী পত্নীটিও সুন্দরী ও লাস্যময়ী। ফলে যা হয়, উভয়ের প্রতি কিঞ্চিৎ আকর্ষণ বোধ করছে। বাইরে তেমন স্পষ্ট দেখা না গেলেও ভদ্রলোক মনে মনে টের পান তাঁর স্ত্রী ডাক্তার যুবকটির মোহে পড়ে যাচ্ছে।

এ অবস্থায় স্ত্রীকে শূন্য বাড়িতে একা রেখে বাইরে যাওয়া নিরাপদ নয়, অন্যদিকে স্ত্রীকে সঙ্গে করে ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করারও ঢের ঝামেলা।

এই সময় ভদ্রলোককে রক্ষা করল ঐ প্রবাদ বাক্যটি। তাঁর মনে পড়ল ঐ প্রবাদ বাক্যটি, এ্যান এ্যাপেল এ ডে, কিপস্ দি ডক্টর এ্যাওয়ে।' ভদ্রলোকের এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যাওয়ার কথা ছিল তিনি বাজারে গিয়ে ভাল দেখে সাতটি আপেল কিনে নিয়ে এলেন, এনে বৌকে দিয়ে বললেন, 'আমি যে কয়দিন থাকব না, দৈনিক একটা করে এই আপেল খাবে।

ভদ্রলোক হিসেব করে বার করেছিলেন সাতদিন সাতটা আপেল, দৈনিক একটা করে আপেল খেলে সাতদিন ডাক্তার দূরে থাকবে।

সোজা অঙ্ক। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁর কথা শুনেছিলেন কিনা, দৈনিক একটা করে আপেল খেয়েছিলেন কিনা, সে খবর আমাদের জানা নেই।

তবে আমরা অন্য একটা নতুন যুগের প্রবাদ জানি। সেটা ঐ আপেলের প্রবাদ ভঙ্গিতেই রচিত হয়েছে।

সেই প্রবাদটা হল, দৈনিক একটা করে আপেল খেলে হয়ত দূরে থাকবেন, কিন্তু তুমি যদি দৈনিক একটা করে রসুন খাও তা হলে ডাক্তারবাবু কেন সব মানুষই তোমার থেকে দূরে থাকবে।

কথাটার সারমর্ম হল, দৈনিক একটা করে রসুন খেলে শরীর ও মুখে এত গন্ধ হবে যে সবাই দূরে দূরে থাকবে। জগৎ-সংসারে কেউই তোমার কাছে ঘেঁষবে না।

ফলাফল

ফল বিষয়ক রম্য রচনাটি শেষ করে ছাপতে পাঠিয়ে দেওয়ার পরে মনে পড়লো (কিংবা বলা উচিত খেয়াল হলো) যে আসল গল্পগুলি লেখা হয়নি।

লেখা হয়নি একথা অবশ্য সত্যি নয়। লিখেছিলাম, কত গল্পই তো কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখলাম কিন্তু আসল কথা হলো প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ ফলের রচনায় ফলের গল্প লেখা হয়নি।

প্রথমে একটি তরতাজা বিলিতি গল্প দিয়ে শুরু করি—

মার্কিন দেশের এক পার্কে এক ভদ্রলোক অতি মূল্যবান এক ঠোঙা চেরি ফল নিয়ে রোদ্দুরে কাঠের বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে একটা একটা করে খাচ্ছিলেন। এমন

সময় মেমসাহেব এলেন সঙ্গে তাঁর পোষা খরগোশ।

ধবধবে সাদা, নাদুসনুদুস খরগোশ। দেখলেই বোঝা যায় নিতান্তই আদরের পোষ্য, গলায় লাল রেশমের রিবনে রুপোর ঘুঙুর বাঁধা।

মেমসাহেব মাঠের এক পাশ থেকে কচি সবুজ ঘাস ছিঁড়ে তাঁর খরগোশটিকে খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সে তা খাবে কেন, তার চোখে পড়েছে বেঞ্চিতে বসা ভদ্রলোকের হাতে চেরি ফলের ঠোঙা।

খরগোশটা এক ছুটে ভদ্রলোকের বেঞ্চির সামনে এসে লাফালাফি শুরু করে দিলে। বেঞ্চির ওপরে লাফিয়ে উঠতে গেলো, ভদ্রলোকের জুতোতে সামনের পা দিয়ে আঁচড়িয়ে দিলো। রীতিমত বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক তাঁর চেরি ভক্ষণ থেকে কিছুক্ষণ বিরত হয়ে খরগোশটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

খরগোশটির নাম পুষি। পুষির মালিকান বুড়ি মেমসাহেব পুষির এবম্বিধ আচরণে খুবই লজ্জিত ও বিব্রত বোধ করছিলেন এবং বারবার 'পুষি', 'পুষি', 'এই পুষি কি হচ্ছে,' এই সব বলে তাকে লোভ দমন করতে আদেশ করছিলেন।

কিন্তু চেরিফল দেখে পুষির জিব দিয়ে তখন লালা পড়ছে। তার ছুটোছুটি, লাফালাফি, আঁচড়াআঁচড়ি ততক্ষণে আরো বেড়ে গেছে। ফলভক্ষণকারী ভদ্রলোক অবশেষে পুষির মেমসাহেবকে বললেন, 'আমি কি আপনার পুষিকে একটু ছুঁড়ে দিতে পারি?' মেমসাহেব ভাবলেন ভদ্রলোক দুয়েকটা চেরিফল পুষিকে ছুঁড়ে দিতে চাইছেন। তিনি স্মিত সম্মতি দিয়ে বললেন, 'খুব বেশি দেবেন না।'

'খুব বেশি নয়, এই পার্কের বাইরে,' এই বলে মেমসাহেব বাধা দেওয়ার আগে ভদ্রলোক খরগোশটিকে তুলে পার্কের দেওয়ালের ওপাশে বড় রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

হতভাগ্য খরগোশের কি পরিণতি হয়েছিলো কে জানে? ফল নিয়ে আমার নিজের দুর্গতির একটা পুরনো গল্প বলি।

বহুকাল আগের কথা। তখন আমরা কালীঘাট পাড়ায় থাকি। হাজরার মোড়ে এক বৃদ্ধ ফলওয়ালা ছিলেন, তাঁর পদবীও ছিলো হাজরা। যদিও আরো অনেক ফলের দোকান আশেপাশে ছিলো, হাজরার ফলের দোকান বলতে আমরা স্বভাবতই ঐ দোকানটা বুঝতাম।

বৃদ্ধ দোকানদার আমাকে ছোটবেলা থেকে চিনতেন। নাম ধরেই ডাকতেন।

তখন কালীঘাট বাড়িতে শুধু আমি আর দাদা থাকতাম। হরিণঘাটার দুধের আদি যুগ সেটা। সকালবেলা বাড়ির সামনের দুধ ডিপো থেকে আধ লিটার দুধ নিতাম, দাম ছিলো যৎসামান্য, বোধহয় ছয় আনা। আমি আর দাদা দুজনেই সেই দুধ চিঁড়ে কলা দিয়ে মেখে প্রতিদিন সকালে প্রাতরাশ করতাম।

অনেকেই জানেন, আমার দাদা ছিলেন যাকে বলে একেবারে আলাভোলা মানুষ। বাজারে দোকানে লোকে সুযোগ পেলেই তাঁকে ঠকিয়ে দিতো।

দৈনিক সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার সময় হাজরার ফলের দোকান থেকে দুটো কলা কিনে আনি। আগের দিন বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছিলো, দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, একদিন কলা কেনা হয়নি।

পরদিন সকালে আমি দাদাকে বললাম, 'আমি দুধটা জ্বাল দিয়ে ফেলেছি। তুই ততক্ষণে মোড়ে গিয়ে দুটো কলা কিনে নিয়ে আয়।'

একটু পরেই দাদা দুটো কলা কিনে বাড়ি ফিরলো। যা ভেবেছিলাম তাই, দাদাকে ঠকিয়েছে, এ দুটোর মধ্যে একটা কলা পচা। দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন দোকান থেকে কলা এনেছিস?' দাদা বললো, 'কেন? আমাদের বুড়োর দোকান থেকে!'

আমি ক্ষুব্ধ হলাম। জানাশোনা দোকানদারের এই আচরণ?

পচা কলাটি হাতে নিয়ে তখনই ছুটলাম হাজরার মোড়ে। বুড়ো ফলওয়ালা তখন সদ্য দোকান খুলেছেন। একটা বাঁশের ঝুড়ি থেকে কাঁদি কলা বার করছেন মুখ কালো করে, প্রায় সব কলাই আমার হাতের কলার মত পচা।

আমি আমার হাতের কলাটি দেখিয়ে বুড়োকে বললাম, 'এই কলা আপনি দাদাকে দিয়েছেন?'

বুড়ো বললেন, 'তা দিয়েছি।'

আমি রেগে বললাম, 'আপনি এত চেনা লোক হয়ে কি করে এই কলা আমাদের দিলেন?'

বুড়ো বললেন, 'খোকন আমার কথা একবার ভাবো।'

আমি বললাম, 'কি ভাববো?'

বুড়ো বললেন, 'তোমাদের তো একটা, একটাই মাত্র পচা কলা। আর আমার যে এত পচা কলা, হাজার হাজার পচা কলা। আমার ওপর রাগ করা তোমার সাজে না।'

স্নেহের পাঠিকা,

কখনো লিচু, জাম বা খেজুর কিংবা কুল, যে সব ছোট ফল মুখে দিয়ে বিচি বার করে খেতে হয় নিশ্চয় খেয়েছো। হয়তো এই তুচ্ছ লেখা পড়তে পড়তেই খাচ্ছো।

ঘরে বিছানার ওপর কয়েকটা বালিসে পিঠ দিয়ে আলতো হেলান দিয়ে বসে আছো। আর ফলের বিচিগুলো মুখ থেকে বার করে একটা একটা করে বিচি জানলা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলার চেষ্টা করছো।

কিন্তু দুঃখের কথা প্রত্যেকটা বিচিই জানলার শিকে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে আসছে। তা আসুক, সাধারণত এমনই হয়। নিরাশ হয়ো না, ধৈর্য ধর।

এবার জানলার শিক টিপ করে বিচিগুলো ছুঁড়তে থাকো। দ্যাখো একটা বিচিও জানলার শিকে লাগছে না। সব অবলীলাক্রমে বাইরে চলে যাচ্ছে, ঘরে ফিরে আসছে না।

ইতি

পুনশ্চ ঃ

ফলের গল্প শেষ হয়েও শেষ হচ্ছে না।

শেষ মুহূর্তে একটা ছোটদের গল্প মনে পড়ছে।

শিশুদের একটি নার্সারি স্কুল। দিদিমণি পড়াচ্ছেন। নিতান্ত ছোট ছোট দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চা সব, মুখে মুখে ছোট ছোট যোগাবিয়োগ শিখছে। আধুনিকতা এবং নতুনত্বের মোহে আজকাল বাচ্চাদের মানে না বুঝে এবং অকারণে অসম্ভব সব নাম রাখা হয়। এই রকম একটি ক্ষুদ্র মেয়ে বাচ্চার নাম মন্দাক্রান্তা।

মন্দাক্রান্তাকে দিদিমণি সামান্য যোগের অংক ধরছেন। 'আচ্ছা মন্দাক্রান্তা, আমি যদি তোমাকে এখন এই এগারোটার সময় পাঁচটা লিচু দিই আবার বারোটার সময় আর পাঁচটা লিচু দিই তা হলে সবসুদ্ধু কয়টা লিচু হবে?'

মনে মনে একটু হিসেব কষে মন্দাক্রান্তা বললো, 'চৌদ্দটা হবে।' দিদিমণি প্রমাদ গনলেন, 'সে কি? পাঁচ আর পাঁচে চৌদ্দ হবে কি করে?'

মন্দাক্রান্তা কি আর করে, সে তখন তার টিফিন বাক্স খুলে দেখালো, 'এই যে বাড়ি থেকে আমাকে চারটে লিচু আগেই দিয়েছে। তাই পাঁচ, পাঁচ আর চারে চৌদ্দ হলো।' একটু থেমে সে দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ভুল হলো দিদিমণি?'

রবিবারের মহাভারত

আমার এই নিবন্ধের নামকরণ দেখে পাঠিকা যদি মনে করেন যে 'রবিবারের মহাভারত' হয়তো নতুন কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম, তাহলে সেটা ভুল হবে।

এ নিবন্ধ দূরদর্শনের মহাভারত নিয়ে, যা সারা দেশকে রবিবার সকালে বাড়ির মধ্যে বন্দী করে রাখতো।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের সেই বিখ্যাত বর্ণনা ঃ

…গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সারি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শতশত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ-নীচ অট্টালিকা।…বাজারে দোকান বন্ধ, হাটে হাট লাগে নাই। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না, গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখি না'…

মন্বন্তর-তাড়িত এক জনপদের প্রাচীন ছবি প্রতি রবিবার মহাভারতীয় সকালে বারবার ফিরে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র আরো বর্ণনা দিয়েছিলেন, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলে গেছে, তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করেছে, দাতারা দান বন্ধ করেছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করেছে, 'শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না।'

এক বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় আছে, মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুসংবাদ যখন পূর্বভারতে এসে পৌঁছল, সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট, সেরেস্তা-কাছারি, কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। রাস্তাঘাট, বাজার-হাট চারদিক শুনশান হয়ে গেল।

ইতিহাস এবং আনন্দমঠের ক্লাসিকত্বার পর মহাভারত-বৃত্তান্তকে প্রাণাধিকা চপলা পাঠিকার জন্যে কতটা লঘু করা যাবে বুঝতে পারছি না। আপাতত শিবরাম চক্রবর্তীকে স্মরণ করি।

আসল মহাভারত হল ব্যাসদেবের। আর বাংলায় কাশীদাসী মহাভারত, সতেরোজন পয়ারে রচিত সে এক অসামান্য কালজয়ী গ্রন্থ। উল্লেখযোগ্য এবং

স্মরণীয় মহাভারত রয়েছে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের এবং রাজশেখর বসুর।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও নিতান্ত এক অবান্তর কারণে স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তীকে মনে পড়ে যেতো রবিবার সকালে চোপরার মহাভারত দেখতে বসলে।

ঐ যে মহাভারতের শুরুতেই গীতার সেই বিখ্যাত 'মা ফলেষু কদাচন' শ্লোকটি উদাত্ত কণ্ঠে গাওয়া হত, বিনা কারণেই আমার তখন শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পটি মনে পড়তো।

গল্পটি একটু প্যাঁচালো। গল্পকারের এক বন্ধুর খুড়শাশুড়ি সদ্য পরলোক-গমন করেছেন। গল্পকারের মনে ধারণা হয়েছে যে বন্ধুটি নিশ্চয়ই শোকে অভিভূত ও মুহ্যমান হয়ে রয়েছে। খুড়শাশুড়ি-বিয়োগের এই গভীর শোকের দিনে প্রাণের বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে গল্পকার গীতার শ্লোক আওড়াতে লাগলেন বন্ধুর কাছে।

আসল ঘটনা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা বাহুল্য, খুড়শাশুড়ির শোকে বন্ধু মোটেই মুহ্যমান হয়ে পড়েনি। সে ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কিনেছে, মেট্রো সিনেমায় গ্রেটা গারবোর ছবি দেখতে যাচ্ছে।

সেই সময় লেখক তার কাছে গিয়ে তাকে শোনাচ্ছে গীতার বাণী, 'নৈনং ছিদ্রন্তি···সূঁচও ইহাকে ছিদ্র করিতে পারে না, আগুনও ইহাকে···' ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব শুনে বন্ধুটি একেবারে খেপে গেল। চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'ইহাকে-তাহাকে—কাহাকে? এসব কি হচ্ছে কি? আমার বাড়িতে এগুলো কি হচ্ছে?'

মহাভারতের আরম্ভে গীতার ঐ শ্লোক 'মা ফলেষু কদাচন···' শোনামাত্র প্রতি রবিবার সকালে শিবরামের গল্পের চরিত্রের মতো আমারও চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হতো, 'এসব কি হচ্ছে কি? আমার বাড়িতে এগুলো কি হচ্ছে?'

কিন্তু তা বলিনি। বরং শান্ত হয়ে বসে মহাভারত দেখেছি। রবিবার সকালে মহাভারতের সময়টা ছিল আমাদের বাড়িতে সকলের একসঙ্গে বাইরের ঘরে বসে নিঃশব্দে ছুটির দিনের জলখাবার খাওয়ার সময়।

খুব সুবিধে। এই সময় বাড়িতে কেউ আসে না। এমন কি ধোবা, নাপিত পর্যন্ত নয়। আমরা মনোযোগ দিয়ে মহাভারত দেখি এবং খাই। কৃষ্ণের মাখনচুরি দেখতে দেখতে মাখন না-মাখানো পাঁউরুটি, জিলিপি আর সিঙ্গাড়া কিংবা নিমকি দিয়ে প্রাতরাশ সারি।

একদিন একটু ব্যতিক্রম হল। মহাভারত শুরুর দিকের ঘটনা এটা। সবে শিশু শ্রীকৃষ্ণ বালকে পরিণত হতে যাচ্ছেন, পটভূমিকায় কিশোরী শ্রীরাধিকাকেও দেখা যাচ্ছে। বাইরের ঘরের টেবিলে যথারীতি পাঁউরুটি জিলিপি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে, আমরা খেতে আরম্ভ করতে যাচ্ছি, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

কে হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমি একটু বিব্রত হয়েই দরজা খুললাম। খুলে দেখি হীরক দাঁড়িয়ে আছে, সে আমার এক পুরনো বন্ধু।

হীরক ঘরে ঢুকে আমরা মহাভারত দেখছি দেখে পরম বিরক্তি প্রকাশ করল। 'তোমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে এই রাবিশ মহাভারত দেখছ!' গজগজ করতে

করতে সে পাশের একটা খালি চেয়ারে বসল। তারপর বলল, এ পাড়াতেই কোনো এক ডাক্তারকে দেখাতে এসেছে। কিন্তু ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ, দরজায় নোটিশ লাগানো আছে ঃ 'মহাভারত চলাকালীন রোগী দেখা বন্ধ।'

মহাভারতের ওপরে হীরক অত্যন্ত খাপ্পা। ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকতে না পেরে সে সময় কাটানোর জন্যে পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেখানেও বেয়ারা, বয়, দোকানদার সবাই পাশের বাড়ির জানলা দিয়ে 'মহাভারত' দেখায় ব্যস্ত। অবশেষে বাধ্য হয়ে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও হীরক আমাদের বাড়িতে এসেছে। কিন্তু এখানেও সেই মহাভারত।

হীরক গজগজ করতে লাগল এবং গজগজ করতে করতেই হাতের সামনের থালা থেকে পাঁউরুটি, জিলিপি, নিমকি তুলে তুলে খেতে লাগল।

একসময় মহাভারত এবং হীরকের খাওয়া শেষ হল। আমরা বাড়ির কেউই কিছু খাইনি। বড়জোর এক স্লাইস রুটি বা একটা জিলিপি। বাকি সবটা হীরক গলাধঃকরণ করেছে। অবশেষে পর পর দু গেলাস জল খেয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'যাই। ডাক্তারের চেম্বার বোধহয় এবার খুলল।'

ভদ্রতার খাতিরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ডাক্তারের কাছে কেন যাচ্ছ? তোমার কী হয়েছে?' হীরক বলল, 'আর বোলো না। একদম খিদে হয় না, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।'

আমরা হতবাক হয়ে পারিবারিক প্রাতরাশের শূন্য থালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মহাভারতের কৃপায় চারজনের খাবার হীরক একা খেয়েছে, এবার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে আরো খাবারের প্রয়োজনে।

পুনশ্চ একটি বিদেশী গল্প ও উপসংহার ঃ

দুটি ক্যাথলিক শিশু নিজেদের মধ্যে ধর্ম-আলোচনা করছিল। প্রথমজন যাজকের সন্তান। সে বলল, 'রবিবার কাজ করা মহাপাপ।' দ্বিতীয়জনের বাবা পুলিসে কাজ করেন। সে প্রশ্ন করল, 'কেন, রবিবার কাজ করলে কী হবে?' যাজকতনয় উত্তর দিল, 'স্বর্গে যেতে পারবে না।' দ্বিতীয়জন জানাল, 'আমার বাবাকে যে রবিবার কাজ করতে হয়।' যাজকতনয় কিঞ্চিৎ চিন্তা করে বলল, 'তা করুক। তোমার বাবার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নেই, স্বর্গে পুলিস দিয়ে কী হবে?'

গল্পটি নিমিত্তমাত্র। আসল কথা হল খ্রীষ্টানরা অনন্তকাল চেষ্টা করে যাচ্ছেন রবিবারকে ধর্মবার করতে, শুধু ধর্মের জন্যে, কোনো ঐহিক কাজের জন্যে নয় সাবাথ বা রবিবার।

রবিবারের সকালে প্রথম সাগরের রামায়ণ এবং চোপরার মহাভারত ভারতীয়দের সেই ধর্মবারে পেঁাছে দিয়েছিল।

আইনের আঙিনায়

গল্পটা অন্তত একবার লিখেছিলাম আগে, বোধহয় 'বিদ্যাবুদ্ধি'তে।

ধরে নিচ্ছি, তখন কেউ-কেউ হয়তো গল্পটা পড়েননি, আর যাঁরা পড়েছিলেন তাঁরাও ভুলে গেছেন।

গল্পটা একটু সাবধানে লিখতে হবে, আইন-আদালতের ব্যাপার, সামান্য এদিক-ওদিক হলে আর রক্ষে নেই।

এক ব্যক্তি এক ফৌজদারি মামলার উকিলের চেম্বারে এসেছে সন্ধ্যাবেলা। চুরির মামলায় লোকটি গতকালই বহু কষ্টে জামিন পেয়ে হাজত থেকে খালাস পেয়েছে। আগের উকিল তার পছন্দ হয়নি।

খালাস পাওয়ার পর অন্যদের পরামর্শ শুনে সে আজ এই নতুন উকিলের কাছে এসেছে। উকিলবাবু এই লোকটিকে দেখে বুঝতে পারলেন, এর এমন কিছু কথা আছে, যা সর্বসমক্ষে আলোচনা করা যাবে না। লোকটিকে তিনি ইশারায় অপেক্ষা করতে বললেন। উকিলবাবুর জমজমাট পশার। অনেক রাত হল চেম্বার খালি হতে। অবশেষে শূন্য চেম্বারে মুখোমুখি বসে উকিলবাবু মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কেসটা কিসের?'

লোকটি অম্লান বদনে জবাব দিল, 'আজ্ঞে চুরির।'

এরকম জবাব শোনা উকিলবাবুর অভ্যেস আছে। পরবর্তী প্রশ্ন মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী চুরির?'

মক্কেল উত্তর দিল, 'আজ্ঞে এক কেস বিলিতি হুইস্কির।'

উকিলবাবু একথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'তা কেসটা কোথায়?' সেই হুইস্কির কেসের তথা চুরির কেসের শেষে কী হল, তা আমরা জানি না। অন্য একটা গল্প জানি।

আদালতে একটা মামলা কতদিন ধরে যে চলে তার ইয়ত্তা নেই। শোনা যায়, কলকাতা হাইকোর্টে এমন সব মামলা আছে, যেগুলি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরনো।

সুদর্শনবাবু বলে আমার এক বন্ধু একবার এক গোলমেলে মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। টাকাপয়সা বেশি নেই ভদ্রলোকের, কিন্তু একজন উকিল না-হলে তো মামলা করা যায় না।

আমার পরিচিত একটি ছেলে, আমাদের পুরনো পাড়ার প্রতিবেশীর ছেলে, তখন সদ্য উকিল হয়েছে, গাউন কাঁধে আদালতে যাতায়াত শুরু করেছে। আমি তার কাছে সুদর্শনবাবুকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু উকিল দেখে সুদর্শনবাবু মোটেই খুশি হলেন না। একেবারেই ভারভারিক্কি নয়, নিতান্ত বাচ্চা উকিল।

উকিলের সামনে মুখে বলেও ফেললেন কথাটা সুদর্শনবাবু। 'তুমি এত তরুণ, এত অল্পবয়েসী, তা আমি ভাবিনি। তুমি কি আমার মামলাটা করতে পারবে?' 'তুমি' করেই বললেন সুদর্শনবাবু।

তরুণ উকিলটি কিন্তু সহজে মক্কেল ছাড়বার পাত্র নয়। একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তারপর সুদর্শনবাবুকে বলল, 'আগে দেখুনই না মামলাটা কতদিন ধরে চলে, মামলা শেষ হতে-হতে আমি প্রবীণ হয়ে যাব।'

আদালতি সময়ের আরো একরকম ব্যানার আছে।

এক মারামারির মামলা চলছে আদালতে। সাক্ষীর জেরা শেষ হতে-হতে দেড়টা বাজল। এবার কিছুক্ষণ বিরতি। এরপর আবার আড়াইটের সময় আদালত বসবে। তখন উকিলবাবুরা যাঁর যাঁর বক্তৃতা পেশ করবেন। তবে সাক্ষীর জেরা হয়ে যাওয়ার পরে মামলার আর বিশেষ কিছু থাকে না। মোটামুটি বোঝা যায় মামলার ফলাফল কী হবে।

এরকম একটি মামলায় কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো আসামী সাক্ষীর জেরা হয়ে যাওয়ার পর বিরতির সময় জনান্তিকে তার উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'স্যার, আর কতক্ষণ লাগবে।'

একটু ভেবে উকিলবাবু বললেন, 'আমার বোধহয় পনেরো মিনিট আর তোমার বোধহয় দু'বছর।'

অর্থাৎ, উকিলবাবু বুঝতে পেরেছেন যে, তার মক্কেলের অন্তত দু'বছর সাজা হবে।

এই উকিলবাবুর কথাই কিনা সেটা হলফ করে হয়তো বলতে পারব না, তবে আরেকটা গল্পও জানি।

এক আদালতের বার লাইব্রেরির মেম্বাররা অর্থাৎ মাননীয় উকিলবাবুরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁরা কেউই কখনো কোনো মক্কেলের কাছ থেকে বত্রিশ টাকার কম ফি নেবেন না।

হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল, জনৈক ব্যবহারজীবী তাঁর মক্কেলের কাছ থেকে মাত্র উনিশ টাকা ষাট পয়সা পারিশ্রমিক নিয়েছেন।

বিশেষ জরুরি অধিবেশন বসল মাননীয় বার লাইব্রেরির—রীতিমতো জেনারেল মিটিং, সমস্ত উকিলবাবু সেখানে উপস্থিত।

অভিযুক্ত উকিলবাবুকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করা হল, 'যেখানে নিম্নতম ফি বত্রিশ টাকা ধার্য করা হয়েছে, আপনি কেন কম নিলেন ?'

এক প্রবীণ উকিল প্রশ্ন করলেন, 'শুধু কম নয়, আপনি কী করে উনিশ টাকা ষাট পয়সার মতো এমন হাস্যকর ফি নিলেন। অন্তত বিশ টাকাও তো নিতে পারতেন।'

উক্ত প্রবীণ উকিলের উদ্দেশে উনিশ টাকা ষাট পয়সার উকিলবাবু বললেন, 'দাদা, এছাড়া কোনো উপায় ছিল না।'

একসঙ্গে পুরো বার লাইব্রেরি গর্জে উঠল, 'কেন ?'

উনিশ টাকা ষাট পয়সার উকিলবাবু আবার বললেন, 'উপায় ছিল না।'

একসঙ্গে পুরো বার লাইব্রেরি আবার গর্জে উঠল, 'উপায় ছিল না কেন ?'

উকিলবাবু বললেন, 'কারণ আমার মক্কেলের এর চেয়ে বেশি পয়সা ছিল না।

যা ছিল সবই আমি নিয়েছি।'

অতঃপর বার লাইব্রেরির সমস্ত সদস্য, সব উকিলবাবু 'ধন্য ধন্য' করতে লাগলেন, কারণ একজন উকিল এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারেন ?

এতসব অবমাননাকর আখ্যানের অবশেষে একটি নিতান্ত সরল ও সত্য কাহিনী নিবেদন করা যায়।

ফৌজদারি আদালতের কাঠগড়ায় আসামী মামলা শেষ হওয়ার আগেই, তাঁর পাশের উকিলবাবুর আরগুমেন্ট আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আদালতের উদ্দেশে নিবেদন করল, 'হুজুর, আমি স্বীকার করছি, আমিই দোষী।'

এই স্বীকারোক্তি শুনে চমকে উঠলেন আসামী পক্ষের দুঁদে উকিল, ছুটে গেলেন তাঁর মক্কেলের কাছে। বললেন, 'আপনি প্রথমেই এই স্বীকারোক্তি করলেন না কেন ? আমাদের অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত।'

আসামী বলল, 'স্যার, আমি জানতাম আমি নির্দোষ। তাই পয়সা খরচ করে আপনাকে রেখেছিলাম। কিন্তু এই মামলার সাক্ষীদের কথা শুনে আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, আমি নিশ্চয়ই নির্দোষ নই।'

পুনশ্চ

অনেকক্ষণ ধরে খুব মনোযোগ দিয়ে মক্কেলের সমস্ত কথা শুনলেন ব্যারিস্টার সাহেব। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকিয়ে মক্কেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি কি জানেন যে আপনি যেটা করতে চাইছেন, সেটা সম্পূর্ণ বেআইনি ?'

একটুও দ্বিধা না করে মক্কেল জবাব দিলেন, 'সেটা জানি বলেই তো আপনার কাছে এসেছি।'

খাজনা খাজনা

খাজনা বা খাজানা শব্দটি আরবী। আরবীতে মূল শব্দটি 'খজানহ'। আরো বহু আরবী শব্দের মতো এই শব্দটিও বাংলায় চমৎকার মিলে গেছে, প্রবাদবাক্যই রচিত হয়েছে—'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি'।

খাজনা শব্দের প্রকৃত অর্থ জমা, রাজস্ব বা কর। বাংলা ভাষায় খাজনা বলতে অবশ্য লোকে জমির খাজনাই বোঝে, যাকে বলে ভূমিরাজস্ব। এই খাজনার কথাই সেই বহুশ্রুত বহুগীত প্রাচীন ঘুমপাড়ানি ছড়ায় বলা হয়েছে—

'খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো
বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে ?'

এই খাজনা, ভূমিরাজস্ব আগে জমিদারের তালুকদারের প্রাপ্য ছিল, এখন সরকারের প্রাপ্য। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক কালে এই খাজনা অর্থাৎ ভূমি-

রাজস্ব লুপ্ত হয়েছে বা ছাড় দেওয়া হয়েছে।

একালে সরকারি প্রধান প্রধান আয়ের তালিকায় খাজনার বদলে এসেছে কর, বিক্রয়কর, সম্পদকর, আয়কর ইত্যাদি। আসলে এগুলোও খাজনা—জনসাধারণ কর্তৃক সরকারকে প্রদেয়, এই খাজনার টাকাতেই সরকার চলে, রাজকর্মচারীরা মাইনে পায়, সমাজকল্যাণমূলক কাজের অর্থ সংগ্রহ হয়, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হয়, মন্ত্রী-আমলারা গাড়ি চড়েন, হাসপাতাল বিশ্ববিদ্যালয় চলে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইসব কর দিতে লোকের বড় গায়ে লাগে, কেই-বা চায় কষ্টের টাকা সরকারের হাতে তুলে দিতে।

এক বিখ্যাত চিত্রতারকা, যাঁর আয়কর ছিল সেই সত্তরের দশকে সাতের অঙ্কে অর্থাৎ মিলিয়নে, তাঁকে একদা জনৈক রিপোর্টার সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, আপনি যদি এখন হঠাৎ মারা যান, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে কার?' অম্লানবদনে বলেছিলেন, 'আয়কর দপ্তরের।'

হালকা রচনায়, এরকম তরল নিবন্ধে মৃত্যুর প্রসঙ্গ নাকি না-আনাই নিয়ম। কিন্তু পাঠিকা ঠাকুরানি, তুমি তো আমার স্বভাব জানো, প্রসঙ্গ যখন এসেই পড়েছে একটু ছুঁয়ে যাই, না-হয় একটু হালকাভাবেই ছুঁয়ে যাই।

শ্যামচাঁদবাবু খুবই বিত্তশালী ব্যক্তি, বহু লাখপতি। তিনি একদিন যথানিয়মে মারা গেলেন। এবং তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্র অর্থ দপ্তরের অর্থাৎ আয়কর, সম্পদকর, ইত্যাদি বিভাগের অফিসাররা তাঁর সম্পত্তি, আয়, বকেয়া কর ইত্যাদি নিয়ে খুবই দৌড়ঝাঁপ শুরু করলেন। অবশেষে তাঁর আত্মীয়স্বজনের ওপরে আমলারা চড়াও হলেন, দাবি করলেন শ্যামচাঁদবাবুর উইল দেখাতে, কারণ ঐ দলিলের মধ্যেই শ্যামচাঁদবাবুর আয় ও বিত্তের যথার্থ বিবরণ পাওয়া যাবে।

শ্যামচাঁদবাবুর উইল দেখে কিন্তু আত্মীয়স্বজনসহ কর দপ্তরের আমলাদের চক্ষুস্থির, এমন উইল তাঁরা কখনো দেখেননি, সেখানে শ্যামচাঁদবাবু স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন—

…'সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে আমি আমার সমস্ত সম্পদ, বিত্ত, অর্থ, টাকাপয়সা, কড়িগণ্ডা প্রাণের আনন্দে ব্যয় করিয়া গেলাম, আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।'…

কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকলে অবশ্য শ্যামচাঁদবাবু রেহাই পেতেন না।

শরবতের সঙ্গে লেবু খুবই উপাদেয়। বহুকাল আগে সেই আমার নবীন যৌবনে কলেজ স্কোয়ারের একটা শরবতের দোকানে একদিন আমার সঙ্গে ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ স্বর্গত বিমল রায়চৌধুরী। দুজনে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসেছিলাম। তখন একেকটা দ্বিখণ্ডিত লেবুর টুকরোর দাম ছিল পাঁচ পয়সা। এবং পাঁচ পয়সার দাম অনেক। শরবতের সঙ্গে লেবুর টুকরোর আলাদা দাম দিতে হত। আমরা একটা করে লেবুর টুকরো নিয়ে দু'জনে নিংড়ে গেলাসে রস ঢেলে পরিত্যক্ত খোসা টেবিলে ফেলে রাখছিলাম। দু-তিন গেলাস করে শরবত আমরা খেয়েছিলাম। আমার পাশেই এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, ফিটফাট পরিচ্ছন্ন জামাকাপড়-

পরা খুব আলতো করে লস্যি খাচ্ছিলেন, এবং আরেকটা কাজ করছিলেন, যতবারই আমরা নিংড়ানো লেবুর টুকরোটি ফেলে দিচ্ছিলাম, তিনি সেটা তুলে নিয়ে তর্জনী, মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে একটা আশ্চর্য কৌশলে সামান্য একটা প্যাঁচ দিয়ে অন্তত তিন-চার ফোঁটা রস করে নিজের গেলাসে নিচ্ছিলেন।

এ-জাতীয় যোগ্যতা বিমল রায়চৌধুরীমশায় কিংবা আমি কেউই কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। বার তিনেক এরকম হওয়ার পরে অবশেষে রায়চৌধুরী মশায় ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, একটা প্রশ্ন করতে পারি ?'

সেই দাদা বললেন, 'অবশ্যই।'

রায়চৌধুরীমশায় বললেন, 'দাদা কি ইনকাম ট্যাক্সো ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন ?'

সেই দাদা বললেন, 'অবশ্যই।'

দুশো বছর আগে সেই সতেরোশো উননব্বুই সালে একটি চিঠিতে মার্কিন মনীষী বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন লিখেছিলেন, 'এই জগতে মৃত্যু ও ট্যাক্স ছাড়া আর সবই অনিশ্চিত।'

ইংরেজিতে এই 'ট্যাক্স' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন থেকে, মূল শব্দটির যথার্থ অনুবাদ হল 'তীক্ষ্ণভাবে স্পর্শ করা'। একথার মানে অবশ্য যথেষ্টই স্পষ্ট, সব করদাতাই সেটা জানেন এবং যথাসময়ে হাড়ে-হাড়ে টের পান।

আমরা আর কোনো দুঃখজনক ঘটনায় যেতে চাই না। তবে একটি অতি পুরনো কিন্তু গভীর অর্থবহ আখ্যান স্মরণ করছি।

একটি ছোটো ছেলে একটি সিকি গিলে ফেলেছিল। সেটা ঘোর দুপুরবেলা। পাড়ার ডাক্তারবাবুরা তখন যে-যার মতো কলে বেরিয়েছেন। বাড়ির পুরুষ-মানুষরাও সব অফিস-কাছারিতে। এই অঘটনে বাড়ির মহিলারা, শিশুটির মা, কাকিমা, ঠাকুমা ইত্যাদিরা চিৎকার-চেঁচামেচি, কাঁদাকাটি শুরু করে দিল।

সেই কাঁদাকাটি শুনে রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন, তিনি বাড়ির দরজায় উঁকি দিলেন। বাড়ির কাজের লোক, জনৈকা পরিচারিকা সেই ভদ্রলোককে ভুল করে ডাক্তার ভেবে বাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে এল।

এবং আশ্চর্যের কথা, ভদ্রলোক যখন শুনলেন শিশুটি একটি সিকি গলাধঃকরণ করেছে, তিনি অভিজ্ঞ হাতে ছেলেটিকে পায়ে ধরে উলটো করে ঝুলিয়ে তার গলা টিপে ধরলেন।

বার কয়েক এরকম করার পর হঠাৎ খুট করে গলাস্থ সিকিটি বেরিয়ে এসে বাঁধানো উঠোনে পড়ে টুং করে উঠল।

কার্য সমাধান করে আগন্তুক ভদ্রলোক ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তাড়াতাড়ি শিশুটির মা ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে বত্রিশটা টাকা বার করে এনে ঐ ভদ্রলোককে ডেকে এনে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, এই যে আপনার ভিজিটটা।'

ভদ্রলোক কিন্তু টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলেন। বললেন, 'ভিজিট আবার কিসের। আমি তো ডাক্তার নই।'

এবার সকলের অবাক হবার পালা। সবাই সমস্বরে বলল, 'তাহলে ?'

ভদ্রলোক মুচকি হেসে বললেন, 'আমি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করি। আমার ডিউটিই হল লোকের গলা টিপে পয়সা বার করা। এ তো সামান্য শিশু।'

বুদ্ধি

আমি গরিব মানুষ। আমার আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। আয়ব্যয়ের ভয়াবহ পার্থক্য আমাকে বুদ্ধিখরচ করে মেটাতে হয়। টাকার অভাবে বুদ্ধি খরচ করি।

বুদ্ধি ব্যাপারটা খুব জটিল। যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। বিদ্যা, অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি হয়তো চেষ্টা করে বাড়ানো যায়, বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ব্যাপারটা অটল অনড়। তার আর বাড়াকমা নেই। অতি বার্ধক্যে সেনিলিটি বা মানসিক জড়তা না-আসা পর্যন্ত যার যতটুকু বুদ্ধি আছে, তার খুব কমতি হয় না। এই তো সেদিন বুদ্ধির ব্যাপারটা উঠেছিল ভারতীয় সংসদে। জনৈক মাননীয় সংসদ-সদস্য সদাসর্বদা টুপিপরা আমাদের মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীকে কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই গরমে মাথায় টুপি পরে থাকেন কী করে? অস্বস্তি হয় না, কষ্ট হয় না?'

এই অ-সংসদসুলভ প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী সরস জবাব দিয়েছিলেন, 'আরে মশায়, টুপি নয়, টুপির নিচের জিনিসটাই আসল কথা।' টুপির নিচে মাথা, মাথা মানেই বুদ্ধি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টুপির বদলে প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে তাঁর বুদ্ধির দিকে নিয়ে গেছেন।

র‍্যালফ ওয়ালডো ইমারসন একদা বলেছিলেন, 'বুদ্ধিমান মানুষের নির্বোধকে মানুষের ব্যাপারে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকারটা হল নির্বোধকে পরামর্শ দেওয়া।'

বুদ্ধি বিষয়ে আরো-একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন অন্য এক বিদেশী প্রবন্ধ-কার। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, বুদ্ধি হল টাকার মতো। যতক্ষণ-না লোকে জানতে পারছে তোমার কতটা আছে, ধরে নিচ্ছে তোমার অনেক আছে।

কথাটা অবশ্য খুব সরল নয়। সোজা ব্যাপার হল—যার তেমন বুদ্ধি নেই, তার চুপচাপ থাকাই ভালো। তার বুদ্ধির দৌড় দেখলে লোকে বুঝে যাবে যে সে নির্বোধ। কিন্তু সে যদি বুদ্ধি প্রকাশ করতে না যায়, তাহলে হয়তো তাকে সবাই বুদ্ধিমান বলেই বিবেচনা করবে।

আমাদের ছোটবেলায় "বুদ্ধির অঙ্ক" বলে একটা সমস্যা ছিল, হয়তো এখনো আছে।

সে এক ভয়াবহ ব্যাপার।

এক তেলতেলে বাঁশ বেয়ে বাঁদর উঠছে। সেই বাঁদর মিনিটে তিন ফুট ওঠে, আবার পরের মিনিটে আড়াই ফুট নেমে যায়। কতক্ষণে সে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার বংশদণ্ডের শীর্ষে পেঁছিবে।

শ্রীমতী লীলা মজুমদারের গল্পে পড়েছি—এক সরেস ছাত্র এই অঙ্কের উত্তর

মার করেছিল আড়াইখানা নাকি সাড়ে তিনখানা বাঁদর।

হয়তো অনেকেরই মনে আছে, আরো সব নানারকম বুদ্ধির অঙ্ক ছিল—চৌবাচ্চায় দুই নল দিয়ে দুই ধারায় জল ঢুকছে আর ফুটো দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, কতক্ষণে চৌবাচ্চা পূর্ণ হবে, কিংবা সেই অনৈতিক জিজ্ঞাসা, কতটা খাঁটি তেলে কতটা ভেজাল তেল মেশালে কত লাভ।

বুদ্ধির অঙ্ক নিয়ে আর এগিয়ে লাভ নেই। আমার সাহসও নেই, এ আমার বিষয় নয়, এ-বিষয়ে আমি একেবারে কাঁচা। বরং বুদ্ধির গল্পে যাই।

সেদিন এক সাহিত্যবাসরে বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত পরিতোষ সেন একটা গল্প বলেছিলেন। একবার এক চিত্রপ্রদর্শনীতে এক বালকের আঁকা একটি ছবি দেখেছিলেন। সেই ছবিতে আছে গভীর বনের মধ্যে একটি লোক ঢুকেছে, কিন্তু বনের ওপরে যে আকাশ, সেই আকাশে চাঁদ ও সূর্য দুই-ই রয়েছে।

পরিতোষবাবু বালকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এটা কী করে সম্ভব? একই সঙ্গে দিনরাত, আকাশে চাঁদ আর সূর্য?'

বুদ্ধিমান বালকটি এই প্রশ্নের একটি অসম্ভব উত্তর দিয়েছিল। সে বলল, ছবির ঐ লোকটি জঙ্গলে ঢুকেছে দিনের বেলায়, তখন আকাশে সূর্য ছিল কিন্তু তার জঙ্গল থেকে বেরোতে বেরোতে রাত হয়ে গেছে, চাঁদ উঠে গেছে, তাই জঙ্গলের ওপরে আকাশে একসঙ্গে প্রথমে সূর্য আর পরে চাঁদ এঁকে দিয়েছি।

এরপর এক ভুবনবিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে নিয়ে একটি বুদ্ধির গল্প। তবে তার আগে নিউটনসাহেবের সেই মজার ঘটনাটি মনে করিয়ে দিই।

নিউটনসাহেব তাঁর পোষা খরগোশের জন্যে একটি বাক্স বানিয়েছেন। দুটো খরগোশ। একটা বড় খরগোশ আর একটা ছোট খরগোশ। নিউটনসাহেবের বাক্সে দুটো দরজা, একটা বড় দরজা, একটা ছোট দরজা। সবাই জানতে চাইল—দুটো দরজা কেন। নিউটন ব্যাখ্যা করলেন, 'বাঃ রে! খরগোশ যে দুটো। এই বড় দরজা দিয়ে বড় খরগোশটা ঢুকবে আর ছোট দরজা দিয়ে ছোট খরগোশটা।' অতবড় বৈজ্ঞানিককে কে বোঝাবে যে শুধু বড় দরজাটা থাকলেই হত, ছোট বড় দুটো খরগোশই সেই দরজা দিয়ে যাতায়াত করতে পারত। ছোট খরগোশের জন্যে আলাদা ছোট দরজা অপ্রয়োজনীয়।

অতঃপর যে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের প্রসঙ্গে আসছি, তিনি সত্যেন বসু। এই সাদাসিধে, উদার প্রকৃতির, সরলচিত্ত, দিলখোলা মানুষটিকে অনেক সময়েই দেখা যেত কলকাতার ট্রামে-বাসে সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করছেন। তাঁর যে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি, তিনি যে বৈজ্ঞানিকদের বৈজ্ঞানিক—একথা তাঁকে দেখে বোঝা যেত না। তাঁর নিজেরও হয়তো খেয়াল থাকত না।

সে যা হোক, একবার তিনি একটা প্রাইভেট বাসে চড়ে আসছেন, কলেজ স্ট্রিটের মোড়ে নামবেন। পরনে বাঙালি বেশ, একমাথা পাকা চুল। নামার সময় তাঁর কামিজের পকেট বাসের দরজার হ্যান্ডেলে আটকে গেছে। তিনি সামনের দিকে এগোতে পারছেন না। টানাটানি করছেন পকেটটাকে।

তখন বাসের কণ্ডাক্টর তাঁকে একটু পিছিয়ে এসে বাসের হ্যান্ডেল থেকে

পকেটটা ছাড়িয়ে নিয়ে নামতে পরামর্শ দিল। সেই পরামর্শমতো সঙ্গে সঙ্গে পকেটটা হ্যাণ্ডেল থেকে ছেড়ে গেল, সত্যেন বসু বাস থেকে নেমে গেলেন। নামতে নামতে শুনতে পেলেন চলমান বাস থেকে কণ্ডাক্টর তাঁর পাকামাথার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'এত বয়েস হল আপনার এখনো ব্রেনটাকে খাটাতে শিখলেন না।'

আরেকটা আখ্যান বাকি আছে। সেটা আমার নিজেকে নিয়ে।

কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে একটা ছোট গ্রাম্য বাড়ি ছিল আমার। সেই বাড়ির ভেতরের উঠোন কুপিয়ে একটা তরকারির বাগান করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু অসুবিধে হল প্রতিবেশীর পায়রাগুলোকে নিয়ে।

কোপানো উঠোনে ডাঁটা আর মুলো চাষ করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু যেই ডাঁটার আর মুলোর বিচি ছড়িয়ে দিই, পায়রাগুলো এসে খুঁটে-খুঁটে সেগুলো খেয়ে যায়। দু'বার-তিনবার এরকম হল।

যে-গোয়ালা আমাকে দুধ দেয়, সে একদিন সকালে আমার দুর্দশা দেখে বলল, 'একটু বুদ্ধি খরচ করুন।' আমি বললাম, 'কীরকম?'

গোয়ালা তখন তার দুধের বালতিটি বারান্দায় নামিয়ে রেখে বাগানের পাশে আমার কাছে এল। তারপর মুষ্টিবদ্ধ হাত শূন্যে ছুঁড়ে খুলে ঢেলে এমন ভঙ্গি করল যেন বীজ ছিটিয়ে দিচ্ছে। পায়রাগুলো সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাগানে। কিন্তু বীজ খুঁজে না পেয়ে আবার গিয়ে সামনের গাছে বসল।

গোয়ালা পরপর তিন-চারবার কয়েক মিনিট অন্তর এইরকম বীজ ছোঁড়ার ভঙ্গি করল। প্রত্যেকবারই পায়রাগুলো নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। অবশেষে শেষের বার আর জব্দ হওয়ার ভয়ে গাছ থেকে নামলো না। তখন গোয়ালা আমাকে বলল, 'এবার বীজ বুনে দিন, ওরা আর খেতে আসবে না।'

সত্যিই তাই হল, বুদ্ধিরই জয় হল।

জবাব

"জবাব নেই" কথাটা তখনই ওঠে যখন কেউ জবাবের মতো জবাব দেয়। তার মানে এমন জবাব, যার আর কোনো উত্তর নেই, একেবারে শেষ কথা।

জবাব শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে আরবি থেকে, যার মানে ব্যাখ্যা, কৈফিয়ত বা ডিসমিসাল (Dismissal)।

যখন আন্দোলনকারীরা, মুষ্টিবদ্ধ উর্ধ্ববাহু মিছিলে স্লোগান তোলেন "জবাব দাও", তখন তাঁরা কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত দাবি করছেন। কোনো প্রশ্নের যখন জবাব দিচ্ছি সেটা উত্তর, ব্যাখ্যা। আবার মনিব যখন চাকরি থেকে ডিসমিস করেছেন তখন তিনি জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

দেওয়ানি আদালতে বিবাদীর উকিলবাবু তদীয় অভিযোগের লিখিত জবাব দেন, তখন তাকে বলে জব দেওয়া। খুব সম্ভব সেটা এই আরবি জবাব শব্দটিরই অপভ্রংশ। শব্দতত্ত্বের জটিলতা নয়, এবার অতি দ্রুত আমরা সরস জবাবে যাব।

এক ভদ্রলোক তাঁর বাড়িতে কিছু বন্ধুবান্ধবকে নৈশভোজে নেমন্তন্ন করেছিলেন। পরদিন সকালে ভদ্রলোক মর্ণিং ওয়াকে পার্কে গেছেন, আগের দিন বাড়িতে হৈচৈ হয়েছে, তাই তাঁর পার্কে যেতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিলো। তিনি যখন পার্কে ঢুকছেন এক বন্ধু পার্ক থেকে বেরোচ্ছে।

বন্ধুটি ভদ্রলোককে দেখে বললেন, 'দ্যখ্যো কাণ্ড, কাল রাতে তোমার বাড়ির পার্টির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।' ভদ্রলোক তাই শুনে জবাব দিলেন, 'ও তুমি আসোনি বুঝি কাল রাতে।' মনে হলো তুমি যদি আমার নেমন্তন্ন ভুলতে পারো তবে তুমি এসেছো কি আসোনি সেটাও আমি খেয়াল রাখবো না।

পরের আখ্যানটি নারীঘটিত, একেবারে সরাসরি।

দুই বাল্যসখী, ছোট বয়েস থেকেই দুজনের মধ্যে খুব আড়াআড়ি। তা ভাগ্যক্রমে এদের মধ্যে একজন চিত্রতারকা হয়েছে। ধরা যাক তার নাম চিত্রা। অন্যজন লেখিকা হয়েছে, ধরা যাক তার নাম লেখা।

এক মজলিসে চিত্রার সঙ্গে লেখার দেখা।

চিত্রা লেখাকে বললো, 'তোমার নতুন বইটা খুব ভালো হয়েছে। বইটা তোমার হয়ে কে লিখে দিয়েছে?'

চিত্রার এই শ্লেষের জবাবে লেখা বললো, 'বইটা তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু তুমি তো আর পড়াশোনা শিখলে না, বইটা তোমাকে কে পড়ে শোনালো। টাকা পয়সা তো হয়েছে, পড়ার লোক রেখেছো বুঝি!'

সবচেয়ে ধারালো জবাবকে বলা হয় জুতোর বাক্সের মত জবাব। জুতোর বাক্স যেমন সামনে-পিছনে কাছে-কাছে দুটো জুতো একের ওপরে অন্যটা মিলে থাকে ধারালো জবাব ঠিক সেই ভাবে পরতে পরতে মিলে যায়।

এর বিখ্যাত উদাহরণ হলো জি কে চেসটারটন এবং জর্জ বারনার্ড শ—এই দু'জনের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যালাপ।

একদা এক আসরে শীর্ণদেহ বারনার্ড শকে জি কে চেসটারটন পরিহাস করে বলেছিলেন, 'তোমাকে দেখলে মনে হয় দেশে যেন দুর্ভিক্ষ চলছে।'

বিশাল বহর, স্ফীতোদর, স্থূলদেহী চেসটারটনকে বারনার্ড শ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তা বটে। তবে সেই সঙ্গে তোমাকে দেখলে দুর্ভিক্ষের কারণটা লোকের ধরতে মোটেই অসুবিধে হবে না।' অর্থাৎ সমস্ত খাবার খেয়ে নিয়ে চেসটারটন দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছেন।

প্রায় এই জাতেরই আরেকটা গল্প এক তামিল আর তেলেগু ভদ্রলোককে নিয়ে।

সবাই জানেন এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ রেষারেষি, যেমন সামাজিক পর্যায়ে তেমনিই ব্যক্তিগত পর্যায়ে, তবে হিংসাত্মক নয়।

সে যা হোক, তামিল ভদ্রলোক একটি বানর জাতীয় জন্তু পুষেছেন। ঠিক বানর নয় দো-আঁশলা। তেলেগু ভদ্রলোক পাশের বাড়িতে থাকেন, তিনি কৌতূহল-বশত একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি জাতের বানর?'

তামিল ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে এটা হলো দো-আঁশলা। এর অর্ধেক হলো,

হনুমান আর বাকিটা হলো তেলেগু।'

তেলেগু ভদ্রলোক তখন বললেন, 'বাঃ তাহলে তো বেশ ভালো কথা। এর সঙ্গে দেখছি আমার আর আপনার দু'জনেরই রক্তের সম্পর্ক আছে।'

আরেকটা আখ্যান মনে পড়ছে।

একবার এক সন্ন্যাসীকে এক ব্যক্তি বলেছিলেন, 'দেখুন ভগবান আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন ?'

তখন সেই ব্যক্তি বললেন, 'কেন আবার কি ? কারণ একটাই, সেটা হলো ভগবানকে আমি দেখতে পাই না, তাকে বিশ্বাস করবো কি করে। না দেখে কোনো কিছুর অস্তিত্বে কি বিশ্বাস করা যায় ?'

সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনার মাথার ঘিলু পদার্থটা একেবারেই নেই।'

সেই ব্যক্তি এরকম কথায় হতবাক হয়ে বললেন, 'মানে ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আপনার মাথার ঘিলু তো আর আমি দেখতে পাচ্ছি না। তবে বলুন দেখি আমি তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কি করে ?'

এবার একটা ক্লাবের গল্প হোক।

একটি অভিজাত ক্লাবের জনৈক পুরনো সভ্য আজকাল আর ক্লাবে বিশেষ যান না। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ অন্য এক জায়গায় দেখা হতে ভদ্রতা করে ক্লাবের সেক্রেটারি সভ্য মহাশয়কে বললেন, 'আপনি আজকাল আর ক্লাবে আসেন না কেন, আপনাকে আর দেখতে পাই না।'

সভ্য মহাশয় নাক কুঁচকিয়ে বললেন, 'কি আর যাবো ? ক্লাবে বোকার সংখ্যা বড় বেশি বেড়ে গেছে।'

সম্পাদক মহোদয় কি আর করবেন, বলতে বাধ্য হলেন, 'আপনি একজন গেলে, আরো দুয়েকটা বোকা বাড়লে বিশেষ কোনো অসুবিধে হবে না। আমাদের ক্লাবটা তো বড়ই।'

অবশেষে এক মহা গুণীর কথা বলি।

অসকার ওয়াইল্ডকে মার্কিন দেশে প্রবেশকালে শুল্কদপ্তরের লোকেরা যথারীতি প্রশ্ন করেছিলো, 'আপনার সঙ্গে কি ঘোষণা করার মতো কোনো জিনিস আছে।'

ওয়াইল্ড বলেছিলেন, 'আমার প্রতিভা ছাড়া, আমার আর ঘোষণা করার মত কিছু নেই।'

এ রকম জবাবের সত্যি কোনো তুলনা নেই। কিন্তু কচকচি আপাতত বাদ দিয়ে মধুরতায় যাই।

এই গোলমেলে রচনা বাংলাভাষার মধুরতম কবিতাগুলির একটি সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে শেষ করছি।

"...এ চিঠির নেই জবাব দেবার দায়
আপাতত এটা দেরাজে দিলেম রেখে।
পারো যদি এসো শব্দবিহীন পায়,

চোখ টিপে ধোরো হঠাৎ পিছন থেকে।
আকাশে চুলের গন্ধটি দিয়ো পাতি,
এনো সচকিত কাঁকনের রিনিরিন।
আনিয়ো মধুর স্বপ্নসঘন রাতি
আনিয়ো গভীর আনন্দঘন দিন।"

সত্যিই তো, কে আর জবাব চায়, যদি সে নিজেই চলে আসে, আকাশে তার চুলের গন্ধ, বাতাসে তার কাঁকনের রিনরিন, যদি সে হঠাৎ চোখ টিপে ধরে পেছন থেকে কে জবাব চায়?

চাওয়া পাওয়া

কথাটা কবি সুন্দর করে বলেছিলেন,

"যাহা পাই তাহা ভুল করে পাই
যাহা চাই তাহা পাই না।"

আমাদের এই নিতান্ত মরজীবনে যেখানে প্রাপ্যের চেয়ে চাহিদা বেশি, যেখানে প্রতিনিয়ত নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, জামার কাপড়ের দাম জোটে তো দরজির মজুরি জোটে না সেখানে চাওয়া পাওয়ার অঙ্ক কখনোই মেলে না। কবির চাওয়া পাওয়ার কিছু ভুল ছিলো, ভুলে কিছু কিছু পেয়েও গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আমাদের সামান্য জীবনে সচরাচর তা হয় না।

তবে কখনো কখনো কেউ তো পায়। যা তার প্রাপ্য তার চেয়ে হয়তো বেশিই পেয়ে যায়।

আমাদের জনার্দন রেস খেলেন। একদিন তিনি দশ টাকা বাজি রেখে পাঁচশো টাকা পেয়ে গেলেন।

যে কাউণ্টারে দশ টাকা জমা দিয়ে বাজি ধরেছিলেন জনার্দন, জেতার টাকাটা সেই কাউণ্টার থেকেই পেলেন। পঞ্চাশটা দশ টাকার নোট। তবে নতুন নোট নয়। একেকজন রেসুড়ে একেকরকম টাকা দিয়ে বাজি রেখেছে। সেই সব টাকা রবার দিয়ে বেঁধে একশো টাকার একেকটি বাণ্ডিল করে কাউণ্টারের কেরানীবাবু সাজিয়েছেন। জনার্দনবাবু ঐ রকম পাঁচ বাণ্ডিল নোট পেলেন।

টাকা পেয়ে কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে প্রতিটি বাণ্ডিল খুলে প্রত্যেকটি নোট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি যাচাই করতে লাগলেন। কাউণ্টারে তাঁর পিছনের লাইনের লোকেরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলো দেরি হচ্ছে দেখে। জনার্দনবাবু অম্লানবদনে কাউণ্টারের নোটিশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আবার নোট পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য, কাউণ্টারের নোটিশে যথারীতি লেখা আছে, "কাউণ্টার ছাড়িবার পূর্বে টাকা দেখিয়া লইবেন।"

সে যা হোক, লাইনের শেষ প্রান্তে এক ভদ্রলোক ছিলেন জনার্দনবাবুর পূর্ব-পরিচিত। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'জনার্দনবাবুর নোটের মধ্যে এত কি দেখছেন?'

জনার্দনবাবুর তখন নোট দেখা শেষ হয়েছে, টাকার বান্ডিলগুলো পাঞ্জাবির ভেতরের পকেটে রাখতে রাখতে মৃদু হাসলেন।

পরিচিত ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করলেন, 'কি ভেবেছিলেন, রেস খেলায় জেতার টাকা জাল নোটে দেওয়া হয় ?'

কাউন্টার ছেড়ে যেতে যেতে জনার্দনবাবু বললেন, 'না তা ঠিক নয়, তবে আমি যে নোটটা দিয়েছিলাম, ভয় পাচ্ছিলাম সেটা আবার ফেরত না পাই।'

জনার্দনবাবু নিজের পাওনা ভালো ভাবেই বুঝে নিতে জানেন কিন্তু অনেক সময় আরো এক কাঠি এগিয়ে পাওনা নিজে নিজেই শোধ দিতে আসে ঘুরপথ ধরে।

গল্পটা একটু অন্যরকম। কারো কারো হয়তো সন্দেহজনক মনে হতে পারে। কিংবা অবিশ্বাস্য।

তা যাই হোক গল্পটা তো বলি।

অজয়বাবু এবং বিজয়বাবু দুজনে নামজাদা শিকারী। বনদপ্তরের অনুরোধে তাঁরা এসেছেন সুন্দরবনের একটি গ্রামে একটি মানুষখেকো বাঘকে মারার জন্যে।

আজকেই সন্ধ্যাবেলা তাঁরা এখানে এসে পেঁছেছেন। ঠিক করেছেন আগামী কাল শিকারের তোড়জোড় করবেন। এখন মধ্যরাত, তাঁরা দুজনে তাঁবুর বাইরে আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর মধ্যে একটা লণ্ঠনের সামনে বসে ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি ঢেলে খাচ্ছেন ও সেই সঙ্গে গল্পগুজব করছেন।

হঠাৎ খুব কাছেই বাঘের ডাক শোনা গেলো। সঙ্গে সঙ্গে অজয়বাবু, বিজয়বাবু দুজনেই বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়ালেন। বিজয়বাবু দুঃসাহসী শিকারী, তিনি অজয়বাবুকে নিবৃত্ত করে বললেন, 'একটা বাঘ মারতে দু'জনে যাওয়ার দরকার কি ? আমি একাই যাচ্ছি, আপনি থাকুন।'

অজয়বাবু বললেন, 'দেখুন বলছেন বটে, তবে পারবেন তো ? এটা কিন্তু সাংঘাতিক বাঘ।'

বিজয়বাবু বললেন, 'একশো টাকা বাজি রাখুন। এক ঘন্টার মধ্যে বাঘ মেরে তার লেজ কেটে এনে আপনাকে দেখাবো।' এ কথা বলে বীরবিক্রমে বিজয়বাবু তাঁবু থেকে দ্রুতবেগে নির্গত হলেন।

এক ঘণ্টা তখনো হয়নি, পৌনে এক ঘণ্টার মাথায় তাঁবুর বাইরে খসখস শব্দ শুনে অজয়বাবু উঠে দাঁড়ালেন, ভাবলেন বিজয়বাবু বাঘ মেরে ফিরলেন।

কিন্তু বিজয়বাবু নয়, তাঁবুর পর্দা থাবা দিয়ে তুলে একটা বিশাল গোল বাঘের মাথা উঁকি দিলো। তার গোঁফে ও থাবায় তাজা রক্তের দাগ। বিস্মিত অজয়বাবু কিছু বলবার আগেই বাঘটি প্রশ্ন করলো, 'আপনার নামই কি অজয়বাবু ?'

অজয়বাবু আমতা আমতা করে অবশেষে স্বীকার করলেন তিনিই অজয়বাবু। বাঘ তখন জিজ্ঞাসা করলো, 'বিজয়বাবু আপনার সঙ্গে একশো টাকার বাজি রেখেছিলেন আমাকে এক ঘন্টার মধ্যে মেরে ফিরে আসবেন বলে ?'

স্তম্ভিত অজয়বাবুকে এই প্রশ্নের উত্তরেও 'হ্যাঁ' বলতে হলো। তখন বাঘ বললো,

'বিজয়বাবু বাজি হেরে গেছেন, আমি আপনার পাওনা শোধ দিতে এসেছি।'

অতঃপর কি হয়েছিলো এই রম্যনিবন্ধের পক্ষে সেটা অপ্রয়োজনীয়, বরং চাওয়া পাওয়ার দুয়েকটা অন্য মাত্রার কথা বলি।

অনেকদিন আগে "পরান যাহা চায়" নামে একটি বাংলা হাসির গল্প পড়েছিলাম। গল্পটি যে খুব জমজমাট তা হয়তো নয় কিন্তু ঐ গল্পে একটু অন্য-রকমের মজা ছিলো।

গল্পের যে যুবক নায়ক, সে একটি মেয়েকে দেখেই তার প্রেমে পড়েছিলো। পথেঘাটে যেখানেই সে মেয়েটিকে যেই মাত্র দেখতে পেতো সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই বহুশ্রুত গানটি "পরান যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো" গাইতো।

মেয়েটির ছেলেটির সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় নেই, নামটাম পর্যন্ত জানে না। সে ভাবতো এ কি একঘেঁয়ে ব্যাপার। ছেলেটির গলা খারাপ নয়, গায়ও ভালো। তবে ঐ একটা গানই সদাসর্বদা গায় কেন? পাগল নাকি?

আসল কথাটা মেয়েটি জানে না যে ঐ যুবকটির নাম পরানকৃষ্ণ বা প্রাণকৃষ্ণ, তাই সে বারবার ঐ গান গেয়ে মেয়েটিকে জানান দেয়, "পরান যাহা চায়, তুমি তাই গো।"

এর পরের এবং শেষ আখ্যানটি পুরনো, আগেও কোথায় লিখেছি।

কিন্তু গল্পটি চমৎকার, চাওয়া পাওয়ার চূড়ান্ত কথা। কি ভাবে পেতে হয় এই গল্প তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

একটি ছোট মেয়ে, নাম তার ঝুমকো। সে খুব মিশুকে। ইস্কুলে যাওয়ার রাস্তায়, কত লোকের সঙ্গে যে তার বন্ধুত্ব হয়েছে।

ঝুমকো তার জন্মদিনে এই রকম এক ভদ্রলোক পথের বন্ধুকে তাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করলো। ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ পেয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে বললেন, 'কিন্তু ঝুমকো আমি তো তোমাদের বাড়ি চিনি না।'

ঝুমকো বললো, 'সে খুব সোজা। ঐ যে মোড়ের মাথায় হলদে তেতলা বাড়ি। ওরই দোতলায় আমরা থাকি। দরজায় কলিং বেলের পাশে দেখবেন আমার বাবার নেমপ্লেট বি কে ভট্টাচার্য লাগানো আছে। আপনি কলিং বেলটা কনুই দিয়ে টিপবেন, আমি এসে দরজা খুলে দেবো।'

ভদ্রলোক ঝুমকোর কথা শুনে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দুটো হাত থাকতে কনুই দিয়ে কলিংবেল টিপতে যাবো কেন?'

ঝুমকো ঠোঁট টিপে হেসে বললো, 'বাঃ, আপনি আমার জন্মদিনের উপহার হাতে করে যাবেন না? আপনার দু হাত তো জোড়া থাকবে। তাই বললাম কনুই দিয়ে কলিংবেলটা টিপবেন।'

শাশুড়ি

আমাদের দেশের বধূ বনাম শাশুড়ি কাহিনীগুলি একালে খুব নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। অমানুষিক নির্যাতন থেকে হত্যা বা আত্মহত্যা খবরের কাগজের পাতায় কোনো সংবাদ পাঠ করেই এখন আর পাঠক বিহ্বল, বিচলিত বোধ করেন না। এ-ব্যাপারে আমাদের অনুভূতি ও বোধ কেমন বোবা হয়ে গেছে।

গান্ধীজী বলেছিলেন, একদা অন্য এক সূত্রে, এ আমার পাপ, তোমার পাপ, সকলের পাপ।

এই পাপ কাহিনী এই তরল কথামালায় নিতান্ত বেমানান। আমরা সাত সাগর পেরিয়ে বিলেত যাচ্ছি বিলিতি মেমসাহেব শাশুড়ি নিয়ে আসতে। তার মধ্যে কিন্তু মজার ব্যাপার আছে।

বিলিতি শাশুড়ির প্রধান ব্যাপার হল, তিনি কনের মা, মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকেন। তিনি সাবেকি চিন্তার লোক, কর্তৃত্বপরায়ণা এবং হয়তো-বা স্বার্থপর। কন্যা-জামাতার কোনো-কোনো ঘটনায় তিনি অনেক সময় নিজেকে এমন জড়িয়ে ফেলেন যে, তাঁকে সঠিক অর্থে বুদ্ধিমতীও বলা চলে না।

শাশুড়ি ঠাকরুন বহুদিন ধরে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে আছেন, সে যে কত কাল তা মনে করাও কঠিন।

একটা গল্পে আছে জামাতা বলছে, 'ইনি তোমার মা' আর বউ বলছে, 'ইনি তোমার মা'। সেই মা মানে এদের যে-কোনো একজনার মা এবং অন্যজনার শাশুড়ি, তিনি এতকাল এ-বাড়িতে রয়েছেন যে দু'জনাই ভুলে গেছে, উনি ঠিক সত্যিকারের কার মা।

বিলেতে একটা চলতি রসিকতা আছে শাশুড়ি নিয়ে। সেটি একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর।

প্রশ্নটি হল, 'একাধিক বিবাহের সাজা কি?'

উত্তর হল, 'একাধিক বিবাহের সাজা হচ্ছে একাধিক শাশুড়ি।'

সাহেবরা শাশুড়ি ঠাকরুনের, আমাদের প্রণম্যা, পরমারাধ্যা শ্বশ্রূমাতা দেবীর উপস্থিতি বা অবস্থিতি সাজার পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছেন, ব্যাপারটা মোটেই ভালো করেননি।

বিলেতের শাশুড়িকে নিয়ে নিতান্ত মর্মান্তিক সব গল্প আছে।

সেই গল্পটার কথা মনে করা যাক।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহিণী স্বামীকে জানালেন, 'আজ বাড়িতে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে। হঠাৎ ভয়াবহ দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারত।'

এরকম দৈনন্দিন রিপোর্ট স্বামী নিয়মিত পেয়ে থাকেন, তবু সহধর্মিনীর প্রতি ভদ্রতাবশত তিনি অফিসের কোট খুলে হ্যাঙ্গারে ঝোলাতে-ঝোলাতে টাইয়ের নটটায় হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? আবার কি হল?'

সহধর্মিনী বললেন, 'আমাদের বাইরের ঘরের পুরনো দেওয়াল-ঘড়িটা হঠাৎ

দেওয়াল থেকে খুলে নিচে পড়ল, এই বিকেলবেলায় আমরা তখন বাইরের ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। আর কি বলব, কি সাংঘাতিক কথা, ঘড়িটা পড়ার এক মিনিট আগে মা ঐ ঘড়িটার তলা দিয়ে চা খেতে বাইরের ঘরে ঢুকেছে।'

স্বামী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সেই ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি, ঐ দেওয়াল-ঘড়িটা চিরদিন স্লো চলছে।'

সব সময় মেম-ললনারা যে তাঁদের মাতৃদেবীর এসব কটুকাটব্য, তিক্ত মন্তব্য মেনে নেন তা কিন্তু মোটেই নয়।

গল্পে পড়েছি স্ত্রী বলছেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমার লজ্জা করে না। অমন খারাপ কথা শাশুড়িদের নিয়ে তুমি বলছ কি করে?'

এরপরেও পতিদেবতা নিবৃত্ত না-হওয়ায় ভদ্রমহিলা বললেন, রীতিমতো গলার জোরে বললেন, 'সব শাশুড়ি কি খারাপ হয়? কত ভালো-ভালো শাশুড়ি আছেন, সবাইকে একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না।'

এই কথা শুনে পতিদেবতা মোটেই শান্ত না হয়ে অতঃপর যা বললেন, সেটা বাঁকা কথা। সে-কথার মধ্যে রাগের চেয়ে শ্লেষ বেশি।

স্বামীদেবতা বললেন, 'দেখো শাশুড়িদের নিয়ে আমার কাছে ওকালতি করতে এসো না। আমি এখনো পর্যন্ত তোমার শাশুড়ির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনিনি। কোনো কটুকাটব্য করিনি তোমার শাশুড়ির নামে।'

স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'মানে?'

একবার গলাখাঁকারি দিয়ে গলার মধ্যের শব্দযন্ত্রটা আরেকটু সক্রিয় করে স্বামী বললেন, 'মানে খুব সোজা। আমার একটাও অভিযোগ নেই তোমার শাশুড়ির বিরুদ্ধে। আমার যা-কিছু অভিযোগ আমার নিজের শাশুড়ির বিরুদ্ধে এবং সে অধিকার আমার আছে।'

পুনশ্চ ঃ

শাশুড়ির গল্প মোটামুটি হল, তা আবার বিলিতি মেমসাহেব শাশুড়ি।

একটা দিশি শ্বশুরের গল্প দিয়ে এবারের নিবন্ধ শেষ না করা অন্যায় হবে।

জামাই শ্বশুরবাড়িতে গেছে। শ্বশুরের পায়ে খুব দামী জুতো। সেদিকে সে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। চোখ আর ফেরায় না। যতক্ষণ কথা বলছে, সেই জুতোর দিকে তাকিয়ে কথা বলছে।

শ্বশুরমশাই আঁচ করতে পারলেন, বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, 'বাবাজীবন, তোমার কি জুতোজোড়া খুব পছন্দ হয়েছে?'

জামাতা সলজ্জ হেসে স্বীকার করল, 'খুবই সুন্দর এই জুতোজোড়া।'

শ্বশুর বললেন, 'এ তো আর কলকাতায় পাওয়া যায় না। আগ্রা থেকে আনিয়েছিলাম, খাস তাজমহল ট্যানারির চামড়া দিয়ে তৈরি জুতো।' তারপর একটু থেমে জামাতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার যদি জুতোজোড়া এত পছন্দ হয়ে থাকে, তুমি এ-জোড়া নিতে পারো।'

এই বলে শ্বশুরমশাই নিজের পা থেকে ঐ জুতোজোড়া খুলে জামাতার পায়ের

সামনে রেখে, জামাতার পায়ের একটা মানসিক মাপ নিয়ে বললেন, 'নিয়ে নাও জুতোজোড়া, তোমাকে চমৎকার ফিট করবে।'

তখন জামাতাবাবাজি আমতা-আমতা করছে, যদিও মনে-মনে খুব খুশি। যা হোক একটু ইতস্তত করে তারপর সে মুখে বলল, 'কিন্তু কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেই সুন্দর জুতোজোড়া কি হল ? কি বলবেন ?'

শ্বশুরমশাই কোনোরকম চিন্তা না করে পরিষ্কার জবাব দিলেন, 'কি আর বলব ? বলব, একটা রাস্তার কুকুর জুতোজোড়া নিয়ে পালিয়েছে।'

ছুটির দিনের সকাল

আমি সেদিন সকালবেলায় আমার বন্ধু সুমহানের বাড়িতে গেছি। ছুটির দিন, রবিবারের সকাল। একটু গল্পগুজব করতে আড্ডা দিতেই গেছি। গিয়ে শুনলাম, সুমহান বাজারে গেছে। ফিরতে একটু দেরি হবে।

আমি ভাবলাম একটু বসে যাই। এতটা পথ এসেছি। আবার ট্রামে-বাসে ঝামেলা করে ফিরে যাওয়া। সুমহানের ছয় বছরের ভাইঝি, তার নাম টিনা। বাইরের ঘরে তেঁতুলবিচি নিয়ে 'কদম-কদম-কদম'টি খেলছিল। আমাকে একলা অপেক্ষা করতে দেখে সে আমার সঙ্গ দিতে এলো।

টিনা আমাকে বলল, 'জেঠু এখুনি বাজার থেকে ফিরবে। তুমি একটু বসো। আমি ততক্ষণ তোমাকে একটা ভালো গল্প শোনাই।'

এই বলে টিনা গল্প আরম্ভ করল, 'এক রাজার চার ছেলে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আরো একজন যেন কে ?'

আমি বললাম, 'শত্রুঘ্ন।'

টিনা ঘাড় নেড়ে বলল, 'তা হতে পারে। এখন হয়েছে কি রাম একদিন লক্ষ্মণকে নিয়ে আর বউ সীতাকে নিয়ে জঙ্গলে গেছে। সেখানে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে এক রাক্ষস। কুম্ভকর্ণ, খুব নাক ডাকতো তার।'

আমি বললাম, 'না কুম্ভকর্ণ নয়, রাবণ। ঐ কুম্ভকর্ণের দাদা।'

এইবার শ্রীমতী টিনা অতি সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, এই গল্পটা তুমি আগে কোথাও শুনেছ।' বলে টিনা গল্প থামিয়ে আবার তেঁতুলবিচি নিয়ে 'কদম-কদম-কদম'টি খেলতে লাগল। আমাকে নতুন গল্প শোনাতে না পেরে মনে হল সে বেশ মর্মাহত হয়েছে।

এখনকার দিনে বাজার করা বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আমি পারতপক্ষে বাজার করাটা এড়িয়ে যাই। সুমহান এখনো ফেরেনি, তার বাজার করে ফিরতে দেরি হচ্ছে।

এর মধ্যে সুমহানের মেয়ে টুনু তার দশ বছর বয়স, সে এক পেয়ালা চা নিয়ে এসে আমাকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'টিনা বুঝি তোমাকে খুব বিরক্ত করছে ?'

আমি বললাম, 'না, তেমন কিছু না, এই গল্পসল্প করছিল আর কি।'

টুনু বলল, 'রামায়ণের রাম-সীতার গল্প নিশ্চয়ই। ওর ধারণা, ও রামায়ণের

সব জানে, কিন্তু সব গুলিয়ে ফেলে গল্প বলতে গিয়ে।'

টিনা নিজের নিন্দা সহ্য করতে না পেরে তেঁতুলবিচি নিয়ে খেলা ফেলে রাগ করে বাইরের ঘর থেকে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

এইবার টুনু পড়ল আমাকে নিয়ে। সে পাড়ার ধাঁধার ক্লাবের মেম্বার। স্কুল থেকে দূরদর্শনে কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। কঠিন-কঠিন বুদ্ধির প্রশ্ন করে সে আমাকে যাচাই করতে লাগল।

একটা ঘরে এত সাদা ইঁদুর আছে, দৈনিক ভোরবেলা সেটা বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। এইভাবে একশো একুশ দিনে সাদা ইঁদুরে ঘরের অর্ধেকটা ভরে গেল। পুরো ঘরটা সাদা ইঁদুরে কতদিনে ভরবে?

প্রশ্নের উত্তরটা আমি জানতাম। দৈনিক যদি সাদা ইঁদুর ডবল হয়ে যায়, তা'হলে ঘরের অর্ধেক ভরে যাওয়ার পর পুরো ঘরটা ভরে যাবে পরের ভোরবেলা, মানে একশো বাইশ দিনে।

আমি উত্তরটা দিতে পারলাম বলে টুনু খুব খুশি মনে হল না। আসলে বুদ্ধির ধাঁধায় চেষ্টাই হল অন্যকে ঠকাবার।

সুতরাং এরপরে টুনু আমাকে একটা সত্যিকারের বোকা বানানোর প্রশ্ন করল।

প্রশ্নটা খুবই জটিল। সে বলল, 'রেললাইনের পাশে একটা লোক ছিপ-বঁড়শি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলো দেখি লোকটা কি করছে?'

আমি নির্বোধের মতো প্রায়ই কিছু না ভেবে বললাম, 'বোধহয় মাছ ধরছে।'

টুনু বলল, 'রেললাইনের ওপর মাছ ধরবে কীভাবে? সেখানে জল কোথায়?'

আমি বললাম, 'তাহলে?'

হেরে গেছি দেখে উল্লসিত হয়ে টুনু বলল, 'পারলে না তো। আমি বলছি। লোকটা ছিপ-বঁড়শি নিয়ে রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরের ট্রেনটা ধরবে বলে।'

আমাকে পরাজিত করে টুনু অতঃপর তার মোক্ষম প্রশ্নের দিকে এগোলো।

'বলো দেখি, হ্যাঁ, ভালোভাবে ভেবে বলবে, এক কেজি তুলো, আর এক কেজি পাথর—এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বেশি ভারি?'

এই প্রশ্নটার মধ্যে বেশ ভালো মতন একটা প্যাঁচ আছে। প্যাঁচটা আমি জানি। অনেকেই জানে। কিন্তু এই সুন্দর সকালবেলায় উৎসাহী টুনুকে দুঃখিত করতে চাইলাম না। সুতরাং খুব চিন্তা করছি এইরকম মুখভাব করে কিছুক্ষণ পরে টুনুকে বললাম, 'তুলোই হোক, লোহাই হোক দুটোরই যদি এক কিলো ওজন হয়, দুটোই সমান ভারি, এর মধ্যে আর কথা কি।'

আমার মূর্খতা দেখে টুনু হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, তুমি আমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাতে দাঁড়াও। আমি ছাদে উঠে আগে একটা এক কিলো ওজনের তুলোর বালিশ তোমার মাথায় ফেলি। তারপর এক কিলোর ওজনের একটা ইঁট কিংবা শিল-নোড়ার নোড়া ফেলি তোমার মাথায়। তারপরে তুমিই বুঝবে কোন্‌টা বেশি ভারি।'

সুখের বিষয় ফুটপাতে গিয়ে দাঁড়াতে হল না, তার আগেই বাড়ির কাজের ছেলেটি দু' ব্যাগ বাজার হাতে ঘরে ঢুকে ঘোষণা করল, 'বাবু আমাকে বাস থেকে রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে ভবানীপুরে বন্ধুর বাড়ি গেলেন।'

বুঝলাম, সুমহানের সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় বেরোতে-বেরোতে ভাবতে লাগলাম, 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোক আর না হোক, ছুটির দিনে সকালটা খারাপ কাটল না।'

শিকার কাহিনী

শিকার কাহিনী নিয়ে লেখা যায় না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে, জিম করবেট, হীরালাল দাশগুপ্ত কিংবা বুদ্ধদেব গুহ হতে না পারলে শিকারের কাহিনী লেখা অসম্ভব।

আমি জীবনে কোনোদিন কিছু শিকার করিনি, এমন কি নাবালক বয়সে গুলতি দিয়ে শালিক, চড়ুই বা কাঠবিড়ালি পর্যন্ত নয়। আমি স্বভাবত নরম প্রকৃতির লোক, শিকার আমার এলাকা নয়।

শুধু কয়েকটা বাজে গল্প লিখবার অজুহাতে এই শিকার কাহিনীর অবতারণা।

প্রথমে দুই বন্ধুর গল্প দিয়ে শুরু করি। বলাই আর কানাই দু'জনেই শিকারী, পুরনো বন্ধু। জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে দু'জনের মুখোমুখি দেখা।

দু'জনেই দু'জনকে এই নির্জন বনে দেখে খুব খুশি। কুশল বিনিময়ের পরে বলাই কানাইকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তো পাখি শিকার করতে এসেছ, এই গহন জঙ্গলে কি করছ?'

কানাই বলল, 'ঠিকই বলেছ। আমি তো ঐ পাশের ঝিলে তিতির মারতে এসেছিলাম।'

বলাই বলল, 'এই ঘন জঙ্গলে তিতির পাখি কোথায়?'

কানাই বলল, 'এখন আর তিতির মারছি না। হাতি শিকার করার চেষ্টা করছি।'

বলাই বলল, 'সে কি?'

কানাই বলল, 'কি আর বলব? ঝিলে পাখি মারতে গিয়ে জলের মধ্যে চশমাটা পড়ে গেল। আমার তো জানিস মাইনাস ছয় পাওয়ার, পুরুকাঁচের চশমা। এখন তো চোখে কম দেখছি, পাখি নজরেই আসে না। তাই হাতি খুঁজছি, সেটা অন্তত চোখে দেখতে পাব।'

শিকারের আসল গল্প হল পাখি শিকারের গল্প। সেই গল্পে যাওয়ার আগে দুটো মাছ শিকারের গল্প বলে নিই।

বাড়ির পুকুরঘাটে চোদ্দ বছরের দাদা মাছ ধরছিল ছিপ ফেলে এমন সময় বাড়ির মধ্য থেকে ছোটো ভাই এসে বলল, 'দাদা, মা জিজ্ঞাসা করেছে এখন পর্যন্ত কতগুলো মাছ ধরেছিস ?'

দাদা বলল, 'মাকে একটু অপেক্ষা করতে বল। এরপরে মাছটা ধরে নিই, তারপরে বলব।'

খবর নিয়ে ছোটো ভাই বাড়ির মধ্যে চলে গেল এবং সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এসে দাদাকে বলল, 'মা জানতে চেয়েছে পরের মাছটা ধরলে কতগুলো মাছ হবে।'

এরপর দাদা অম্লানবদনে বলল, 'মা যখন ছাড়বেই না মাকে বলে আয়, পরের মাছটা ধরতে পারলে একটা হবে।'

বালকের পর বৃদ্ধ। এক বৃদ্ধ নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরছিলেন। তাঁর আশপাশে আরো দু-চারজন মাছ ধরছিলেন। এই অন্যদের ছিপে মাঝে-মধ্যেই দুয়েকটা মাছ ধরা পড়ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোক কোনো মাছই পাচ্ছিলেন না।

এর মধ্যে একবার জল থেকে ছিপ তুলতে পাশের মৎস্যশিকারী ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন যে বৃদ্ধের বঁড়শিতে কোনো টোপ নেই এবং সেই টোপহীন শূন্য বঁড়শিই বৃদ্ধ পুনরায় জলে ফেললেন।

বাধ্য হয়েই ভদ্রলোক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার বঁড়শিতে টোপ দেখছি না কেন ?'

এর উত্তরে বৃদ্ধ নির্বিকারভাবে বললেন, 'আমি যখন ফ্যাঁচাউ মাছ ধরি তখন টোপ দিই না। ফ্যাঁচাউ মাছ টোপ খায় না।'

বৃদ্ধের কথা শুনে মৎস্যশিকারী ভদ্রলোক অবাক, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ফ্যাঁচাউ মাছ আবার কীরকম জাতের মাছ ? এরকম নামের কোনো মাছের কথা কখনো শুনিনি আমি।'

বৃদ্ধ বললেন, 'ফ্যাঁচাউ মাছ আমিও কোনোদিন চোখে দেখিনি। আজ পর্যন্ত ফ্যাঁচাউ মাছ কেউ কোনোদিন ধরতে পারেনি। সম্ভব হয়নি ফ্যাঁচাউ মাছ ধরা।'

হাতি শিকার দিয়ে শুরু করেছিলাম, মাছ হল—অতঃপর পাখি শিকার দিয়েই শেষ করা বিধেয়।

সব শিকারীর মনেই একটা অহংকার থাকে যে তাঁর মতো অব্যর্থ গুলির টিপ আর কারো নেই, আর কারো থাকা সম্ভব নয়।

তখন আমার অল্প বয়স, মফস্বল শহরে আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোক, আমরা বলতাম ব্রজেনকাকা, শিকারটিকার করতেন, দোনলা বন্দুক ছিল তাঁর। তা সেই ব্রজেনকাকারও মহৎ দোষ ছিল নিজের হাতের অব্যর্থ নিশানা নিয়ে গর্ব করা।

ব্রজেনকাকা আমাকে বলেছিলেন, 'বুঝলে তারাপদ, আমার তাক কখনো ফসকায় না। এরকম হাতের টিপ ব্রহ্মপুত্রের এই পারে আর কারো নেই।'

ঠিক এরই কয়েকদিন পরে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটল। আমাদের শহরের শেষপ্রান্তে ছিল একটা বড়ো দীঘি। সেই দীঘির ধারে এক শীতের বিকেলে হাঁটতে গিয়ে দেখি ব্রজেনকাকা বন্দুক হাতে ঘুরছেন।

আমাকে দেখে ব্রজেনকাকা বললেন, 'হরিয়াল মারতে এসেছিলাম, তা একটাও

তো কোথাও দেখছি না।' আমি হরিয়াল চিনতাম না, আকাশে কতগুলো সাদা বকের দেখা মিলতে আমি ব্রজেনকাকাকে বকের চলমান সারি দেখিয়ে বললাম, 'ওগুলো হরিয়াল নয় ?'

ব্রজেনকাকা বললেন, 'না। ওগুলো মোটেই হরিয়াল নয়, ওগুলো বক। তবু যা হোক তুমি যখন বলছ, আর তাছাড়া খালিহাতে ফেরার কোনো মানে হয় না। অন্তত তোমাকে একটা বক উপহার দিই।' এই বলে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন, 'সবচেয়ে পিছনে যে বকটা উড়ে আসছে সেটাকে মারছি, সামনেই পড়বে বকটা, সঙ্গে-সঙ্গে তুমি দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলবে।'

এরপর সর্বশেষ বকটাকে নিশানা করে তিনি এক চোখ বুজে লক্ষ্যের দিকে গুলি ছুঁড়লেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার কথা—বকটির একটিও পালক পর্যন্ত খসে পড়ল না, অক্ষত অবস্থায় সে যেমন যাচ্ছিল সেইভাবে উড়ে গেল।

আমি সরলভাবে বললাম, 'কই, বকটা তো পড়ল না।' মুহ্যমান ও হতভম্ব ব্রজেনকাকা বললেন, 'এমন অদ্ভুত ঘটনা আমি জন্মে দেখিনি। জীবনে এই প্রথম দেখলাম, একটা মরা-বক উড়ে যাচ্ছে।'

ছেলেমেয়ে

সেই ভদ্রলোককে স্মরণ করে এই রম্যনিবন্ধের সূচনা করছি যাঁর সত্যিই সমস্যা ছিল ছেলে না মেয়ে—এই নিয়ে। তাঁর স্ত্রী গিয়েছিলেন হাসপাতালে বাচ্চা হতে। অবশেষে একদিন সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মে যথাসময়ে সন্তান জন্মাল এবং সেইসঙ্গে ছেলে না মেয়ের সমস্যার নিরসন হল।

প্রথম সন্তান, সুতরাং ভদ্রলোক আশা করেছিলেন ছেলে হবে, কিন্তু হল মেয়ে। ভদ্রলোক কিন্তু নিরাশ হলেন না। যখন তাঁকে একজন আত্মীয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছেলে না হয়ে যে মেয়ে হল এতে তুমি দুঃখিত হওনি ?' ভদ্রলোক জবাব দিয়েছিলেন, 'না তা হইনি, আর যা-ই হোক, মেয়েই ছিল আমার সেকেন্ড চয়েস—মেয়ে তো হয়েছে।'

ছেলে না মেয়ে ? কন্যাসন্তান না পুত্রসন্তান ?—এ-নিয়ে সন্তানসম্ভবা জননী, তাঁর স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন অবশ্যই ভাবেন, ভাবতে পারেন, তার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

আগে ফুলের নাম বলে সেই নামের অক্ষর গুনে পরীক্ষা করে, খনার বচন যাচাই, জ্যোতিষ বা তান্ত্রিকের দ্বারা ছক কষিয়ে ছেলে হবে না মেয়ে হবে—সেটা নির্ণয় করার চেষ্টা করা হত।

এখন নাকি ব্যাপারটা খুব সোজা হয়ে গেছে। ডাক্তারি পরীক্ষা করে কি এক নতুন গবেষণাবলে নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায় গর্ভস্থ সন্তান কন্যা না পুত্র, ছেলে না মেয়ে।

কিন্তু এত জানার দরকার কী, সেটা আমি বুঝি না। তিন মাস বা পনেরো দিন আগে জেনে লাভ কী ? এ কৌতূহল কেন ? জীবনে কত কী আমরা নিঃশব্দে

মেনে নিই, এটাও মানতে হবে। যে জন্মাবে, তাকে ভালো করে মানুষ করতে হবে।

ছেলেমেয়ে ভালো করে মানুষ করার ব্যাপারে কিছু বলার আগে আপাতত সেই আপ্তবাক্যটি আরেকবার স্মরণ করে নিচ্ছি: তুমি তোমার ছেলেমেয়েদের ভালো করতে চাও, না খুশি করতে চাও!

তুমি যদি তাদের খুশি করতে চাও, তবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে তুমি তাদের ভালো করবে।

কিন্তু তুমি যদি তাদের ভালো করতে চাও, পুরো গ্যারান্টি দিতে পারি যে তুমি তাদের খুশিও করবে।

বলা বাহুল্য, ভালো থাকা আর খুশি থাকা, ভালো হওয়া আর খুশি হওয়া এক জিনিস নয়।

একটা সামান্য জিনিস বলতে গিয়ে রম্যনিবন্ধের পক্ষে যথেষ্ট জটিলতার সৃষ্টি করে ফেললাম। বরং বেশি ঘুলিয়ে ফেলার আগে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ের দুয়েকটি গল্প স্মরণ করি।

ময়দানে এক অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে ছিলেন। তাঁর কাছে হাতে ঠোঙাভর্তি বাদাম নিয়ে একটি ছোটো ছেলে এসে বলল, 'আপনি বাদাম খেতে পারেন?'

পাশের মাঠে ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলছিল। হঠাৎ তার এই সৌজন্য দেখে বৃদ্ধটি খুব খুশি হলেন; তবে বললেন, 'না বাপ, আমার তো একটাও দাঁত নেই, আমি তো বাদাম খেতে পারি না।'

ছেলেটি এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হয়ে হাতের চিনেবাদামের ঠোঙাটা বৃদ্ধের পাশে রেখে দিয়ে বলল, 'তাহলে এই ঠোঙাটা আপনার কাছে একটু জমা রাখছি। আমি ব্যাট করতে যাচ্ছি কিনা। দেখবেন আর কেউ যেন না নিয়ে যায়।'—বলে চিনেবাদামের ঠোঙাটা রেখে সে একছুটে মাঠে ঢুকে গেল ব্যাট করতে, এবার তার পালা। দন্তহীন বৃদ্ধের মতো নিরাপদ জিম্মাকারী পেয়ে বাদাম বিষয়ে তার দুশ্চিন্তা অবশ্যই কমল, কিন্তু বৃদ্ধটি এর পরে কী মনে করেছিলেন, তা বলা কঠিন।

এই ছেলেটি হয়তো খুব লোভী নয়, কিন্তু খুবই সাবধানী এবং অবশ্যই বুদ্ধিমান।

লোভী ছেলেটির কাহিনীটি এরই কাছাকাছি, কিছু অন্যরকম। সে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। নিমন্ত্রণ খাওয়ার শেষে তার বন্ধুর মা যখন তাকে আরো দুটো সন্দেশ খেতে বলেন, সে বলে, 'আমার পেট সম্পূর্ণ ভরে গেছে। আমি আর খেতে পারব না।'

তখন ভদ্রমহিলা বলেন, 'তাহলে তুমি পকেটে করে দুটো নিয়ে যাও, পরে খাবে।'

ছেলেটি বলল, 'আমার পকেট দুটোও সন্দেশে পুরো ভরে গেছে। আমার পক্ষে আর নেওয়া সম্ভব নয়।'

দুটি ছেলের পরে এবার একটি লক্ষ্মী মেয়ের গল্প বলার সময় হয়েছে।

সেই লক্ষ্মী মেয়েটি কথায়-কথায় যা-তা মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলত। তার মা একদিন রেগে গিয়ে মেয়েটিকে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'জানিস, তোর বয়েসে আমি কখনো একটা মিথ্যা কথাও বলিনি।'

চোখের জল মুছতে-মুছতে আমাদের এই লক্ষ্মী মেয়েটি তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, তাহলে ঠিক কবে থেকে তুমি মিথ্যে কথা বলা আরম্ভ করলে?'

অতঃপর আরো একটি ছেলে এবং আরো একটি মেয়ের গল্প আলাদা আলাদা করে মনে পড়ছে।

প্রথমে ছেলের গল্প।

সব ছোটো ছেলেই যেমন হয়, এও খুব দুষ্টু। সব সময়ে তার হাতে-মুখে নোংরা, ময়লা লেগে রয়েছে।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলতে-খেলতে ছেলেটি তার মায়ের কাছে ছুটে এল; এসে বলল, 'মা, আমরা সবাই মিলে ডাকাত-পুলিস খেলছি।'

মা বললেন, 'তা বেশ তো।'

ছেলেটি বলল, 'আমি ডিটেকটিভ পুলিস হয়েছি।'

মা বললেন, 'তা বেশ তো।'

ছেলেটি বলল, 'কিন্তু আমাকে ছদ্মবেশ নিতে হবে যাতে কেউ চিনতে না পারে।'

মা বললেন, 'সে আর অসুবিধে কী?'

এই বলে একটা ভেজা গামছা নিয়ে ছেলের মুখ খুব পরিষ্কার করে মুছে দিয়ে বললেন, 'এবার যাও, এবার আর তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না।'

এবার মেয়ের গল্প।

একটি ফুটফুটে মেয়ের মাথাভর্তি চুল। বিকেলে পার্কের বেঞ্চে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম একটু খটমটে—সুলোচনা।

সুলোচনাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই যে তোমার এত সুন্দর চুল, এটা তুমি কার কাছ থেকে পেয়েছ? তোমার মার কাছ থেকে? নাকি তোমার বাবার কাছ থেকে?'

একটু চিন্তা করে সুলোচনা বলল, 'বোধহয় বাবার কাছ থেকে?'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন, তোমার বাবার মাথায় কি খুব চুল?'

সুলোচনা হেসে ফেলল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'ঠিক তার উল্টো।'

আমি বললাম, 'মানে?'

সে বলল, 'বাবার মাথা প্রায় ফাঁকা। বিরাট টাক। বাবার মাথার চুলগুলোই হয়তো আমি পেয়েছি।'

সুনিদ্রা

এক ঝড়জলের রাতের শেষে ভোরবেলা স্বামীকে স্ত্রী বলল, 'জানো, কাল রাতে প্রচণ্ড জলবৃষ্টি, শোঁ-শোঁ করে হাওয়া বয়েছে, আর সে কী বিদ্যুতের ঝলকানি আর বাজ পড়ার শব্দ...'

স্ত্রীর কথা এই পর্যন্ত শোনার পর স্বামী বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন, 'সে কী, সারারাত বাজ পড়েছে আর তুমি আমাকে ডেকে দাওনি ? তুমি জানো না, বাজের আওয়াজ হলে আমার মোটেই ঘুম আসে না ?'

বজ্রপাতের ঘনঘন শব্দ, সেও সারারাত ধরে, তাতেও স্বামীর ঘুম ভাঙেনি, আর এখন তিনি বলছেন বাজের আওয়াজে ঘুম হয় না।

ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

ঘুম কেন হয় ? ঘুম কেন হয় না ?

ঘুম কখন হয় ? ঘুম কখন হয় না ?

এমন কি, যার ঘুম হচ্ছে না, সে কি বুঝতে পারে, তার ঘুম হচ্ছে না, কেন ঘুম হচ্ছে না ?

এবং এ-সবের চেয়েও মারাত্মক যে লোক সাধারণত নাক ডেকে ঘুমোল, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে-ই অভিযোগ করল, 'আজ দু'সপ্তাহ চোখে একফোঁটা ঘুম নেই।'

এক বিখ্যাত ব্যক্তিকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি কি ঘুম থেকে সকাল-সকাল ওঠেন ?'

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, 'একদিন উঠেছিলাম। তার পর থেকে আর উঠি না।'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে সারা সকাল নিজেকে এত অহংকারী মনে হল যে কোনো কাজই করা হল না, আর তার পর সারাদিন, দুপুর আর বিকেল কাটল ঘুম-ঘুম ভাবে। দিনটাই বরবাদ হয়ে গেল। এর পর থেকে আর সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠি না।'

সকালে ঘুম থেকে না-ওঠার একেকজনের একেক রকম কারণ থাকে। কেউ বেশি রাতে ঘুমিয়েছে বলে, কেউ রাতে ঘুম হয়নি বলে, কেউ গা ম্যাজম্যাজ করে বলে, আবার কারোর-বা ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে থাকতে ভালো লাগে তাই।

সে যা হোক, একজন খ্যাতনামা চিত্রকরের চিত্র-প্রদর্শনীতে গিয়েছিলাম।

হলে ঢুকতেই ঠিক মুখোমুখি একটা বিরাট ক্যানভাস। নদীর নীল জলে অর্ধেক ডুবে আছে সোনালী সূর্য, পিছনে নীল আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘ, সাদা পাখি।

ছবিটা পুরনো ধরনের, কিন্তু আঁকার যথেষ্ট মুনশিয়ানা রয়েছে। আর এ-জাতের ছবি আমার বেশ লাগে। ছবিটির সামনে দাঁড়িয়ে আগের দর্শককে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললাম, 'কী চমৎকার, সূর্যোদয়ের ছবি !'

আমার পাশের দর্শক ভদ্রলোক কিন্তু এত সহজে আমার এই প্রশংসাবাক্য হজম করলেন না। তিনি আমাকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সূর্যোদয়ের ছবি বুঝলেন কি করে ?'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, সূর্য উঠেছে, সূর্যোদয়ের ছবি আর আপনি প্রশ্ন করছেন সূর্যোদয়ের ছবি কিনা ?'

আমার প্রতিপ্রশ্ন শুনে দর্শকমহোদয় হোহো করে অট্টহাস্যে হেসে উঠলেন গ্যালারির পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। তারপর পরিবেশ একটু স্থিতি পাওয়ার

পরে আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এই শিল্পীকে চেনেন ?'

আমি বললাম, 'না। চিনি না।' তারপর একটু থেমে জানতে চাইলাম, 'কিন্তু, তার সঙ্গে ছবির সম্পর্ক কি ?'

বিবাদী ভদ্রলোক হাসলেন। দয়া করে অট্টহাস্যে বিচলিত না-হয়ে এবার স্মিত প্রশ্নে ফিরে এলেন এবং আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি কেন কিছু না জেনে এই ছবিটাকে সূর্যোদয় বলে ভেবেছি।

আমি বললাম, 'স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাই বলেছি।'

ভদ্রলোক পুনরায় স্মিত হাসলেন, তারপরে খুব চাপাগলায়, যেন কোনো ষড়যন্ত্রের কথা হচ্ছে, এইরকম ফিসফাস ভাষায়, আমাকে বললেন, 'দেখুন, গজানন মানে গজু অর্থাৎ এই আর্টিস্ট, আমার ছোটোবেলার বন্ধু। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, জীবনে ও কোনোদিন সকাল দশটার আগে বিছানা ছাড়েনি। ও কোথায় দেখবে সূর্যোদয়, কি করে আঁকবে সূর্যোদয় ? এ হলো সূর্যাস্তের ছবি। সূর্যাস্ত ছাড়া জীবনে গজু আর কিছুই দেখেননি। তাই সূর্যাস্তের ছবি এঁকেছে, সূর্যোদয় ওর পক্ষে সম্ভব নয়।'

অবশেষে একটা নিদ্রাহীন কাহিনী বলি। এ কাহিনীর নায়ক আমি নিজে।

সবাই জানেন, আজ কিছুদিন হল, অতিরিক্ত মোটা হয়ে গেছি আমি। এবং সেটাই হয়েছে আমার কাল। শরীর খারাপ বলে যদি ডাক্তারের কাছে যাই, ডাক্তার-বাবু প্রথমেই বলেন, ফ্যাট কমাতে হবে, রোগা হতে হবে।

কয়েকদিন হলো, হয়েছে কি রাতে ঘুমের মধ্যে গলা খুব শুকিয়ে যায়। ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তারবাবু এবারো বললেন, 'ফ্যাট কমাতে হবে।'

আমি বললাম, 'ফ্যাট কমালে ঘুমের মধ্যে গলা শুকিয়ে যাওয়া বন্ধ হবে ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'নিশ্চয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কারণ খুব সহজ। ঘুমের সময় আপনার ঠোঁট খুলে মুখ হাঁ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় গলা শুকিয়ে যায় বাইরের হাওয়ায়।

আমি একটু বিব্রত হয়ে জানতে চাইলাম, 'কিন্তু, আমার মেদবৃদ্ধির সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ? ফ্যাট বাড়ায় ঘুমোনোর সময়ে মুখ হাঁ হবে কেন ?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শরীর মোটা হয়ে যাওয়ায় চামড়ায় টান পড়েছে। তাই, আপনি যেই চোখ বোজেন, মুখ হাঁ হয়ে যায়। ঘুমোনোর সময়ে মুখ হাঁ হয়েই থাকে। তাই আপনার গলা শুকিয়ে যায়। ফ্যাট কমালে তখন চোখ আর মুখ—দুটোই একসঙ্গে বন্ধ হবে, ঘুমের মধ্যে গলাও শুকোবে না।

রেলগাড়ি ঝমাঝম

কি যেন সেই ছড়াটা ?

'রেলগাড়ি ঝমাঝম।

পা পিছলে আলুর দম।'

রেলগাড়ির কথা যখন আছে এই ছড়ার মধ্যে, তা'হলে ছড়াটা যে খুব পুরনো সে কথা তো বলা যাবে না। বড়ো জোর একশো বছর বয়স হবে এই ছড়ার। তা হোক। এরই মধ্যে বাঙালী শিশুমানসে ছড়াটি পাকা জায়গা করে নিয়েছে। খুবই জনপ্রিয় ছড়াগুলির মধ্যে এটি একটি।

এবং ছড়া শরীরে যে অদম্য ছন্দ এবং সেই সঙ্গে গূঢ় হেঁয়ালি থাকে, এই দুই পংক্তিতে তা রয়েছে। রয়েছে শুধু নয়, ছড়াটি আমাদের ভাবায়, রেলগাড়ি ঝমাঝম অবশ্যই তাতে গতির ধ্বনি রয়েছে। কিন্তু পা পিছলে আলুর দম কেন?

কেন, বলা কঠিন। কিন্তু ছবিটি স্পষ্ট। অর্থের মধ্যে যথেষ্ট হেঁয়ালি থাকা সত্ত্বেও।

হেঁয়ালি থাক, গল্প বলি।

শহরতলির এক রেলস্টেশনে খগেনবাবু ছিলেন সহকর্মী স্টেশনমাস্টার।

খগেনবাবুর মার্জারপ্রীতি প্রায় অবিশ্বাস্য। এমনকি রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে তাঁর ঘরে একাধিক বেড়াল। একটা টেবিলে রয়েছে, একটা আলমারির মাথায় আর দুয়েকটা খগেনবাবুর পদপ্রান্তে মিউমিউ করে সোহাগ ভিক্ষা করছে।

সম্প্রতি খগেনবাবুর সবচেয়ে ভালোবাসার মার্জারি সোনাসোনার চারটি বাচ্চা হয়েছে। রেলকোম্পানীর পুরনো আমলের দশ ফুট বাই পাঁচ ফুট মেহগনি কাঠের আলমারির সুরক্ষিত অন্তরালে সোনাসোনা বাচ্চাগুলো বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। খগেনবাবুর মাথায় সোনাসোনা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই।

এমন সময় কোথাও কাউকে না পেয়ে এক রেলযাত্রী খগেনবাবুর দরজায় এসে উঁকি দিলেন, আত্মমগ্ন খগেনবাবু স্নেহভরে সোনাসোনা এবং তার বাচ্চাদের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়েছিলেন, রেলযাত্রী খগেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, রানাঘাট লোকালের কোনো খবর আছে?'

সোনাসোনা এবং বাচ্চাদের চিন্তায় বিভোর খগেনবাবু ভাবলেন ভদ্রলোক বোধহয় তাঁর বেড়ালদের কথা জিজ্ঞাসা করছেন। সুতরাং রানাঘাট লোকালের প্রশ্নে তিনি আলমারির নিচে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'ঐ তো এখানে ঐ আলমারির তলায় রয়েছে।'

'আলমারির তলায় রানাঘাট লোকাল!' হতভম্ব যাত্রী মাস্টারবাবুর মাথা-খারাপ হয়েছে ধরে নিয়ে ধীরে ধীরে কেটে পড়লেন।

রেলগাড়ির সবচেয়ে মজার গল্পগুলো হল রেলগাড়ি সময়মতো ধরা নিয়ে।

এক ভদ্রলোক দৈনিক ট্রেন ফেল করতেন। তিনি ছিলেন নিত্যযাত্রী, কলকাতার এক অফিসের কর্মচারী। ট্রেন ফেল করায় তিনি নিয়মিতই অফিসে লেট হতেন। অথচ তাঁরই পাশের টেবিলে তাঁর যে সহকর্মী বসেন তিনিও ট্রেনে আসেন, কিন্তু কদাচিৎ 'লেট' হয়।

সুতরাং ভদ্রলোক একদিন তাঁর সহকর্মীকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ভাই, আপনি তো দৈনিক ঠিক সময়েই আসেন, কিন্তু বলুন তো দৈনিক ঠিক সময়ে ট্রেন ধরেন কি করে?'

সহকর্মী বললেন, 'এ তো খুব সোজা। আমি সব সময়ে যে ট্রেনটা ধরব

তার আগের ট্রেনটা ফেল করি। তাহলেই পরের ট্রেনটা আর কিছুতেই মিস হয় না।'

খুব সহজ সমাধান, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তবে অন্য একটা আখ্যান এই সূত্রে মনে পড়ছে।

এক যাত্রী দৌড়তে দৌড়তে এসে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উঠতে উঠতে সামনের চা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, তুমি কি মনে করো আমি এখনো এক্সপ্রেস ট্রেনটা ধরতে পারবো ?'

চা-ওয়ালা নির্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল, 'সেটা নির্ভর করে আপনি কত জোরে দৌড়তে পারেন তার ওপরে।'

বিমূঢ় ভদ্রলোককে স্তব্ধ করে দিয়ে চা-ওয়ালা এরপরে জানাল, 'কারণ দু মিনিট আগেই ট্রেনটা ছেড়ে গেছে কিনা।'

যথাসময়ে ট্রেন ধরার আর একটা গল্প অবশ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

রাস্তার পাশে একটা বড়ো ক্ষেত। ক্ষেতের ওপারেই রেলস্টেশন। রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি গেলে অনেকটা শর্টকাট হয়।

বাড়ি থেকে বেরোতে অতিরিক্ত দেরি হয়ে গেছে। জগাবাবু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন হঠাৎ ক্ষেতের পাশে এসে ক্ষেতের মালিককে সামনে দেখে তাঁর মনে হল, ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কোনাকুনি শর্টকাট করতে পারলে বোধহয় ট্রেনটা ধরতে পারতেন।

সামনেই ক্ষেতের মালিককে দেখে জগাবাবু তাঁকে বললেন, 'দাদা, আপনার ক্ষেতের মধ্য দিয়ে যদি একটু শর্টকাট করতে দেন, তা'হলে বোধহয় দশটা পনেরোর ট্রেনটা পেতে পারি।'

ক্ষেতের মালিক বললেন, 'আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পাগলা ষাঁড়টা ক্ষেতে রয়েছে, সে যদি আপনাকে দেখতে পায়, তা'হলে হয়তো দশটা দশ কি পাঁচের ট্রেনটাই ধরতে পারবেন।'

পুনশ্চ ঃ

এক ঃ রেলগাড়ি অনবরত লেট হওয়ার কারণে তিতিবিরক্ত হয়ে এবং এই গাফিলতি দূর করতে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে এক রেলযাত্রী রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনাদের গাড়িগুলো যদি কিছুতেই যথাসময়ে ঠিকমতো না চলে তবে আপনারা এত মেহনত করে টাইমটেবিলগুলো ছাপাতে যান কিজন্য ? এত সরকারি খরচে কি লাভ ?'

রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় কিঞ্চিৎ মাথা চুলকিয়ে, একটু ইতস্তত করে অবশেষে জবাব দিয়েছিলেন, 'স্যার টাইমটেবিল যদি না ছাপা হয় তা'হলে তো বোঝাই যাবে না গাড়ি লেটে আসছে না ঠিক আসছে।'

দুই ঃ রেল-অফিসের বড় সাহেবের কাছে কেরানিবাবু জনৈক গ্রাম্য ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। বড়সাহেব বললেন, 'কি ব্যাপার ?'

কেরানিবাবু বললেন, 'স্যার, এই ভদ্রলোক ওঁর গরুর জন্যে রেল কোম্পানির কাছে ক্ষতিপূরণ চাইতে এসেছেন।'

বড়সাহেব চোখ তুলে আগত ভদ্রলোককে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে কেরানি-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঁর গরু বুঝি ট্রেনে কাটা পড়েছে ?'

কেরানিবাবু বললেন, 'না স্যার, ঠিক তা নয়। ট্রেনটা খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। রেললাইনের পাশেই ওঁর দুধেল গরুটা ঘাস খাচ্ছিল। হঠাৎ একজন প্যাসেঞ্জার একটা ঘটি নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গরুটাকে দুয়ে অনেকটা দুধ নিয়ে চলে গেছে।

প্রায় নিয়মিতই এরকম হচ্ছে বলে ইনি নালিশ জানাতে এসেছেন।'

মুরগি

ত্রিদিব চক্রবর্তী মশায় অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। ত্রিদিববাবুর বয়স এখন মোটা-মুটি ষাট। মাঝারি গোছের একটা সরকারি কাজ করতেন ; বছর দুয়েক আগে কাজে অবসর হয়েছে।

শহরতলির শেষপ্রান্তে কাঠা দশেক জমি কিনে তিনি একটা ছোটো বাড়ি বানিয়েছেন। বাড়িতে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। শুধু দুখানা ঘর আর বারান্দা। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে থাকেন। ত্রিদিববাবুর ছোটো সংসার। একটি মেয়ে ছিল, তারও বিয়ে হয়ে গেছে।

বাড়ির উঠোনের সামনের দিকে সুন্দর একটা ফুলের বাগান করেছেন। সেখানে জবা, শেফালি, বর্ষায় রজনীগন্ধা, শীতে গাঁদা, ডালিয়া ঝলমল করে ফোটে। বাড়ির পিছন দিকে ত্রিদিববাবু তরকারির চাষ করেছেন, যেমন সবাই করে—কয়েকটা কাঁচালঙ্কা, বেগুন, একটা লাউয়ের মাচা, শীতের শুরুতে টমাটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি অল্প কিছু। অবসরজীবন ফুল আর তরকারির বাগানের পরিচর্যা করে মোটামুটি ভালোই কাটছিল ত্রিদিববাবুর।

কিন্তু আজ কিছুদিন হল একটা ঝুটঝামেলা শুরু হয়েছে।

ত্রিদিববাবুর বাড়ির পিছনের জমিটা এতকাল ফাঁকা ছিল। আজ কিছুদিন হল সে জমিতে অন্য একজন এসে বাড়ি করেছেন। তাতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই, সে জমি যখন নিজের নয়, তাই তাতে আপত্তি করবারও কোনো কিছু নেই।

কিন্তু আপত্তির কারণ অন্যত্র। পিছনের জমিতে যিনি বাড়ি করেছেন, কি নাম যেন ভদ্রলোকের—ভবানীচরণ না কি যেন, সেই ভবানীবাবু একগাদা মুরগি পুষেছেন। সেই মুরগিগুলো নিয়মিত বেড়া টপকে এসে ত্রিদিববাবুর বাড়িতে ঢুকে হুলুস্থুল বাধিয়ে বসে।

তরকারির বাগানের যেমন ক্ষতি করে তারা, ঠিক তেমনই বাড়ির সামনে ফুল-বাগানের মধ্যেও তাদের অপরিসীম অনাচার সারাদিন। তাছাড়া, উঠোন-বারান্দা মুরগির লোমে আর বিষ্ঠায় অনবরত নোংরা হচ্ছে।

অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ত্রিদিববাবু। তদুপরি ত্রিদিববাবুর স্ত্রী একটু শুচি-বায়ুগ্রস্ত। মুরগি দেখলেই তিনি শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন। রান্নাবান্না, বাড়ির কাজকর্ম মাথায় ওঠে।

কিন্তু বাড়ি থেকে মুরগি তাড়ানোর কোনো সহজ উপায় ত্রিদিববাবুর জানা নেই।

পয়সা খরচ করে দেওয়ালের ওপর একটা তারের জাল উঁচু করে লাগালেন। তাতে বিশেষ কোনো লাভ হল না, বরং পয়সাটাই জলে গেল। কারণ যথারীতি আগের মতোই মুরগিগুলো জাল টপকে উড়ে এসে তাঁর বাগান তছনছ করতে লাগল, বাড়ি নোংরা করতে লাগল।

একটা বাঁশের কঞ্চি যোগাড় করে সেটা দিয়ে তাড়া করে দু-চারদিন ভয় দেখালেন, কিন্তু সাময়িক উপকার হল মাত্র। তাড়া করার অল্প কিছু পরেই আবার মুরগিবৃন্দ দল বেঁধে ফিরে এল।

একদিন ত্রিদিববাবু ঢিলও তুলেছিলেন মুরগিগুলোকে ছুঁড়ে মারার জন্য, বেশ বড়সড় গোছের একটা পাটকেল। কিন্তু ঢিল ছোঁড়ার মুহূর্তে তাঁর নজরে এল, মুরগিদের মালিক তাঁর প্রতিবেশী পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কটমট করে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন।

সুতরাং ঢিল ছোঁড়া থেকেও ত্রিদিববাবু বিরত হলেন। নালিশ জানিয়েও তেমন কোনো লাভ নেই। দুয়েকবার প্রতিবেশীর সঙ্গে এ বিষয়ে ত্রিদিববাবু কথা বলতে গিয়েছেন ; প্রতিবেশী ব্যাপারটাকে মোটেই পাত্তা দেননি। তাঁর মনোভাবটা হল—"এ রকম হয়েই থাকে।"

কিন্তু ঐ ঢিল ছোঁড়ার দিন ত্রিদিববাবু যখন বুঝতে পারলেন তাঁর প্রতিবেশী ছাদের ওপর থেকে কড়া নজর রাখেন মুরগিগুলোর ওপর, সেই সময় ত্রিদিববাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

বুদ্ধিটা একটু গোলমেলে।

সেদিন বিকেলে বাজার করতে গিয়ে ত্রিদিববাবু গোটা দশেক ডিম কিনে নিয়ে এলেন। পরের দিন খুব ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে থাকতে—তখনো প্রতিবেশী মুরগিগুলো খাঁচা থেকে বের করে দেননি—তারা তারস্বরে 'ক'কর-কো' 'ক'কর-কো' ডাকছে—সেই সময় ত্রিদিববাবু তাঁর উঠোনের নানা জায়গায়—ঝোপের ফাঁকে, গাছের নিচে ঘাসের আড়ালে ডিমগুলো রেখে দিলেন।

পরে বেলার দিকে যখন মুরগিগুলো সব দল বেঁধে তাঁর বাড়িতে চরতে এসেছে এবং প্রতিবেশী ছাদে উঠে সেগুলোর দিকে নজর রাখছেন, সেই সময় একটা ঝুড়ি হাতে উঠোনে ঘুরে ঘুরে ত্রিদিববাবু লতাপাতা ঘাসের মধ্যে থেকে একটা একটা করে সেই ডিমগুলো তুলতে লাগলেন।

পরপর দশটা ডিম কুড়িয়ে যখন তিনি ঝুড়িতে ভরলেন, পাশের ছাদের ওপর প্রতিবেশী ভদ্রলোক কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা তোবড়ানো এনামেল থালায় কিছু ভুষিদানা নিয়ে মুরগিগুলোকে 'আয় আয়' করে ডাকতে লাগলেন। খাদ্যের আহ্বানে মুরগিগুলো সঙ্গে সঙ্গে তারের জাল উতরে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

এই ঘটনার পর সাতদিন হয়ে গেছে, এর মধ্যে আর একবারও একটা মুরগিও ত্রিদিববাবুর বাড়িতে প্রবেশ করেনি। পক্ষান্তরে এখন প্রতিবেশী ভদ্রলোক সে-

গুলোকে খাঁচার মধ্যে আটকে রাখছেন।

একটা গল্পেই এবারের "কি খবর" প্রায় ভরে গেলো।

আরেকটা ছোট গল্পের সুযোগ আছে। গল্পটা পুরনো, অন্য অবসরে আগেও বলেছি। কিন্তু আবারও বলা যায়।

মধ্য কলকাতার এক প্রাচীন মোগলাই হোটেল মুরগি রান্নার জন্যে বহুকাল ধরে বিখ্যাত।

একদিন সেই হোটেলে সপরিবারে খেতে গিয়েছিলাম। এবার গেলাম অনেকদিন পরে।

গিয়ে দেখলাম, হোটেলের অনেক অধঃপতন হয়েছে। টেবিল-ক্লথ নোংরা, বেয়ারারা ছেঁড়া উর্দি গায়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আসবাবপত্র ভাঙাচোরা, ঘরে বহুকাল চুনকাম, মেরামতি হয়নি।

সে যা হোক, যে-বেয়ারা অর্ডার নিতে এল, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ খাবার কী আছে। সে অনেকরকম বলল। তাকে বললাম, 'অত কথা থাক, মুরগির প্রিপারেশন কী আছে?' প্রশ্নটা করেই হঠাৎ খেয়াল হল, বেয়ারার হাতে চাকাচাকা দাগ; আমি তাকে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার কি একজিমা আছে?' সে বলল, 'না স্যার, একজিমা হবে না।' তারপর একটু থেমে বলল, 'চিকেন চাপ হবে, তন্দুরি হবে, চিকেন রেজালা হবে…।'

দেয়া-নেয়া

আমার মধ্য-যৌবনের রোম্যাণ্টিক বাংলা ছবি সেটা, বোধহয় তনুজারানী এবং উত্তমরাজা। বইটার নাম দেয়া-নেয়া। এ-রকম ছবি সেই শেষ দেখা। তারপর বয়েস বেড়ে গেল, ঘরে দূরদর্শন এল, সিনেমা হলে ভাঙা চেয়ার বদলানো হল না, লোডশেডিংয়ে এয়ার-কণ্ডিশনার বন্ধ হল। বহুকাল সিনেমা হলে গিয়ে আর সিনেমা দেখা হয় না। কখনো কদাচিৎ সত্যজিৎ রায় বা অনুরূপ অপ্রতিরোধ্য কিছু এলে হয়তো যাই, কিন্তু বাজারের বাণিজ্যিক সিনেমা আর দেখা হয়ে ওঠে না।

দেয়া-নেয়া চমৎকার একটা বাংলা শব্দ, খাঁটি বাংলা সমাসবদ্ধ শব্দ। এর পিতামহী হলেন আদানপ্রদান, সেটাও সংস্কৃত দ্বন্দ্ব সমাস,—দেয়া-নেয়াও তাই।

খুব সোজা, সরল ব্যাপার দেয়া ও নেয়া, দেয়া-নেয়া। যেমন রাম ও লক্ষ্মণ রাম-লক্ষ্মণ। রাম মন্দির ও বাবরি মসজিদ খবরের কাগজের দৌলতে রামমন্দির-বাবরি মসজিদ।

রাজনৈতিক জটিলতায় না গিয়ে বলি, যেমন হিন্দু ও মুসলমান হিন্দু-মুসলমান, যেমন মন ও প্রাণ মনপ্রাণ, যেমন কুকুর ও বিড়াল কুকুর-বিড়াল—তেমনি দেয়া-নেয়া, তেমনি আদানপ্রদান।

ব্যাংক থেকে টাকা ধার নিতে গেলে কিছু মূল্যবান জিনিস বন্ধক বা মর্টগেজ রাখতে হয়। বহুকাল আগের গল্প এটা। চট্টগ্রামের এক ব্যাপারী স্থানীয় ব্যাংকের একটি শাখায় এক হাজার টাকা ঋণ করতে গিয়েছিলেন। সে আমলে এক হাজার

টাকা অনেক টাকা—পঞ্চাশ-ষাট তোলা সোনার দাম—যার মূল্য আজকের বাজারে তিন লক্ষ টাকা।

ব্যাংকের বড়বাবু ব্যাপারীর কথা শুনে বললেন, 'আপনাকে অবশ্যই আমরা এক হাজার টাকা ধার দিতে পারি, কিন্তু ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী আপনাকে কিছু সম্পত্তি আমাদের কাছে বন্ধক রাখতে হবে, যতদিন-না ঋণ শোধ হয়।'

ব্যাপারী বললেন, 'এটা কোনো অসুবিধের ব্যাপার নয়। আমার পাঁচশো নৌকো আছে। সেগুলো বরং আপনাদের জিম্মায় বন্ধক রাখছি। আমার টাকা যোগাড় হয়ে গেলেই আমি সুদ সমেত আপনাদের ধার পরিশোধ করে নৌকোগুলো ছাড়িয়ে নেবো।'

ব্যাংক রাজি হয়ে গেল। সুপ্রস্তাব। সুতরাং রাজি না-হওয়ার কোনো কারণ নেই।

ব্যাপারী ভদ্রলোকের রেঙ্গুন না আকিয়াব—কোথায় যেন ব্যবসাগত কারণে বহু টাকা আটকে ছিল। কিছুতেই তাঁর কর্মচারীরা সে টাকা আদায় করতে পারছিল না।

ব্যাংক থেকে হাজার টাকা ধার নিয়ে ব্যাপারী নিজেই চলে গেলেন আকিয়াবে এবং যথাশীঘ্র যথাসাধ্য বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধার করে ফিরলেন।

চাটগাঁয় ফিরে ঘাটে নেমে প্রথমেই ঝোলাভর্তি টাকা নিয়ে তিনি ব্যাংকে গিয়ে আসল এক হাজার আর সুদ একশো এগারো টাকা ঝোলা থেকে গুনে-গুনে বার করে ব্যাংকের টাকা শোধ করে বন্ধকী নৌকোগুলো ছাড়িয়ে নিলেন।

লোকটির ঝোলাভর্তি অর্থ দেখে যেমন হয়, ব্যাংকের বড়বাবুর লোভ হল। তিনি বললেন, 'এই টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছেন কেন? এগুলো আমাদের ব্যাংকে জমা রাখুন।'

সতর্ক দৃষ্টিতে ব্যাংকের ম্যানেজারের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারী বললেন, 'তা রাখতে পারি। তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আপনারা আমার কাছে কী বন্ধক রাখবেন? আপনাদের কতগুলো নৌকো আছে?'

অনেকদিন পরে এবার আমার নিজের একটা গল্প বলি।

হাবড়ায়, অশোকনগরের বাড়ির পাশের একফালি উঠোনে একবার আমি ভেবেছিলাম নিজের হাতে তরকারী চাষ করবো। এতে সংসারের সাশ্রয় তো হবেই, সেইসঙ্গে ব্যায়াম হবে, টাটকা আনাজ নিজের বাড়িতেই পাওয়া যাবে।

কোদাল দিয়ে উঠোন কোপানো শুরু করলাম। অল্প একটু কোপানোর পর দেখি, মাটির মধ্যে একটা সিকি। সেটা পেয়ে মনে আনন্দ হল, ভগবান পারিশ্রমিক হাতে-হাতে প্রদান করছেন।

কয়েক মিনিট পরে একটা আধুলি পেলাম। তারপরে আবার একটা সিকি। একটু বাদে দুটো দশ পয়সা, একটা পাঁচ পয়সা। এইভাবে মাটি কুপিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পয়সা উপার্জন করার পরে আমার কেমন রহস্যময় মনে হল ব্যাপারটা।

আসলে রহস্য আর-কিছু নয়। আমার শার্টের পকেটে একটা ফুটো ছিল। এ পয়সাগুলো আমারই—মাটি কোপানোর সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে একে-একে পড়ে

গিয়েছে, আর তাই আমি কুড়িয়ে পেয়েছি।

আরেকটি গল্প মনে পড়ছে। সেটি ঠিক আদান-প্রদান, দেয়া-নেয়ার নয়। আদান-প্রদান না-হওয়ার গল্প।

এক ধনবান ব্যবসায়ীর একমাত্র সুন্দরী কন্যার বহু প্রেমিকের মধ্যে একজন ছিল অতি দরিদ্র।

দরিদ্র হলেও প্রেমিকটি মোটেই নির্বোধ নয়। সে জানত, মেয়েটি তাকে কখনোই বিয়ে করবে না ; তবু একদা এক অতি দুর্বল মুহূর্তে সে মেয়েটির হাত ধরে প্রশ্ন করল, 'প্রেয়সী, তুমি আমাকে বিয়ে করবে ?'

প্রেয়সী বলল, 'তুমি জানো আমার ব্যাপারটা ?'

প্রেমিক বলল, 'আমি জানি তুমি খুব, খুব বড়োলোক।'

প্রেয়সী বলল, 'আমার দাম এক কোটি টাকা, তার চেয়ে বেশিও হতে পারে।'

প্রেমিক বলল, 'তবু তুমি বলো তুমি আমাকে বিয়ে করবে কিনা ?'

প্রেয়সী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'না।'

প্রেমিক বলল, 'আমি জানতাম।'

এবার বিব্রতা প্রেয়সী একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জানতেই যদি, তাহলে শুধু শুধু তুমি আমাকে বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গেলে কেন ?'

প্রেমিকটি শুকনো হেসে বলল, "শুধু একবার যাচাই করে দেখলাম, এক কোটি টাকা হাতছাড়া হলে কেমন লাগে।'

পুনশ্চ ঃ

বেকার যুবক রাঘবেন্দ্রকে কফি হাউসের টেবিলে তার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছিল, 'রাঘু, তুই যদি হঠাৎ দেখিস তোর পাঞ্জাবির পকেটে পাঁচশো টাকা রয়েছে, তাহলে তুই কী করবি ?'

একটুও না ভেবে রাঘবেন্দ্র বলল, 'তাহলে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যাবো। আমাকে ভাবতে হবে, কার পাঞ্জাবি আমি ভুল করে গায়ে দিয়ে এসেছি।'

পরীক্ষা

কালে কালে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণের রীতিনীতি এত পালটিয়ে গেছে যে এখন কখন কি পরীক্ষা হয়, বাড়িতে ছাত্র না থাকলে জানাই কঠিন।

সে যা হোক। পুরনো সময়ের কথা বলি।

আমাদের সময়, সেই অনাদি অনন্তকাল আগে আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম প্রত্যেক ক্লাসে তিনটে করে পরীক্ষা হতো।

গরমের ছুটির আগে ফার্স্ট টার্মিনাল, পুজোর ছুটির আগে সেকেন্ড টার্মিনাল আর অবশেষে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক সুপ্রভাতে শুরু হতো অ্যানুয়াল বা বার্ষিক পরীক্ষা, সেটাই পাস ফেল, ক্লাসে ওঠার মোক্ষম পরীক্ষা।

একবার মনে আছে দুর্গাপুজো খুব এগিয়ে এসেছিলো, সেবার দুর্গাপুজোর

ছুটির খাড়াখাড়ি সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষা। পড়াশুনাও তেমন হয়নি, বিশেষ করে ভূগোল না ইতিহাসের এক নতুন মাস্টারমশায় এসেছিলেন। তিনি এক ভয়াবহ খাপছাড়া প্রশ্ন করে বসলেন যাতে দন্তস্ফুট করা একা আমার কেন প্রায় সকলেরই ছিলো দুঃসাধ্য।

দু-চারবার প্রশ্নপত্রটা উলটেপালটে দেখে আমি বুঝলাম এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা না করাই উচিত। ফেল তো করবোই, দুঃসাহসে ভর করে উত্তরের খাতায় কিছুই না লিখে লিখলাম, 'এই সব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র মা দুর্গাই দিতে পারবেন।'

পুজোর ছুটির পরে স্কুল খুললো। সকলের সঙ্গে আমিও আমার পরীক্ষার খাতা ফেরত পেলাম, তাতে আমার মন্তব্যের নিচে পরীক্ষক মহোদয় লিখে দিয়েছেন ঃ

'মা দুর্গাকে একশো দিলাম।

আর, তুমি পেলে শূন্য।'

আর একবার আমার এক পরীক্ষার খাতায় মাস্টারমশায় কোনো নম্বর না দিয়ে নিচে কি সব যেন লিখে দিয়েছিলেন, এত অস্পষ্ট, জড়াজড়ি সে লেখা যে কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

পরের দিন ক্লাসে মাস্টারমশায়ের কাছে খাতাটা নিয়ে গিয়ে জানতে চাইলাম, 'স্যার এখানে আপনি কি লিখেছেন ? আমাকে কোনো নম্বর দেননি কেন ?'

মাস্টারমশায় দাঁত খিচিয়ে বললেন, 'নম্বরের কথা কি বলছো, নম্বর দেবো কি করে, তোমার হাতের লেখাই তো পড়তে পারলাম না। তাই নিচে লিখে দিয়েছি পরিষ্কার করে লিখবে। যাতে বোঝা যায় !'

কিন্তু কে মাস্টারমশায়কে বোঝাবে যে তাঁর হাতের লেখাও বোঝা যায় না।

পরীক্ষার বিষয়ে আমার নিজের আর একটা দুঃখের গল্প আছে। গল্পটা আমার জানাশোনা অনেকেই জানে।

আমি তো কখনোই তেমন ভাল ছাত্র ছিলাম না। পরীক্ষায় খারাপ নম্বর পাওয়া আমার ক্ষেত্রে মোটেই অস্বাভাবিক ছিলো না। একবার আমি অঙ্ক পরীক্ষায় জিরো পেয়েছিলাম।

আমার রেজাল্ট শুনে বাবা খুব রেগে গিয়ে আমাকে মারতে গেলেন কিন্তু বাধা দিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা।

যখন তিনি শুনতে পেলেন যে আমি অঙ্ক পরীক্ষায় জিরো পাওয়ায় বাবা রাগারাগি করছেন এবং হয়তো আমাকে মারবেন তিনি তাড়াতাড়ি ঠাকুরঘর থেকে ছুটে কাছারি-ঘরে এসে বাবাকে নিবৃত্ত করলেন এবং শুধু তাই নয় তিনি সেদিন একটি আপ্তবাক্য বলেছিলেন।

কথাটা আপাতশ্রবণে খুব সামান্য মনে হলেও, খুব সামান্য নয়।

ঠাকুমা বলেছিলেন, 'একেবারে কিছু যে পায়নি তা তো নয়, জিরো তো পেয়েছে। এতো রাগারাগি করার কি আছে ?'

জিরো পাওয়া যে একেবারে কিছু না পাওয়া, জিরো যে শূন্য, শূন্য যে

মূল্যহীন এ সব কথা আমার ঠাকুমাকে সেদিন আমার বাবা বোঝানোর চেষ্টা করেননি।

তিনি তাঁর মাকে ভালোই জানতেন, জানতেন যে ইচ্ছে করলেই কথাটা মাকে বোঝানো যাবে না, মা বুঝবেন না।

বলা বাহুল্য সেদিন আমি পিতামহীর দয়ায় পরিত্রাণ পেয়েছিলাম। এবং আজো যখন জীবনের কোনো পরীক্ষায় আমি পরাজিত হই, গোহারা হেরে যাই মনে মনে ভাবি, একেবারে কিছু যে পাইনি তা তো নয় জিরো তো পেয়েছি।

আর জিরো নয়। এবার হালকা গল্প।

গল্পটা খুব পুরনো।

বহু লিখিত, বহু কথিত।

সত্যি সত্যি পরীক্ষার খাতায় ভুল করা নিয়ে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তীর এই গল্পটি শতসহস্রবার স্মরণীয়। নতুন যুগের পাঠক-পাঠিকারা যারা এখনো এ গল্পটি জানে না শুধু তাদের জন্যই আরো একবার লিখছি।

ইতিহাস পরীক্ষার খাতায় প্রশ্ন এসেছিলো স্বনামধন্য পাঠান সম্রাট শের শাহ সম্পর্কে। যেমন গতানুগতিক প্রশ্ন হয়ে থাকে।

'শের শাহের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করো।'

একটি ছাত্র এ বিষয়ে অনেক কিছু লিখে অবশেষে লিখেছিলো ঃ

'মহামান্য সম্রাট শেরশাহ তাঁহার রাজত্বকালে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করিয়াছিলেন, ইহার পূর্বে ঘোড়া ডাকিতে পারিত না।'

ইতিহাসের এই ছাত্রটির সঙ্গে অবশ্য ভূগোলের সেই ছাত্রটিকেও স্মরণ করা উচিত। সে বার্ষিক পরীক্ষার পরে প্রায় প্রত্যেকদিন সকাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে কালীবাড়িতে গিয়ে দেয়ালে মাথা রেখে কি সব বিড়বিড় করতো, তার হঠাৎ এই কালীভক্তি দেখে তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা কালীকে তুই এত কি বলিস।'

কিঞ্চিৎ ইতস্তত করে সে জবাব দিলো, 'মা কালীকে বলি, হে মা কালী অন্তত দিন পনেরোর জন্যে কটককে উড়িষ্যার রাজধানী করে দাও।'

বন্ধুটি অবাক হয়ে বললো, 'সে কি ? কেন ?'

ছাত্রটি জবাব দিলো, 'পরীক্ষার খাতায় যে ভুল করে ভুবনেশ্বর না লিখে কটক লিখে এসেছি।'

অভিনয় নয়

আমাদের বাল্যকালের একটি বহুশ্রুত গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি ছিল বোধহয় এইরকম ঃ

"অভিনয় নয় গো
অভিনয় নয়…"

যতদূর মনে পড়ে, "অভিনয় নয়" নামে একটি জনপ্রিয় সিনেমার গান এটি।

সেই সিনেমায় পরিচালক কে ছিলেন, কার কাহিনী, কারা ছিলেন নায়ক-নায়িকা—এতদিন পরে কিছুই মনে নেই ; কিন্তু সেই "অভিনয় নয় গো" গানের মধুর রেশটি আজও কানে লেগে রয়েছে।

এবারের এই রম্য নিবন্ধের বিষয়বস্তু অবশ্য গান বা ভুলে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া গান নয়—অত স্মৃতিঘন, বেদনামধুর বিষয় এখানে মানাবে না। এবার আমাদের উপজীব্য অভিনয়, অভিনয়ের তরল ও হাস্যকর উপাখ্যান।

একটি খুব গোলমেলে উপাখ্যান দিয়েই আরম্ভ করা যাক।

কিছুকাল আগে খুব ধুম পড়েছিল মাঠে-ময়দানে, খোলা মঞ্চে অভিনয় করার।

একদিন এক ছুটির দিনের বিকেলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উল্টোদিকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের সামনের মাঠটায় একটু পায়চারি করছি, দেখি সামনে একটা ছোটাখাটো জটলা।

চিরকালই কোথাও জটলা দেখলে আমি একটু এগিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী। এটুকু কৌতূহল আমার এখনো আছে এবং ভালোই লাগে ব্যাপারটা আমার।

আজও জটলার পিছনে গিয়ে দু'জন শীর্ণ লোকের ঘাড়ের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলাম কী হচ্ছে।

দেখি নাটক হচ্ছে—জোর অভিনয়। কয়েকটা গাছের মধ্যে খোলা জায়গায় বেশ কয়েকজন পাত্রপাত্রী হাত-পা ছুঁড়ে যে যার মতো অভিনয় করে যাচ্ছে। তবে নাটক মোটেই জমছে না, দর্শকেরা দু-চার মিনিট দাঁড়িয়েই কেটে পড়ছে—সোজা কথা পাবলিক নিচ্ছে না।

আমিও সরে পড়লাম। আমার পাশে আরেক ভদ্রলোক আসছিলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'এটা কী নাটক হচ্ছে?'

ভদ্রলোক খুবই বিরক্তভাবে বললেন, 'নাটক? নাটক কী বলছেন? এটা কি নাটক নাকি মশায়? দেখছেন না একটা লোকও দাঁড়িয়ে দেখছে না! বিনি পয়সার মজা, তাও দর্শক নেই।'

তারপর একটু থেমে নিয়ে ভদ্রলোক আবার বললেন, 'মানুষের কথা কি বলব মশায়? মানুষ দূরের কথা, এই জায়গাটা দেখছেন তো, আগে গাছে গিজ-গিজ করত। এখন একদম ফাঁকা, একদম ন্যাড়া হয়ে গেছে!'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মানে?'

ভদ্রলোক বোঝালেন, "মানে আর কী? এদের নাটক দেখে ত্রাহি-ত্রাহি ডাক ছেড়ে গাছগুলো পালিয়ে গেছে।"

অতঃপর এক উচ্চাভিলাষী যুবকের কথা মনে পড়ছে।

সিনেমায় অভিনয় করার লোভে আরো অনেকের মতো সে বোম্বাই গিয়েছিল। বোম্বাইয়ের স্টুডিয়ো পাড়ায় সিনেমা-কোম্পানির দরজায়-দরজায় ঘুরে সাতজোড়া চটি সে ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু তার অদৃষ্টে একটি পার্টও জোটেনি।

অবশেষে সারাদিন ব্যর্থ ঘোরাঘুরির পর সে যখন হতাশ মনে ও ক্লান্ত শরীরে তার আস্তানায় ফিরে আসছিল, একটি দ্রুতগামী লরি তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে

যায়। সে কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যায় বটে, কিন্তু তাকে তিন মাস হাসপাতালে থাকতে হয় এবং তার ডান পা কেটে বাদ দিতে হয়।

এই সময়ে হতভাগ্য যুবকটি হঠাৎ একদিন কাগজে দেখে, এক বিখ্যাত প্রযোজক তৈমুর লঙের ওপর একটি ছবি তোলার কথা ভাবছেন।

আমাদের এই যুবকটির সামান্য লেখাপড়া জানা ছিল। সে জানত, তৈমুর লঙ ছিলেন ইতিহাসের এক বীর যোদ্ধা এবং তিনি খোঁড়া ছিলেন। সেই জন্যে সাহেব ঐতিহাসিকেরা তাঁকে তিমুর দ্য লেম (Timur the lame) বা খোঁড়া তিমুর বলে অভিহিত করতেন।

যুবকটি ভেবে দেখলেন, এই হল সুবর্ণ সুযোগ—আমি খোঁড়াও হয়েছি, আবার অভিনয়ও করতে পারি। তৈমুর লঙের পার্ট করার জন্যে আমার মতো যোগ্য অভিনেতা আর কোথায় পাওয়া যাবে।

সঙ্গে-সঙ্গে যুবকটি প্রযোজকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। কিন্তু ভগবান এবং হিন্দি সিনেমার প্রযোজকের সাক্ষাৎ পাওয়া সমান কঠিন।

যা হোক, বহু সাধ্যসাধনা, বহুবিধ চেষ্টা করে যুবকটি একদিন পাঁচ মিনিটের জন্যে প্রযোজকের সাক্ষাৎ পেল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতে কোনো লাভ হল না। যুবকটির দুঃখের কাহিনী, তার খঞ্জ হওয়ার ঘটনা সংক্ষেপে শুনে, তারপর সে তৈমুর লঙের ভূমিকার অভিনয় করতে চায় এটা জেনে প্রযোজক মহোদয় একটি চিঠি দিয়ে তাকে চিত্র-পরিচালকের কাছে পাঠালেন।

পরের দিনই পরিচালকের সঙ্গে দেখা করল খঞ্জ যুবকটি। কিন্তু তাকে একবার দেখেই একেবারে বসিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'না, আপনাকে দিয়ে মোটেই হবে না। তৈমুর লঙের ছিল বাম পা খোঁড়া, আর আপনার দেখছি ডান পা খোঁড়া।'

এই যুবকটি শেষ পর্যন্ত অভিনেতা হতে পারেনি। কিন্তু অভিনেতা হতে পারলেও শেষ পর্যন্ত সেও সব সময়ে খুব সুখের ব্যাপার নয়।

অনেকদিন আগে কাণ্ডজ্ঞান নাকি বিদ্যাবুদ্ধিতে একটা দুঃখজনক ঘটনার কথা লিখেছিলাম। সে কোনো সামান্য অভিনেতা বা পার্শ্বচরিত্রের কথা নয়, রীতিমতো নায়কের কাহিনী।

এক নায়ক তাঁর পরিচালককে অনুরোধ করেছিলেন, 'স্যার, আপনার ঐ মদ খাওয়ার দিনে আপনি যদি আমাকে রঙিন শরবত না দিয়ে সত্যিকারের মদ খেতে দেন, তাহলে অভিনয়টা খুব জমাতে পারি।'

নায়কের এই সকাতর অনুরোধ শুনে ভ্রূ কুঁচকিয়ে পরিচালক বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। তবে আমারও একটা প্রস্তাব আছে।'

নায়ক বললেন, 'কী প্রস্তাব?'

পরিচালক বললেন, 'আপনি যেমন মদ খাওয়ার দৃশ্যে খাঁটি মদ খেতে চাইছেন, তেমনি গল্পের শেষে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার সিনে আপনাকে আসল বিষ খেতে হবে।'

হে হিসাব

ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি এবং বলে এসেছি হিসাব, পরে কলকাতায় এসে জেনেছি হিসেব।

হিসাব কিংবা হিসেব যাই হোক জিনিসটা সোজা নয়, জিনিসটাকে শেষ পর্যন্ত মেলাতেই হবে।

হিসেব যারা বোঝে ঠিকই বোঝে, যারা বোঝে না কখনোই বোঝে না। প্রগলভ এক বণিক তাঁর এক নিম্নবিত্ত বন্ধুকে বলেছিলেন, 'তুমি আমার চেয়ে সুখী।'

বন্ধুটি অবাক, মাত্র গতকালই তাঁর একটি কন্যাসন্তান হয়েছে এবং দুঃখের বিষয় এটি তাঁর সপ্তম কন্যা। তিনি বললেন, "এ কি বলছ সাধু? আমি গরীব মানুষ। আমার সাত-সাতটা মেয়ে আর তুমি কোটিপতি, সাতকোটি টাকার মালিক, আমি কি করে তোমার চেয়ে সুখী?"

কোটিপতি বললেন, "দ্যাখো সাত কোটির পরও আমার নিবৃত্তি হয়নি, আমার আরো চাই, কিন্তু সাত মেয়ের পরে তুমি কি আরো চাও?"

বলাবাহুল্য, বুদ্ধিমতী পাঠিকা অবশ্যই ধরতে পেরেছেন, যদি তিনি কন্যা-সন্তানের জননী হন তা হলে তো অবশ্য অবশ্য নিশ্চয়ই, এই দুই হিসেবের তুলনায় একটা বড়ো গোঁজামিল আছে।

হিসাব শব্দটি বাংলাভাষায় এসেছে সরাসরি আরবি থেকে। বাংলায় একটি চমৎকার শব্দ হিসাবনিকাশ, হিসাব ও নিকাশ দ্বন্দ্ব সমাস, প্রথম অংশটি তো আরবি আর দ্বিতীয় অংশ নিষ্কাশন থেকে নিকাশ, সংস্কৃত থেকে বাংলায় তদ্ভব শব্দ। তবে "হিসাব" চলতি বাংলায় অনেকদিন হলো "হিসেব" হয়ে গেছে। এই নিবন্ধের নামে "হিসাব" শব্দ ব্যবহার করলেও আমরা রচনায় "হিসেব" শব্দটি ব্যবহার করছি।

হিসেব কিন্তু সবসময় মেলে না।

সব হিসেব কোনোদিন কখনো মেলে না। কত লোক আছে সারাজীবন ধরে হিসেব কষে যায়। খাতার পর খাতা ভরে যায় দীর্ঘ কাটাকুটিতে, পেনসিল ফুরোনোর আগে পেনসিলের ইরেজার ফুরিয়ে যায়, কিন্তু হিসেব মেলে না। শ্লেট ছেয়ে যায় ধূসর অস্পষ্টতায়, শেষ পর্যন্ত হাতে থাকে সেই সুকুমার রায়ের "হ য ব র ল" বর্ণিত পেনসিল।

তবু ঠিক হাসিঠাট্টার কথা নয়। এমন অনেক দুর্ভাগা মানুষ আছে যাদের কোনো হিসেব কখনো মেলে না, সেই যে গানের কথা রয়েছে না যতবার আলো জ্বালাতে যাই, নিভে যায় বারে বারে। ভাগ্যের কাছে পরাজিত মানুষের দুঃখের গান, সে এই হিসেব না মেলারই গান।

এসব কথা যাক। দুঃখের কথা, বেদনার কথা আমার বলার প্রয়োজন নেই, এ-সব কথা বলার অনেক ভালো ভালো লোক আছে।

সুতরাং হালকা গল্প বলি। বহু পুরনো সব গল্প। শুধু লেখার জন্যে

লেখা।

সেই মাস্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়ছে যিনি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি যদি তোমার বাবাকে একশো টাকা দিই, আর তিনি যদি মাসে মাসে দশ টাকা করে আমাকে শোধ দেন তাহলে আট মাস পরে তাঁর কাছে আমার কত টাকা পাওনা থাকবে?"

প্রশ্ন শুনে সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নির্বিকারভাবে ছাত্রটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো, "একশো টাকা।"

উত্তর শুনে মাস্টার মশায় ধমকিয়ে উঠলেন, "সে কি! মাসে মাসে দশ টাকা করে আট মাস শোধ দেওয়ার পরেও একশো টাকা পাওনা থাকে কি করে?"

ছেলেটি আবার একইরকম নির্বিকারভাবে জবাব দিল, "হ্যাঁ একশো টাকাই পাওনা থাকবে।" তারপর মাস্টার মশাইকে দ্বিতীয়বার ধমকানোর সুযোগ না দিয়ে ব্যাখ্যা করে বলল, "আপনি তো আর আমার বাবাকে চেনেন না। আমার বাবা কোন টাকাই শোধ দেবে না।"

এক্ষেত্রে মাস্টার মশাইয়ের হিসেব মিলল না ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবে।

তবে অভিজ্ঞতাই সব নয়, জ্ঞান ব্যাপারটাও জরুরি।

স্কুলের নিচু ক্লাসে এক-দুই শেখাতেন দিদিমণি। খুব ছোটো একটা মেয়েকে একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন, "সুরমা বলো তো তিন আর এক যোগ করলে কত হবে?"

অনেক চিন্তা করে, অনেক মাথা ঘামিয়ে অবশেষে সুরমা বললো, "দিদিমণি বলতে পারছি না।"

তখন দিদিমণি বললেন, "তুমি ভারি কাঁচা অঙ্কে। তিন আর একে চার হবে, এই সামান্য যোগটুকু কষতে পারলে না?"

এবার কিন্তু সুরমা ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল, "কিন্তু দিদিমণি তা তো হতে পারে না।"

দিদিমণি অবাক হলেন, "কেন হতে পারে না!"

সুরমা বলল, "আপনিই তো কালকে বললেন, দুয়ে-দুয়ে চার হয়। তা একবার দুয়ে-দুয়ে চার হয়ে গেলে, তারপর আবার কি করে তিন আর এক যোগ দিলে চার হবে?"

তবে সবাই যে একরকম হিসেব শিখবে, সবাইকে যে একইরকম হিসেব শিখতে হবে তার কোনো কথা নেই।

কিছুদিন আগে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ বাইরের ঘরে বসে তার বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে গল্প। বাচ্চা মানে খুবই বাচ্চা এবং খুবই পাকা। তার নাম মনোরমা।

কথায় কথায় মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি গুণতে পারো, এক দুই গুণতে শিখেছ?"

মনোরমা বলল, "হ্যাঁ।"

আমি বললাম, "বলো দেখি।"

মনোরমা গড়গড় করে বলে গেল, "টেক্কা, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ।"

দশ পর্যন্ত ঠিক গুণে মনোরমা থেমে গেল, কিন্তু শুরুতেই একের বদলে টেক্কা শুনে আমার কেমন খটকা লাগল।

আমি মনোরমাকে বললাম, "তার পরে?"

একটু চুপ করে থেকে মনোরমা বলল, "গোলাম, বিবি, সাহেব।"

ভেতরের ঘর থেকে তখন চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, "থ্রি নো ট্রামপস," "ফোর ডায়মন্ডস্"...।

তুমুল তাস খেলা চলছে। মনোরমার বাবা, মা, কাকা, পিসি তাদের বন্ধুবান্ধব দিনরাত তাস খেলছে। মনোরমার এক দুইয়ের হিসেবে দুয়েকটা তাস ঢুকে যাবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

পুনশ্চ ঃ

অবশেষে পাঠক-পাঠিকাদের হিসেবের দৌড় একটু পরীক্ষা করে দেখি।

একটা সোজা প্রশ্ন করছি।

বলতে পারেন, যদি কারো জন্ম হয় উনিশশো পঞ্চাশ সালে, তাঁর এখন বয়েস কত?

এর উত্তর যত সোজা ভাবছেন, তা কিন্তু নয়। এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আপনাকে আগাগোড়াই একটা প্রশ্ন করে প্রশ্নকর্তার কাছে জেনে নিতে হবে যাঁর বয়েসের কথা জানতে চাওয়া হচ্ছে, তিনি কি পুরুষ না স্ত্রীলোক?

একেক জিনিসের হিসেব একেক রকম।

সুখের সন্ধানে

সুখ-অসুখের পরে শুধু সুখ, সুখের সন্ধানে।

অনেকদিন আগে একটি বিখ্যাত ইংরেজি বই বাংলায় এই নামে অনুবাদ হয়ে গ্রন্থাকারে প্রচলিত হয়েছিল। তবে সে-গ্রন্থের মূল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দার্শনিক। সে দর্শন 'কি খবরে' পোষাবে না।

বরং সেই ছোটো ছেলেটির কথা মনে করা যাক। সেই সুখী বালকটি বলেছিল, "সুখে আমি টইটম্বুর, আনন্দে আমি কানায়-কানায় ভরে আছি, এর চেয়ে বেশি সুখ, বেশি আনন্দ রাখার আমার উপায় নেই যতদিন-না আমি আরো একটু বড়ো হচ্ছি।"

বালক বড়ো হয়ে কিশোর হবে, কিশোর থেকে যুবক হবে, বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সুখ বাড়বে। কিন্তু আমরা তো আর বয়েস বাড়ার সঙ্গে বাড়ব না; আমাদের স্থিতি এসে গেছে। এখন যদি আমাদের সুখ বেড়ে যায়, সে সুখ রাখব কোথায়?

এসব অবশ্য নিতান্তই বাজে কথা। সুখের আবার কম-বেশি, বাড়া-কমা কি? একজন মানুষ হয় সুখী, না-হয় সে সুখী নয়। এর মাঝামাঝি কিছু নেই।

তবে সুখকে পেতে হলে সুখ রচনা করতে হবে। সেটা পথে পড়ে পাওয়া যাবে না। অনেকদিন আগে জর্জ বার্নার্ড শা এ-বিষয়ে একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন ঃ

"তখনই তোমার সুখের অধিকার জন্মায়, যখন সে-সুখ তুমি নিজে তৈরি করেছ। পৃথিবীতে কারো অধিকার নেই কোনো জিনিস উৎপাদন না করে ভোগ করা।"

বড়ো জটিল হয়ে গেল সুখের মতো সরল জিনিস।

একবার এক যাজককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি কি সুখী?" যাজক বলেছিলেন, "নিশ্চয়ই।"

তখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, "কী করে?"

যাজক বললেন, "যখনই সন্দেহ হয় আমি সুখী কিনা একবার ওপরের দিকে তাকাই, আকাশের দিকে, যেখানে স্বর্গ ও ঈশ্বর রয়েছেন, আর মনে-মনে ভাবি, শেষ পর্যন্ত আমাকে ওখানে পৌঁছতে হবে। তারপর নিচের দিকে তাকাই, বুঝতে পারি যখন আমাকে মৃত্যুর পরে কবর দেওয়া হবে, কত কম জায়গা লাগবে আমার। অবশেষে চারপাশে তাকাই, দেখি আমার চেয়ে যোগ্য কত লোক আমার চেয়ে কত খারাপ রয়েছে, তখনই বুঝতে পারি আমি সুখী, খুবই সুখী।"

সেই এক মনীষী বলেছিলেন, "সুখ মানে অঢেল অর্থ নয়, অল্প চাহিদা।"

কথাটার মানে খুব সোজা কিন্তু মানুষের জীবনে অল্প চাহিদা বলে কিছু নেই। এক চাহিদা পূর্ণ হলে অন্য চাহিদা আসে, চাহিদাই চাহিদাকে ডেকে আনে। তা আনুক, কিন্তু শুধু চাহিদা পূরণ হওয়া আর সুখী হওয়া এক জিনিস নয়।

এক মেমসাহেব একবার আমাকে সুখী হওয়ার একটা গল্প বলেছিলেন। গল্পটি বেশ বড়ো ছিল। এখন আর সম্পূর্ণ মনে নেই। শেষ অংশটুকু মনে পড়ছে। সুখী হওয়ার মূল প্রশ্নটি এই শেষাংশেই নিহিত রয়েছে।

গল্পটি পুরনো ধাঁচের, কিন্তু এর পরিণতিতে একটা অভিনবত্ব রয়েছে।

এক প্রণয়পিপাসু যুবক তাঁর বাঞ্ছিতাকে অনুরোধ করলেন, "তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছো?"

বাঞ্ছিতা রমণীটি কোনোরকম ছলছুতো না করে সরাসরি বলে দিলেন, "না।"

গল্পটি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। এই গল্পের শেষ বাক্যটি রূপকথার, "এর পরে তাঁরা দু'জনে সমস্ত জীবন খুব সুখে অতিবাহিত করলেন।"

অর্থাৎ যে যা বাঞ্ছা করছে, তা না পেলেও সে সুখী হতে পারে।

নতুন যুগের পাঠশালায় লেখাপড়ার নানা রকমফের। আমাদের ছোটোবেলায় লেখাপড়ার সীমানা ছিল—হাতে স্লেট, সামনে ব্ল্যাকবোর্ড এবং বাঁয়ে কিংবা ডাইনে বেত হাতে গুরুমশায়।

একালে তেমন আর নেই। যেসব কোম্পানী স্কুলে-স্কুলে বেত্রদণ্ড সরবরাহ করত, তাদের মালিকেরা কবে অনাহারে মারা গেছে।

নতুন যুগের শিক্ষণরীতি সম্পূর্ণ অন্যরকম। এক নব্য বিদ্যালয়ের নবীনা

দিদিমণির শিক্ষাপদ্ধতি অতি আধুনিক ও চমকপ্রদ।

একদিন দিদিমণি ক্লাসে এলেন এক ব্যাগ ভর্তি রঙিন রিবন নিয়ে। ছোটো-ছোটো মেয়েদের ক্লাস, তাদের একে-একে ডেকে-ডেকে তিনি প্রত্যেককে তিনটে করে রিবন দিলেন।

তিনটে রিবনের তিনরকম রঙ—লাল, নীল আর হলুদ। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, "এই লাল রঙের ফিতেটা হল জীবন, এই নীল রঙের ফিতেটা হল আনন্দ, আর এই হলুদ রঙের ফিতেটা হল সুখ।"

দিদিমণি ঠিক কী পড়াতে চাইছিলেন বলতে পারব না। বাচ্চা মেয়েরা এসবের কী বুঝবে তাও জানি না; তবে দিদিমণি সকলকে ঐ তিন রঙের তিনটে করে রিবন দিয়ে বললেন, "এগুলো তোমরা নিজেদের সঙ্গে বাড়ি নিয়ে যাবে। ভুলো না যেন কোন্‌টা কী? কাল ক্লাসে নিয়ে আসবে, সবাইকে বলতে হবে কোন্ রঙের রিবন কী?"

মেয়েগুলো পরের দিন যথারীতি ক্লাসে এল। সবাই ঠিকঠাক, রিবনগুলো ফেরত এনেছে সবাই এবং সকলেই ঠিকমতো বলল কোন্‌টা জীবন, কোন্‌টা আনন্দ আর কোন্‌টা সুখ।'

শুধু একটি মেয়ে ব্যতিক্রম। তার স্কুলের বাক্সে দেখা গেল দুটো মাত্র ফিতে রয়েছে। লাল আর নীল রঙের। তৃতীয়টি অর্থাৎ হলুদ রঙের রিবনটি নেই।

দিদিমণি প্রশ্ন করাতে মেয়েটি কিন্তু ঠিকঠাক উত্তর দিল। বলল, "এই লাল রঙের ফিতেটা হল জীবন। এই নীল রঙেরটা হল আনন্দ।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের চুলের ঝুঁটিটায় হাত দিয়ে হলুদ রঙের ফিতেটা দেখাল, দেখিয়ে বলল, "আমার মা সুখ দিয়ে আমার চুল বেঁধে দিয়েছে।"

এক্ষেত্রে সুখের তবু একটা চেহারা পাওয়া গেল, সুখ একটা হলুদ রঙের।

ইংরেজ কবি শেলি বলেছিলেন, "তোমরা সুখ খুঁজে বেড়াচ্ছ। কিন্তু হায়, সুখ কোনো বিলাসদ্রব্য নয়, সুখ নয় সোনা।...

...এমনকি খ্যাতি বা ঈর্ষণীয় প্রতিপত্তি, কিছুই ঠিক সুখ নয়।

..."অথচ সেই সুখের জন্যে তোমরা তোমাদের হৃদয়গুলোকে বিক্রি করে দিয়েছ।"

পুনশ্চ ঃ

জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কারো কপালে নেই।

ধর্মকথায় স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, চাকার মতো ঘোরে আর ঘোরে সুখ আর দুঃখ। কখনো সুখ, কখনো দুঃখ—মহাকালের চাকায় ঘুরছে সুখ-দুঃখ।

এ-বিষয়ে সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা আমার এক বান্ধবীর। সে চিরদিনের পরম দুঃখিনী। বহু ভালোবেসে সে যাকে বিয়ে করেছিল, সে ভদ্রলোক ছিলেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রার।

ভালোই লোক ছিলেন তিনি, কিন্তু বিয়ের পর দশ মাসের মধ্যে তিনি পরলোক অভিমুখে যাত্রা করলেন। এর পর আমার সেই বান্ধবীকেই স্বামীর কাজটা নিতে হল।

সুখের গল্পে আমার সেই দুঃখিনী বান্ধবীকে স্মরণ করলাম একটি কারণে। তার সঙ্গে সেদিন দেখা, সে বলল, যাদের সে বিয়ে দেয় তাদের কাছ থেকে সে মধ্যে-মধ্যে ধন্যবাদসূচক চিঠি পায় এবং অনেকেই লেখে—

"আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

আপনার কৃপাতেই আমাদের বিয়ে হল, আমাদের সুখের এমন পরিসমাপ্তি ঘটল।"

মাছ

ভগবানের প্রথম অবতার হল মাছ।

মাছ হল আমাদের দেবতা।

আবার প্রেমের দেবতা, কামের দেবতা মদনের নাম হল মীনকেতন, মীনধ্বজ। মদনের পতাকার প্রতীক মাছ।

বাঙালি হিন্দুর সব মঙ্গলকার্যে মাছ অপরিহার্য। বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে তো বটেই, শুভ বিজয়াদশমীতে, শ্রীপঞ্চমীতে জোড়া মাছ লাগবে। জোড়া ইলিশ যদি নেহাতই না জোটে, আঁশওয়ালা একজোড়া মাছের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে বরণ করতে হবে।

এদিকে আবার রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির অন্যতম হল মীনরাশি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি আত্মজীবনীমূলক কবিতায় লিখেছিলেন যে, তিনি যদিও সঠিক জানেন না—তাঁর ধারণা, তাঁর হল মীনরাশি, কারণ "যেরকম মাছ ভালো-বাসি"।

আরো অনেক আগের বাঙালির অন্য এক প্রাণের কবি প্রার্থনা করেছিলেন, "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।

অবশ্য এই দুধে-ভাতের সঙ্গে মাছে-ভাতের জন্যে দুর্বলতাও আমাদের কম নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙালির আহার তালিকা থেকে দুধ-ভাত অনেকদিন বিদায় নিয়েছে। কষ্টেসৃষ্টে মাছে-ভাতে এখনো একটু টিকে আছে।

মাছের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মেছোগল্পের কথাও বলতে হয়। মেছোগল্প মানে আঁশটে গন্ধওয়ালা গল্প, যাকে ইংরেজিতে বলে ফিশি টেল (Fishy tale)। কোনো ঘটনা বা ব্যাপার সন্দেহজনক বা গোলমেলে মনে হলে বলা হয় ফিশি ব্যাপার।

মাছের গল্প প্রথমে যেটা মনে পড়ছে, সেটা এক মৎস্য-শিকারীর। অবশ্য মাছের অধিকাংশ গল্পই হতভাগ্য মৎস্য-শিকারীকে নিয়ে।

ধরেই নেওয়া হয়, যাঁরা ছিপ দিয়ে মাছ ধরেন, তাঁরা তাঁদের মাছ শিকারের গল্পগুলো একটু বানিয়ে একটু বাড়িয়ে বলেন। কথাই আছে যে একজন মৎস্য-শিকারী তখনই সত্যি কথা বলেন, যখন অন্য কোনো মৎস্য-শিকারী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, "ও লোকটা মিথ্যুক"।

একটা সত্যি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে অসঙ্গত হবে না। আমার এক কাকা ছিলেন শৌখিন মৎস্য-শিকারী। ছিপ, বঁড়শি, চার, টোপ ইত্যাদিতে ছিল তাঁর

প্রবল উৎসাহ। আর উৎসাহ ছিল মাছের গল্প বা মাছ ধরার গল্প বলায়।

একদিন লক্ষ্য করলাম, কাকা লোকদের একটা কাতলা মাছের গল্প বলছেন যে, মাছটা তাঁর ছিপের সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু গল্পটার গোলমাল হল এই যে, কাকা একেকজন লোককে মাছটার আকার একেকরকম দেখাচ্ছেন।

বেশ কয়েকবার এ-ঘটনা ঘটবার পর আমি কাকাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একেক-বার একেকজন লোককে কাতলা মাছটার সাইজ একেকরকম বলছ কেন?"

মৃদু হেসে কাকা বললেন, "যে যতটা বিশ্বাস করবে, যে যেমন বিশ্বাস করবে তাকে তেমন সাইজ বলি। আমি কখনো কাউকে মাছটার আকার তত বড়ো বলি না যত বড়ো সে বিশ্বাস করবে না।"

ছিপ-বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার কাহিনীর সঙ্গে এবার জাল দিয়ে মাছ ধরার গল্প বলতে হয়।

কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণে একবার ফাল্গুন মাসে দেখি, সারি সারি ইলিশ মাছ ধরার নৌকো। ফাল্গুন মাসে ইলিশ মাছ একটু অস্বাভাবিক। তীরের কাছ দিয়ে একটা নৌকো যাচ্ছিল। আমি সেই নৌকোর মাঝিদের চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনারা যে এখন ইলিশ মাছ ধরতে যাচ্ছেন, এটা কি ইলিশ মাছের সময়?"

অত্যন্ত বিরক্ত মুখে এক প্রবীণ জেলে নৌকো থেকে আমাকে জানালেন, "দেখুন, যখন ইলিশের সময়, একটা ইলিশও তখন নদীতে আসেনি, আবার এখন যখন ইলিশের সময় নয়, তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে হাজারে-হাজারে ইলিশ নদীতে চলে এসেছে। তা ইলিশরা নিজেরাই যদি তাদের নিয়ম না মানে, আমরা সে নিয়ম মেনে কী করব?"

অনেক হাসির ব্যাপার হল। এবার একটা দুঃখের গল্প বলি।

গল্পটা খুবই পুরনো, খুবই দুঃখের, চিরকালের এবং চিরদেশের। যে-কোনো শৌখিন মাছশিকারী, যিনি কিনা ছিপ-বঁড়শি, চার-টোপের কারবারি, তাঁর মনের গোপনতম দুঃখের সত্য কাহিনী এটা।

সাতদিন ধরে চারের মশলা যোগাড় করা হয়েছে। তেলের ঘানি থেকে আনা হয়েছে সরষের খোল—যা তিনদিন জলে ভিজিয়ে সারা বাড়ি পচা গন্ধে ভরে গিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হালুইকরের দোকান থেকে নিয়ে আসা চিনির গাদ, যেটা মিষ্টি বানানোর কড়াইয়ের ওপরের সাদা ফেনা থেকে কালো লোহার হাতায় তুলে উনুনের পাশে একটা বড়ো গামলায় রেখে দেওয়া হয়।

হাজার বোতল চোলাই মদের মাদার টিংচার (mother tincture) এক হাতা চিনির গাদ।

সেই চিনির গাদের মদির সৌরভে শুধু বাড়ি বা পাড়া নয়, পুরো এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে!

এবং এখানেই শেষ নয়।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একাঙ্গী, টম্বল, ছোটএলাচ, মেথি—এইসব দামী মসলা-সমূহের ভাজা গুঁড়ো। তার গন্ধও কম মনোহর নয়।

এ হল চারের কথা। এর পরে টোপ আছে, হুইল আছে সুতো আছে, বঁড়শি আছে, ফাতনা আছে। সে এক বিরাট রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার।

কিন্তু ফল কী হল?

সারাদিনের পণ্ডশ্রমের শেষে শূন্য হাতে এবং ব্যথিত হৃদয়ে মৎস্য-শিকারী ফিরলেন। যথারীতি একটি মাছও তিনি ধরতে পারেননি। কিন্তু বাড়িতে তো খালিহাতে বাড়ি যাওয়া যায় না—সে তো মহা হাসাহাসির ব্যাপার হবে। ফেরার পথে ভদ্রলোক এক মাছের দোকানে গিয়ে চারটে মোটামুটি সাইজের মাছ কিনলেন তারপর মাছওয়ালাকে বললেন, "ভাই, মাছগুলো আমাকে দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও তো। আমি ধরি।"

মাছওয়ালা অবাক হয়ে বললে, "কেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "তাহলে আর কিছু না হোক, বাড়ি গিয়ে বলতে পারব মাছগুলো আমিই ধরেছি। শুধু শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না।"

পুনশ্চ ঃ

নদীর ধারে দাঁড়িয়ে একজন লোক ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিল। হঠাৎ তার ছিপে ধরা পড়ল একটা অতিকায় বোয়াল মাছ।

একটু টানা-হ্যাঁচড়ার পর বোয়াল মাছটা অতর্কিতে বঁড়শির সুতোয় জোর ঝাঁকি দিতে লোকটা ছিপ সমেত জলে পড়ে গেল।

অতঃপর শুরু হল মাছে-মানুষে লড়াই। একদিকে বঁড়শির ও-প্রান্তে মহাবলী বোয়াল মাছ মাছের শিকারীকে টানছে, অন্যদিকে জলের মধ্যে ছিপ হাতে লোকটা মাছটাকে খেলিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

রাস্তা দিয়ে সরল প্রকৃতির এক গ্রাম্য লোক যাচ্ছিল। সে এই দৃশ্য দেখে স্বগতোক্তি করল, "আমি বুঝতে পারছি না মানুষ মাছ ধরছে, না মাছ মানুষ ধরছে।"

কুসংস্কার

কুসংস্কার একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। একটা বোকামি। কেউ কেউ বলবেন নির্বুদ্ধিতা।

কিন্তু বলুন তো, অফিসে বেরোবার সময়ে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের ছবিতে একটা নমস্কার করে বেরোতে ঠিক কয় পয়সা খরচ হয়। কিংবা ট্রামে যেতে-যেতে কালীঘাট পার্কের পাশে কেউ যদি মাথা একটু নিচু করে, চোখ একটু বুজে থাকে তাতে কার ক্ষতি?

হ্যাঁ ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি হয়।

দৈবদুর্বিপাক, গ্রহের ফের কাটানোর জন্যে আমাদের জানাশোনার মধ্যে কত লোক মাদুলি-কবচে, যাগযজ্ঞে, হোম-স্বস্ত্যয়নে বহু টাকা ব্যায় করে। বহু অর্থ যায় জ্যোতিষী, পুরোহিত, মোল্লার পিছনে।

কত লোক বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়ে চৌকাঠে অন্যমনস্কভাবে হোঁচট খেয়ে সেটাকে বেরোনোর পক্ষে বাধা বা অমঙ্গল ধরে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে এসে আবার পাঁচ মিনিট বসে ফাঁড়া কাটিয়ে তারপর বেরোয়। অনেকে হাঁচির সঙ্গে বা টিকটিকির ডাক শুনেও এরকম করতে পারে, কিন্তু ঐ পাঁচ মিনিট দেরি করে বেরোনোয় তার ট্রেন ফেল হয়ে যায় কিংবা ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি করে ট্রেনে উঠতে গিয়ে তার কোনো দুর্ঘটনাও হতে পারে এবং হয়েও থাকে।

হাঁচি, কাশি, টিকটিকির ডাক, পেছন থেকে ডাকা কিংবা ফাঁড়া, খারাপ সময় তুঙ্গে বৃহস্পতি অথবা বক্রী শনি—এসব শুধু যে আমাদের মতো গরিব দেশের অশিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত দৈব-নির্ভর মানুষেরাই মেনে চলে তা নয়। পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই, এমন কোনো দেশ নেই যেখানে কুসংস্কার নেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নেই।

পাঁঠা-মানত থেকে সতীদাহ, অনামিকায় মূল্যবান নীলাধারণ থেকে কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে পরীক্ষার হলে বা চাকরির ইন্টারভিউতে যাওয়া—এসবই কুসংস্কারের নানারকম হেরফের। কোনোটা মৃদু, কোনোটা বেশ জোরালো, কোনোটা সামান্য, কোনোটা মারাত্মক।

কতরকম কুসংস্কার যে কত দেশে রয়েছে তার আর কোনো ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশে কালো বেড়াল অমঙ্গল, অথচ সাহেবদের কাছে কালো বেড়াল সৌভাগ্যসূচক।

বাঙালির কুসংস্কারের একটা দীর্ঘ তালিকা পাওয়া যাবে খনার বচনে। পথিমধ্যে মৃতদেহ চোখে পড়লে মঙ্গল, শেয়াল বাঁদিকে পড়লে শুভ কিন্তু ডানহাতে অশুভ—এইরকম খুঁটিনাটি ছোটো-বড়ো আরো কত কি।

আমাদের অল্প বয়সে ভাতের থালায় আঁকিবুকি কাটলে মা-ঠাকুরমারা বলতেন অমঙ্গল হবে। বাড়িতে ধার দেনা হবে। আসলে অনেক কুসংস্কারই প্রয়োজনীয় বিধিনিষেধের একটা বেড়াজাল।

কুসংস্কার সম্পর্কে এক সাহেব বলেছিলেন যে, কুসংস্কার হল মনের বিষ। আর সেই বিখ্যাত বাগ্মী এডমন্ড বার্ক বলেছিলেন, কুসংস্কার হল দুর্বল মনের ধর্ম। তবে ভলতেয়ার সরাসরি বলেছিলেন কুসংস্কারকে ধ্বংস করে ফেলতে।

তবে সব প্রচলিত কুসংস্কার পরিবেশ বা সমাজ থেকে পাওয়া বা পারিবারিক সূত্রে লব্ধতা নয়। একজন হয়তো একজোড়া নতুন চপ্পল প্রথম দিনেই পায়ে দিয়ে ট্রামে উঠতে একটু হোঁচট খেয়েছিল, তার মনে কিন্তু সেই নতুন চপ্পলজোড়া সম্পর্কে একটু খট্‌কা জন্মাল, পরের দিন ঐ চপ্পল পায়ে দিয়ে আবার সে যদি কোথাও সামান্য হোঁচট খায় বা আঘাত পায়—সে হয়তো আর কখনোই ঐ নতুন জুতোজোড়া পায়ে দেবে না।

চরম বিজ্ঞান ও মুক্তমনের দেশ বলে যার খ্যাতি—সেই মার্কিন দেশে কুসংস্কার মজ্জায়-মজ্জায়, হাড়ে হাড়ে।

পুরো আমেরিকায় এমন কোনো শহর পাওয়া যাবে না যেখানে কোনো গলিতে বা রাস্তায় তেরো নম্বর বাড়ি আছে। ঠিক একইভাবে হোটেলে তেরো নম্বর ঘর

নেই, বহুতল অট্টালিকায় ত্রয়োদশতল নেই—বারোর পরেই চৌদ্দ, তেরো একেবারেই অদৃশ্য।

আগামী উনিশশো সাতানব্বুই খুবই খারাপ বছর। কারণ এক-নয়-নয়-সাত (১৯৯৭) হল ছাব্বিশ অর্থাৎ তেরোর দ্বিগুণ। শুধু তেরোই মারাত্মক, ডবল তেরো ভাবাই যায় না!

কুসংস্কারের অন্য একটা অতি সাধারণ উদাহরণ দিচ্ছি।

আমেরিকায় যে-কোনো হোটেলের ঘরে থাকুন, অবশ্যই দেখবেন বিছানাটা বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে লাগানো। অর্থাৎ বিছানা থেকে নামতে গেলে ডানদিক থেকে নামতে হবে।

এর কারণ আর কিছুই নয়, একটা বহু প্রাচীন কুসংস্কার। যা-কিছু শুভ এবং ঈশ্বরীয় সব দেহের ডানদিকে রয়েছে, আর খারাপ, শয়তানীয় ব্যাপারস্যাপার শরীরের বাঁদিকে অবস্থান করে। ফলে কেউ সকালবেলায় বিছানার বাঁদিক দিয়ে নামলে, সারাদিন নানা খারাপ ব্যাপার তার ওপরে প্রভাব বিস্তার করবে। তার সারাদিন খারাপ যাবে।

এই রম্য নিবন্ধটি কেমন যেন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের মতো হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, বিষয়গুলোই এমন ঘটেছে।

তবু সাহেবি কুসংস্কারের অন্তত একটা মজার গল্প বলি।

বিলেত দেশটায় মইয়ের নিচে দিয়ে হেঁটে যাওয়া খুব অশুভ বলে পরিগণিত হয়। কেউ যদি দেখে কোথাও দেওয়ালে বা গাছের সঙ্গে একটা মই ঠেস দিয়ে রাখা আছে, সে পারতপক্ষে সেই মইয়ের তলা দিয়ে হেঁটে যাবে না। যদি ভুল করে বা না দেখে কেউ হেঁটে যায় তবে তার খুবই অশুভ কিছু, খুব অমংগল হওয়ার আশঙ্কা।

এই ব্যাপার নিয়ে এক সাহেবের আধুনিকা মেমসাহেব একদিন স্বামীকে পরিহাস করে বলেছিলেন, 'ওগো, তোমার সেই আমাদের প্রথম আলাপের দিনটি মনে আছে? সেই যে তুমি হঠাৎ খেয়াল করলে, আমরা দুজনে একটা মইয়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছি আর তুমি বললে, এবার খুব সাংঘাতিক কিছু আমার জীবনে ঘটবে। কই, তারপরে তো দশ বছর হয়ে গেল, সেরকম সাংঘাতিক কিছু কি ঘটল?' সাহেব গলা নামিয়ে বললেন, 'ঘটেনি?'

পুনশ্চ ঃ

এক ঃ আমরা অনেকেই মুখ ফুটে বলি বটে আমাদের কোনো কুসংস্কার নেই। কিন্তু একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, যদি পাশাপাশি দুটো শুভবিবাহের তারিখ থাকে মাসের বারো, আর তেরো, যদি বিয়েটা হয় নিজের মেয়ের, তা'হলে কি তেরো তারিখটা বাদ দিয়ে বারো তারিখটাই নির্দিষ্ট করবেন না?

দুই ঃ এক ফাঁসির আসামীকে জেলারবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার ভাগ্যে এরকম ঘটল কেন?'

ফাঁসির আসামি বললেন, 'আর বলবেন না। তেরোর গেরো।'

জেলারবাবু বললেন, 'মানে?'

সেটা ছিল জুরির বিচারের যুগ, ফাঁসির আসামী বললেন, 'বারোজন জুরি আর একজন জজ—এই তেরোজনে মিলে আমার এই সর্বনাশ করল।"

ভালো আছি

একটা পিঁপড়ের সঙ্গে চলার পথে অন্য একটা পিঁপড়ের দেখা হলে, দু'জনে দু'জনের মুখ শোঁকে। মনে হয়, তারা দু'জন পরস্পর পরস্পরকে কুশল জিজ্ঞাসা করছে কিংবা হয়তো শুভেচ্ছা বিনিময় করছে।

একজন মানুষের সঙ্গে তার একজন চেনা মানুষের দেখা হলে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, "কেমন আছেন ?"

মনে হয়, এই 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করার লৌকিকতা আমরা সাহেবদের কাছ থেকে পেয়েছি। সাহেবরা একে অন্যের সঙ্গে দেখা হলে প্রশ্ন করতেন, "হাউ ডু ইউ ডু ?" (How do you do ?) "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসাটি এরই আক্ষরিক অনুবাদ।

অবশ্য "কেমন আছেন" জিজ্ঞাসাটির অনেক রকমফের আছে। অনেকে সরাসরি জানতে চান,, "কী, ভালো তো ?" অনেকে আরো বিস্তৃতভাবে জানতে চান, তাঁদের জিজ্ঞাসার পরিধি আরো একটু বড়। তাঁরা প্রশ্ন করেন, একইসঙ্গে পরপর জানতে চান, "কেমন ? বাড়ির সবাই কেমন ?"

এই কুশল জিজ্ঞাসা শুধু দেখা হয়ে গেলেই নয়, চিঠিপত্রে টেলিফোনে ভদ্রতার একটা রীতিই হল জিজ্ঞাসা করা, "কেমন আছেন ?" যার সংক্ষিপ্ত উত্তর হল, "ভালো। আপনি ? আপনি ভালো তো ?"

অবশ্য এই জগৎ-সংসারে এমন অনেক ব্যক্তি বিচরণ করেন যাঁদের কোনো কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এক মহা বিড়ম্বনা। তাঁরা ধরে নেন সত্যিই তাঁদের কাছে বিস্তারিতভাবে আমরা জানতে চাইছি তাঁরা কেমন আছেন।

প্রশ্নের উত্তর আধঘণ্টাব্যাপী। "পাড়ায় একটা নেড়ি কুকুর পাগল হয়ে গেছে, পিসিমার গলব্লাডারে স্টোন হয়েছে, রেশনের দোকানে যে রেপসিড দিচ্ছে সেটা খেলে চোঁয়াঢেকুর ওঠে, এক মাস ছয়দিন পরে বড়মেয়ের চিঠি পেয়েছেন। নাতীটির হাম হয়েছিল, এখন বাটার দোকানে জুতো পাল্টাতে যাচ্ছেন। গত সপ্তাহে কিনেছিলেন এর মধ্যে একবারও পরে ফেলেননি। সময় পাননি বলে ফেরত দিতে আসতে পারেন-নি। এখন ফেরত নেবে কে জানে…"

কেমন আছেন প্রশ্নের জবাবদিহি শুনতে আপনার ট্রেন ফেল হয়ে গেল। সেই জন্যে কুশলজিজ্ঞাসার বিকল্প অনেক নিরাপদ।

প্রথম বিকল্প "হেঁ হেঁ"। রাস্তাঘাটে পরিচিত লোকের সামনাসামনি পড়ে গেলে হেঁ হেঁ বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া। এর চেয়ে ভদ্র হল নমস্কার জানানো, অবস্থাভেদে সালাম, আদাব কিংবা গুড মরনিং বলেও দ্রুত রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু "ভালো তো" প্রশ্নের মধ্যে একটা আন্তরিকতা আছে, যা বিকল্পে নেই।

ভালোর ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। ভালো কি? খারাপ কি?

ভালো এবং খারাপের মধ্যে পার্থক্য কি?

এ-নিয়ে নানারকম চিন্তা ও যথেষ্ট মতভেদ আছে। একজনের কাছে যা খারাপ অন্যের কাছে তাই ভালো হতে পারে। আবার অন্যদিকে আমি যা ভালো ভাবি তুমি হয়তো সেটাকে ভালো ভাবো না।

সেই পুরনো ঈশপের নীতিগল্পে আছে বালকেরা পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মনের আনন্দে খেলা করছিল। কিন্তু সেই ঢিলের আঘাতে পুকুরের ব্যাঙেরা আহত ও নিহত হচ্ছিল। বালকদের পক্ষে যা খেলা, ব্যাঙেদের পক্ষে তাই মৃত্যু।

আবার একই সঙ্গে একটা জিনিস, একই মানুষ ভালো বা খারাপ, খারাপ বা ভালো হতে পারে। পঞ্চম হেনরি নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শেক্সপিয়র সাহেবের সেই অমর উক্তি রয়েছে, "সব খারাপের মধ্যে একটা ভালো আত্মা রয়েছে, মানুষের উচিত হল সেটা পরিশোধন করে ভেতর থেকে বার করে আনা।"

এই প্রসঙ্গে স্কটল্যান্ড-দেশীয় একটি প্রাচীন ছড়া অবশ্য স্মরণীয়—

"এই তো তুমি, তোমার মতো ভালো।
এই তো আমি, আমার মতো খারাপ।
তোমার মতো ভালো, আর আমার মতো খারাপ।
আমার মতো ভালো আর তোমার মতো খারাপ।"

ভালো-খারাপের আলোচনা কোটেশন কণ্টকিত করে লাভ নেই, তার চেয়ে যেখানে আরম্ভ করেছিলাম সেই 'ভালো আছি'তে ফিরে যাই।

এই দুর্দিনের বাজারে কেউ সহজে বলতে চায় না, স্বীকার করতে চায় না যে ভালো আছে। কোনোরকমে প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দেয়, "এই একরকম"। কিংবা "এই কেটে যাচ্ছে"।

"কেটে যাচ্ছে।" কথাটার সঙ্গে কেউ কেউ হয়তো একটা বোকা রসিকতা সংযুক্ত করেন, "কাটছে, কেটে যাচ্ছে, কিন্তু রক্ত বেরোচ্ছে না।"

বোকা রসিকতা নয়, একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির রসিকতা দিয়ে এই রম্যনিবন্ধের ইতি টানি।

ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী, বুদ্ধিমান এবং সুরসিক। কলকাতায় থাকলে প্রায় প্রতিদিনই ভদ্রলোকের সঙ্গে ময়দানে প্রাতঃভ্রমণের সময় দেখা হয়ে যায়।

ভদ্রলোক হাসিখুশি, যখনই দেখা হয় একগাল হেসে জানতে চান, "কেমন আছেন?" আমি কোনোরকমে দায়সারা জবাব দিই, "এই একরকম"। আপনার খবর কী? আপনি কেমন আছেন?"

ভদ্রলোক আরেকবার হেসে স্পষ্ট গলায় সরাসরি জবাব দেন, "ভালো আছি। বেশ ভালো আছি।"

আমার প্রতিদিনই কেমন খটকা লাগে, এত জোর দিয়ে আজকের বাজারে কেউ বলতে পারে যে সে ভালো আছে। মনে হয়, ভদ্রলোক সত্যি বলেন না, "ভালো আছি" কথাটা মন থেকে বলেন না।

অবশেষে একদিন ভদ্রলোককে বলেই ফেললাম কথাটা। সেদিন ময়দানে ভিড়

খুব কম, বেশি লোক হাঁটতে বেরোয়নি। শেষরাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। গাছের পাতা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। একটা জোলো হাওয়া বইছে পূবদিক থেকে।

কেবল্ ফলট্ না কি হয়েছিল, আগের দিন সন্ধ্যা থেকে বিদ্যুৎ নেই। গ্রীষ্মকাল। লোডশেডিংয়ের অবর্ণনীয় কষ্ট, সারারাত আলো পাখা ছিল না। এখন ঘর থেকে বেরিয়ে ঠান্ডা ময়দানে এসে একটু ভালোই লাগছে।

গাছের নিচের বেঞ্চগুলো ভেজা, সেই ভেজা বেঞ্চেরই এক প্রান্তে একটা রুমাল পেতে তার ওপরে বসে সেই "ভালো আছি" ভদ্রলোক। আজকে সকালে কেউ "ভালো আছি" বললে আপত্তি করা উচিত নয়। এইরকম ভাবছি, এমন সময় গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ঠান্ডা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে ভাবতে লাগলাম এই গরমেও এত ঠান্ডা।

দেখলাম ভদ্রলোকও ঠান্ডায় কম্পমান, বুঝলাম এই মোক্ষম মুহূর্ত, ভদ্রলোককে বললাম, "এখনো কি বলবেন, বলতে পারবেন—"বেশ ভালো আছি"।" ভদ্রলোক আগের মতোই হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ভালো আছি।" আমি বললাম, "ঝড়বৃষ্টির কথা না হয় বাদ দিলাম কিন্তু এই বাজারে, এই দুর্দিনে আপনি কীরকম করে ভালো থাকেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "তুলনামূলকভাবে ভালো থাকি।"

আমি বললাম, "তুলনাটা কিসের? কার সঙ্গে কার তুলনা?"

ভদ্রলোক বললেন, "আগামীকালের সঙ্গে তুলনায়?"

আমি বললাম, "আগামীকাল?"

ভদ্রলোক বললেন, "দেখুন, দিন-দিন তো অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আগামীকাল আজকের থেকে অনেক খারাপ হবে। তাই বলছিলাম আগামীকালের তুলনায় ভালো আছি।"

তারপর একটু থেমে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তবে যদি পরিষ্কার কথাটা জানতে চান সেটাও বলি, গতকালের তুলনায় নিশ্চয় খারাপ আছি। আপনি যে বলেন "একরকম," সেটাও সত্যি নয়, কেউ এখন একরকম নেই। সবাই আগের থেকে এখন খারাপ আছে। কিন্তু এই রকমই তো চলবে, দিন ধারাবাহিকভাবে খারাপ, আরো খারাপ হবে সেটা চিন্তা করেই বলি, "ভালো আছি, বেশ ভালো আছি", মানে আগামীকালের তুলনায় যথেষ্ট ভালো আছি।"

বৃষ্টি থেমে গেছে। ভেজা জামাকাপড়ে আর বেশিক্ষণ বাইরে থাকা যায় না। দু'জনে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

পথে আর বিশেষ কথা হল না। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি আর বেশি কথা বলবও না। দার্শনিকদের আমি একটু ভয় পাই, এড়িয়ে চলতে ভালোবাসি।

সুখ অসুখ

অভিধানমতে "সুখ" শব্দের অর্থ হল স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি, আনন্দ, আরাম, তৃপ্তি পাওয়া। মহাজ্ঞানী সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর 'সরল বাঙ্গলা অভিধানে' সুখ অর্থে 'হর্ষ' যুক্ত করেছেন।

'অসুখ' শব্দটি কিন্তু সুখের ঠিক বিপরীত নয়, অসুখ মানে ঠিক ইংরেজি 'unhappiness' নয়। সুখের অভাব অসুখ, ন সুখ অসুখ, নঞ তৎপুরুষ সমাস। কিন্তু অসুখের অর্থ দুঃখ, পীড়া, রোগ। স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব বা তৃপ্তির অভাবকে ঠিক অসুখ বলা যাবে না। 'অসুখ' শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি নিতান্ত নিজস্ব শব্দ। যার মানে হল পীড়া বা রোগ। কিন্তু অসুখী মানে নয় রোগাক্রান্ত বা পীড়াগ্রস্ত লোক, তার অর্থ আলাদা।

'সুখ অসুখ' নামক এই রম্যরচনার প্রারম্ভে এই বাগাড়ম্বর করতে গিয়ে এই মুহূর্তে মনে পড়ল যে, এই নামে একটি বিখ্যাত বাংলা উপন্যাস আছে এবং আমি নিজেও এই 'সুখ অসুখ' নাম দিয়ে হালকা নিবন্ধ এর আগেও লিখেছি।

সে যা হোক, আমার এই বর্তমান রচনা আমার খুব প্রিয় বিষয় নিয়ে, বিষয়টি হল অসুখ। তার মানে ডাক্তার ও চিকিৎসা। এ-বিষয়ে আমি ইতিপূর্বে উল্টোপাল্টা অনেক কিছু লিখেছি। তবে তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি সদা পীড়াগ্রস্ত, রোগকাতর এক দুর্বল ব্যক্তি। তা কিন্তু নয়, আমার শরীর স্বাস্থ্য আমার বয়েসী অন্য দশজনের মতোই। একটু স্থূল দেহ, একটু রক্তচাপ বেশি—এইরকম আর কি।

কিন্তু সকলের সব অসুখ তো এক রকম বা এক জাতের নয়। এক মানসিক হাসপাতালের এক রোগী সারাদিন ঘরের দেয়ালে কান পেতে থাকতেন। কেউ তাঁর কাছে গেলেই তিনি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে হুশ্ করে সবাইকে থামিয়ে চুপ করে থাকতে বলতেন।

অবশেষে একদিন ডাক্তারবাবু তাঁকে চেপে ধরলেন, 'আপনি দেওয়ালে কান পেতে কি শোনেন?' রোগী ভদ্রলোক দেয়াল থেকে কান তুলে নিয়ে ডাক্তার-বাবুকে বললেন, 'এইখানে কান পেতে থাকুন।'

ডাক্তারবাবু কৌতূহলভরে দেয়ালে কান পেতে যথেষ্ট চেষ্টা করলেন কিছু শোনা যায় কিনা বুঝতে, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলেন না। তখন রোগীকে বললেন, 'কই কিছুই তো শুনতে পাচ্ছি না!'

এই কথা শুনে রোগী লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'ঠিক তাই। আমিও আজ আড়াই মাস চেষ্টা করে কিছুই শুনতে পাইনি। হাজার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পাচ্ছি না।'

এই ক্ষেত্রে ডাক্তার সাহেব এর পরে কি করেছিলেন সে অবশ্যই এই গল্পের অংশ নয়, তবে এর চেয়ে জটিলতর পরিস্থিতিতে অন্য এক ডাক্তার যা করেছিলেন সেটা

এরপর অবশ্যই স্মরণ করতে পারি।

একথা সর্বজনবিদিত যে অনেক রোগীই ডাক্তারবাবুদের অযথা অত্যাচার করেন। সময় নেই, অসময় নেই, প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে, অতি সামান্য প্রয়োজনে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করা অনেকেরই খুব প্রিয় হবি।

টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায় বলে এই পরামর্শ গ্রহণ বিনামূল্যে করা যায়। ফোন তুলে ডায়াল করে ডাক্তারবাবুকে ধরলেই হল, কোনো পয়সা খরচা নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দরকার নেই, ডাক্তারের চেম্বারে গলদঘর্ম প্রতীক্ষার প্রয়োজন নেই, 'হ্যালো ডাক্তারবাবু, বলে রোগের ফিরিস্তি শুরু করে দিলেই হল।

বলা বাহুল্য, ডাক্তারবাবুরা এ ধরনের রোগীদের ফোন পেলে মোটেই আনন্দিত বোধ করেন না, বরং রীতিমতো বিরক্ত বোধ করেন।

একদিন রাত সাড়ে বারোটায় জনৈক বাতিকগ্রস্ত রোগী ডাক্তারবাবুকে ফোনে ধরলেন, 'হ্যালো ডাক্তারবাবু, আমি ভজন দত্ত বলছি। সেই যে কাল সকালবেলা আপনার চেম্বারে গিয়েছিলাম গলায় ব্যথা নিয়ে, আপনি যে ওষুধটা দিয়েছিলেন, সেটায় ব্যথাটা বেশ কমে গিয়েছিল, কিন্তু এখন ভীষণ গলা খুশখুশ করছে, কি রকম একটু ব্যথা-ব্যথা, বেদনা-বেদনা…'

সদ্য-কাঁচা ঘুম ভেঙে ওঠা ডাক্তারবাবু রোগী ভজন দত্তকে আর বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ফোনেই বললেন, 'আপনার মুখটা হাঁ করুন তো, একটু ভালো করে হাঁ করুন, গলাটা দেখি তো একবার।'

এরপর ভজন দত্ত মহোদয় টেলিফোনে গলা হাঁ করে দেখিয়েছিলেন নাকি ট্যাক্সি ধরে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ছুটে এসেছিলেন সেটা আমরা অনুমান করতে চাই না।

বরং এই সূত্রে অন্য একটা কাহিনীতে যাই।

এক নবীন ডাক্তার নতুন কাজে যোগ দিয়েছিলেন মফঃস্বলের এক ছোটো হাসপাতালে। সেখানে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তাঁকে করতে হয়। শুধু রোগের চিকিৎসা, অপারেশন বা রোগীদের পরিচর্যা নয়, এমনকি প্রসূতি-সদনের দায়িত্বও তাঁর।

সেই প্রসূতিসদনে যে সব বাচ্চা জন্মায় সব এই নতুন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে। অনেক সময় তাঁর হাতেই জন্মায়। এইরকমভাবে একদিন তাঁর হাতে একটা বাচ্চা জন্মাল যার দু'হাতে কড়ে আঙুল নেই। অর্থাৎ একটা করে আঙুল কম শিশুটির প্রত্যেক হাতে।

শিশুটির মাতামহী অথবা পিতামহী হবেন তিনি, বৃদ্ধা নাতীকে হাসপাতালে দেখতে এসেছিলেন, দু'হাতে দুটো আঙুল কম দেখে তিনি ভ্রূ কুঞ্চন করলেন এবং ঠিক সেই সময়ে বাচ্চা ডাক্তারকে দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ এই নবীন চিকিৎসককে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ করার পরে বৃদ্ধা মন্তব্য করলেন, 'এইটুকু ডাক্তারের হাতে এর চেয়ে ভালো আর কী হবে? ছেলেটার হাতে যে চারটে করে আঙুল হয়েছে, সেই যথেষ্ট।'

রোগীদের বা তাদের আত্মীয়স্বজনের এইসব কটুকাটব্য, তিক্ত মন্তব্য ডাক্তারবাবুরা যে খুব সহজে মেনে নেন তা নয়। বাধ্য হয়ে অনেক সময়েই চুপ

করে থাকেন। তবে কখনো দু-একটা উল্টোপাল্টা কথা মুখ ফসকিয়ে বেরিয়ে যায় না, তাও নয়।

এক উচ্চাভিলাষী তরুণী এক প্রায় বৃদ্ধকে বিয়ে করেছিলেন। সেই বৃদ্ধ ছিলেন সম্পত্তিবান এবং ধনাঢ্য। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, ঠিক ভালোবেসে নয়, মহিলাটি নিতান্ত অর্থলোভে ঐ বৃদ্ধটির সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হয়েছিলেন। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায়, বৃদ্ধটি কবে মারা যাবেন সেজন্যে তাঁর ছিল অধীর প্রতীক্ষা।

অবশেষে একদিন বুঝি সময় এল। বৃদ্ধটি অসুখে পড়লেন। ভদ্রলোকের প্রবীণ গৃহচিকিৎসককে খবর দেওয়া হল।

গৃহচিকিৎসক মহোদয় কখনোই এই তরুণীর বিয়ের ব্যাপারটা পছন্দ করেননি। তিনি ভালোই বুঝেছিলেন যে তাঁর রোগী যত তাড়াতাড়ি মৃত্যুমুখে পতিত হবে, ততই এই নবীনা স্ত্রী খুশি হবে।

চিকিৎসক এসে খুব ভালোভাবে তাঁর রোগীকে পরীক্ষা করলেন। তারপর যথারীতি সাবানজলে হাত ধুয়ে প্রেসক্রিপশন লিখতে বসলেন।

উৎকণ্ঠিতা মহিলাটি চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তারবাবু কেমন বুঝলেন? কোনো আশা আছে?'

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন লেখা বন্ধ করে ঠাণ্ডা চোখে মহিলাটির দিকে তাকালেন, তারপর একটু কেশে নিয়ে উল্টো প্রশ্ন করলেন, 'কার আশার কথা বলছেন? আপনার, না আপনার স্বামীর?'

জুয়া

জুয়াখেলা পৃথিবীতে বহুকাল ধরে চলছে। মানুষের রক্তে বাজি ধরার একটা নেশা আছে। সব দেশে সব কালে জুয়াখেলা ছিল।

মহাভারতে দ্যূতক্রীড়ার কাহিনী আছে। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের একটিই মাত্র দোষ ছিল, তিনি সর্বস্ব এমনকি ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে বাজি রেখে অক্ষক্রীড়ায় মত্ত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের সর্বনাশা যুদ্ধের সেই কারণ।

এই ঘটনার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হল, এমন যে সাংঘাতিক দ্যূতক্রীড়া সেটা শাস্ত্রসম্মত ছিল, রাজদরবারে প্রকাশ্যে খেলা হত।

সাধারণ মানুষ কিন্তু কখনোই জুয়াখেলাকে অত সহজভাবে নেয়নি। জোচ্চোর নামে যে শব্দটি প্রচলিত আছে, সেটি জুয়া থেকে এসেছে, তার মানে হল জুয়াচোর অর্থাৎ যে ঠকায়, প্রবঞ্চক।

জুয়া খেলতে বারণ করেছিলেন মার্ক টোয়েন। তিনি বলেছিলেন, 'জীবনে দু'রকম সময়ে জুয়াখেলা উচিত নয়, যখন তোমার পয়সা আছে এবং যখন তোমার পয়সা নেই।' অর্থাৎ জীবনে কোনো সময়েই জুয়াখেলা উচিত নয়।

তবু মানুষ জুয়া খেলে। জুয়াখেলার নেশা তার রক্তের মধ্যে রয়েছে।

কালীপুজোর রাতে বোম্বাইতে, কাশীতে, কলকাতার ঘড়োবাজারে কোটি-কোটি টাকা হাত-বদল হয় জুয়াখেলায়। সারারাত ধরে চলে সেই উত্তেজনা।

ঘরের কাছে কাঠমাণ্ডুতে দলে-দলে টুরিস্ট যায় শুধু জুয়াখেলার জন্যে। খবরের কাগজে পরিষ্কার বিজ্ঞাপন থাকে—কোন্ হোটেলে উঠলে কত টাকা জুয়োর কুপন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

আমেরিকার লা ভেগাসের প্রধান আকর্ষণই হল জুয়া। প্রতিবছর লক্ষ-লক্ষ লোক যায় সেখানে নানারকম জুয়াখেলার টানে। প্যারিসের মণ্টে কার্লোতেও জুয়াখেলার প্রচণ্ড ভিড়।

জুয়াখেলার নানারকম চেহারা।

তাস-পাশা-সতরঞ্জ থেকে ঘোড়দৌড়। কুকুরদৌড়, উটদৌড় এমন কি বৃষ্টি হবে-কি-হবে-না আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবার্তা বা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে হরদম বাজি ধরে জুয়াড়িয়া। তার চেয়েও মারাত্মক কথা সেই বাজির টানাপোড়েনে, ওঠানামায় প্রকৃত প্রতিফলিত হয় বিশেষ রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির তৎকালীন জনপ্রিয়তা বা জয়ের সম্ভাবনা।

জুয়াখেলার গল্প অনেক। আগে ঘরসংসার দিয়ে শুরু করি।

ছেলে নতুন বিয়ে করেছে। একদিন বিয়ের কয়েক মাস পরে ছেলেকে ডেকে মা বললেন, 'হ্যাঁরে খোকা, তুই এ-সব কি করছিস?'

ছেলে বলল, 'কি করছি মা?'

মা বললেন, 'আমি শুনলাম তুই নতুন বৌমাকে জুয়া খেলতে শিখিয়েছিস। তার সঙ্গে বসে সন্ধ্যেবেলা জুয়া খেলিস।'

ছেলে বলল, 'এ-ছাড়া কোনো উপায় ছিল না মা।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি? কেন?'

ছেলে বলল, 'মা, তোমার নতুন বৌমাটি একটি পাকা চোর। আমার পকেটে যা টাকা থাকে সব তুলে নেয়। তাই জুয়োখেলা ধরিয়েছি। ওকে হারিয়ে ওর কাছ থেকে টাকাগুলো উদ্ধার করতে হয়।'

এ-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ছেলের রীতিমতো আত্মবিশ্বাস আছে যে—সে বৌকে হারাতে পারবে জুয়া খেলে।

কিন্তু জুয়া এত সহজ জিনিস নয়। শুধু আত্মবিশ্বাসে জুয়াখেলা জেতা যায় না। ভাগ্য লাগে, কিছুটা হিসেব লাগে এবং কখনো-কখনো হাত সাফাইয়ের ব্যাপারটাও হয়তো থাকে।

সেই যে একদা এক জুয়াড়িকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি ফ্ল্যাশ (Flash—তাসের বাজি) খেলে সব সময় জেতেন, কিন্তু রেস (Race—ঘোড়ার বাজি) খেলে এত হারেন কি করে?'

তিনি হেসে বলেছিলেন, 'কি আর করব? তাসের মতো রেসের ঘোড়াগুলোকে যে শফিল করা যায় না।'

জুয়ার নেশা বড়ো কঠিন নেশা। এ-নেশায় কত রথী-মহারথী, রাজাবাদশা যে সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

বিলেতে, আমেরিকায় জুয়ার নেশার চিকিৎসা আছে। মনস্তত্ত্ববিদেরা সেই চিকিৎসা করেন—যা খুবই ব্যয়বহুল।

এক প্রচণ্ড জুয়াড়ি এইরকম এক ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। বহু অর্থব্যয় করে বহু মাস পরে তাঁর উন্নতি দেখা দিল। একদিন ডাক্তার নিঃসন্দেহ হলেন যে রোগী দোষমুক্ত হয়েছে। ডাক্তার রোগীকে সে-কথা জানালেন।

রোগী এ-খবর শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন, 'তাহলে তো খুব সুখবর। চলুন একটা পানশালায় যাওয়া যাক, দু'পাত্র পানীয় খেয়ে ব্যাপারটা সেলিব্রেট করি।'

এতদিন ডাক্তারবাবু রোগীর কাছ থেকে বহু টাকা নিয়েছেন। তাঁর একটু সংকোচ হচ্ছিল, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে তা যাব, কিন্তু আজকের খরচটা আমি বহন করব।'

রোগী বললেন, 'তা কেন? সুস্থ হলাম আমি আর খরচ করবেন আপনি?'

এর পরেও ডাক্তারবাবু কি একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিলেন, তখন রোগী বললেন, 'ঠিক আছে। তর্ক করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এক প্যাকেট তাস হবে আপনার কাছে?'

এতদিন তাসের জুয়ার চিকিৎসা করা হয়েছে রোগীর, তাই ডাক্তারবাবু একটু আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'তাস দিয়ে কি হবে?'

রোগী বললেন, 'তর্ক মিটমাট হয়ে যেত।'

স্তম্ভিত হয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিভাবে?'

রোগী বললেন, 'তাসের প্যাকেট থেকে দুজনে দুটো তাস টানতুম। তারপরে যার তাসটা ছোটো হত সেই দামটা দিত।'

সেদিন এই রোগীকে নিয়ে অসুখ সেরে যাওয়া সেলিব্রেট করতে ডাক্তারবাবু গিয়েছিলেন কিনা আমার জোকবুকে সে খবরটা নেই।

ফিচা পিলা

গত দশ বছর সপ্তাহে সপ্তাহে এখানে ওখানে ছাইভস্ম কত কিছু লিখে যাচ্ছি। এখন এমন হয়েছে যে কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছি, না খেয়াল হচ্ছে না এখানে যে ঘটনাটার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা আগেও লিখেছি কিনা। তবে লিখে না থাকলেও আমার মার্কিন অভিজ্ঞতার এই কাহিনীটি আমি ঘনিষ্ঠ মহলে বহুবার বলেছি এবং এ গল্পে তাঁরা যতটা হেসেছেন তার চেয়ে বোধহয় অনেক বেশি হেসেছি আমি।

উনিশশো আটাত্তর সালের পৌষ প্রখর শীতে জর্জর নিউইয়র্ক মহানগরী। বরফ আর বৃষ্টি, বৃষ্টি আর বরফ,—দুজনের মধ্যে ঘোরতর রেষারেষি, বৃষ্টি হলে তুষারপাত বন্ধ, তুষারপাতের সময় বৃষ্টি নেই। রাস্তায় জলকাদা-বরফ, আকাশ দিনরাত্রি ঘনঘোর, প্রায়ান্ধকার। বেতার, দূরদর্শন আর খবরের কাগজ বলছে এমন শীতকাল নিউইয়র্কে বহুকাল আসেনি, এমন জমাট দুর্যোগ সচরাচর দেখা যায় না।

আমি নিউইয়র্কে এসেছিলাম রেলগাড়িতে ওয়াশিংটন থেকে। নিউইয়র্কে আমার থাকার জায়গা হয়েছিল 'ডোরালস ইন' নামে এক প্রাচীন ও বনেদী হোটেলে। এই হোটেলটি শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে। উনপঞ্চাশ নম্বর রাস্তা ও লেক্সিংটন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে। ফিফথ অ্যাভিনিউ বা ইউনাইটেড নেশনস বিল্ডিং এখান থেকে পায়ে হাঁটা পথ।

ডোরালস ইনে পেঁছে জিনিসপত্র রেখে একটু বিশ্রাম করে আমার ঘরের পিছন দিকে কাঁচের জানলার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে এবং তুমুল ঠাণ্ডা, যাকে বলে রক্ত হিম করা হাড় কাঁপানো শীত। ঘরের মধ্যে অবশ্য যান্ত্রিক উষ্ণতা। কাঁচের জানলার এ প্রান্ত থেকে বাইরের শীত অনুমান করা যাচ্ছে, অনুভব করা যাচ্ছে না।

সে যা হোক, জানলার সামনে আলগোছে এবং অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় চোখ আটকিয়ে গেল, একটি গগনচুম্বী প্রাসাদ চূড়ায়। আমার হোটেলটি যে অঞ্চলে তার আশপাশে চর্তুদিকে ভুবনবিখ্যাত বহুতল হর্ম্যমালা। যে দিকে যতদূর চোখ যায় সুদৃশ্য বড় বড় বাড়ি। সেইসব বাড়ির ভিড়ে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের বহু পরিচিত চূড়াটি দেখতে পেলাম।

আমাদের বাল্যে ও কৈশোরে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ছিল পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাড়ি। সমস্ত শিশুপাঠ্য সাধারণ জ্ঞানের বইয়ে আর স্কুলের ভূগোলে উত্তর আমেরিকা অধ্যায়ে ছাপা হত এই বাড়ির ছবি। এটা বাড়ির ছবি আমাদের বহু চেনা।

অনেকদিন হলো এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের সেই গরিমা লুপ্ত হয়েছে। এখন এর চেয়ে উঁচু বাড়ি অন্য শহরে তো বটেই এমনকি নিউইয়র্ক শহরেই বেশ কয়েকটি রয়েছে।

কিন্তু কথা তা নয়, নতুন যুগের প্যানঅ্যাম প্রাসাদ বা ওয়ার্লড ট্রেড সেণ্টার মাপে জোকে যত গুরুত্বপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ হোক না এম্পায়ার স্টেটের যে জগৎজোড়া পরিচয় ছিল সেই পরিচয় তারা অর্জন করতে পারেনি।

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের চূড়া দেখে আমার মনটা আনচান করে উঠল। সে কি, এই আশ্চর্য বাড়ির এত কাছে আমি রয়েছি! ঠিক করলাম, হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে একটু হেঁটে গিয়ে বাড়িটা সামনে থেকে দেখে আসব।

তখন বিকেলবেলা। সেদিন সারা বিকেল আর সন্ধ্যা তুমুল বৃষ্টি হল, হোটেল থেকে বেরোতে পারলাম না। ভিনদেশে বরফ জমা ঠাণ্ডায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভয় করল।

তবে পরদিন সকালে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি যদিও মেঘ আর কুয়াশা যথেষ্টই রয়েছে কিন্তু বৃষ্টি নেই। তাছাড়া ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গিয়ে চারপাশে একটু পরিষ্কার হয়ে এসেছে। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংও অনেক স্বচ্ছ দেখাচ্ছে।

ব্রেকফাস্ট না করেই হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ আর সময় লাগবে, বড়জোর আধঘণ্টা। ফুটপাত ধরে বাড়িটার চূড়া লক্ষ্য করে বাড়িটার কাছে পেঁছব, তারপর সামনে এসে একটু ভালো করে দেখে ফিরে আসব। যতদূর মনে

হচ্ছে এক কিলোমিটারের চেয়ে বেশি দূরে হবে না বাড়িটা।

তাড়াতাড়ি ওভারকোট পরে, মাথায় কান ঢাকা টুপি চড়িয়ে লিফটে করে নেমে হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় নেমে এম্পায়ার স্টেটের চূড়াটা দেখে সেটা অনুসরণ করে যাব, এই রকম ঠিক করেছিলাম।

কিন্তু রাস্তায় নেমে এম্পায়ার স্টেটের চূড়াটা আর নজরে এল না। অন্য সব উঁচু উঁচু বাড়ির বিশেষ করে প্যান অ্যামের বিশাল বহুতল বাড়ির আড়ালে এম্পায়ার স্টেট অবলুপ্ত হয়েছে।

আমি মাথা উঁচু করে বড় বড় বাড়ির ছাদের ফাঁক দিয়ে খুঁজতে লাগলাম এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংটা, কিন্তু কোথাও তার আভাস পাচ্ছি না।

এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল, আকস্মিক এক প্রবল ধাক্কায় আমি ফুটপাতের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। এমনিই জমাট বরফে ফুটপাত জায়গায় জায়গায় রীতিমতো পিছল, তার উপরে ধাক্কা যে দিয়েছে সে এক বিশালবপু দীর্ঘদেহ কৃষ্ণাঙ্গ যুবক, তার হাতে একতাড়া চিঠি সম্ভবত ডাকবিভাগ বা কোনও কুরিয়ার সার্ভিসে কাজ করে।

তার কোনও দোষ নেই, সে দ্রুত দৌড়ে চিঠি বিলি করছে আর আমি আকাশের দিকে মুখ তুলে প্রাসাদচূড়া খুঁজছি। আমরা কেউই কাউকে লক্ষ্য করিনি। তাই এই অযাচিত সংঘর্ষ। লজ্জিত যুবকটি ভূপতিত আমাকে শক্ত হাতে তুলে দাঁড় করাল, তারপর অস্পষ্ট ও দ্রুত মার্কিনী উচ্চারণে দুঃখ প্রকাশ করে আবার ছুটল চিঠি বিলি করতে।

আমি ধীরে ধীরে মোড়ের দিকে এগোলাম। এ দিকটা একটু ফাঁকামতন, ওখান থেকে হয়ত এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংটা নিশানা করা যাবে, আবার ঘাড় কাত করে উর্ধ্বমুখী হয়ে আকাশ তল্লাশি করতে লাগলাম এবং আরেকবার সেই চিঠি বিলি করা দ্রুতগামী যুবকের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ হল এবং এবার একেবারে চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম।

আবারও যুবকটি আমাকে হাত ধরে তুলল এবং আমার পিঠে হাত রেখে 'ফিচা পিলা, ফিচা পিলা, ফিচা পিলা' এই রকম অসম্ভব দুটি শব্দ তিন তিন বার বলে সে তার কাজে ছুটল। এই শব্দগুলোর মানে তখন কিছু বুঝতে পারিনি। পরে আমার এক মার্কিনী বান্ধবীকে এই ঘটনা বলায় সে সব শুনে হেসে বলেছিল যে ঐ নিগ্রো যুবকটি আমাকে যা বলেছিল তা 'ফিচা পিলা' শোনালেও সে আসলে বলেছিল, 'ফেচ, এ পিলো (Fetch a pillow) যার সাদা বাংলায় মানে হল, 'একটা বালিশ নিয়ে এস'।

এবার ব্যাপারটা আমার হৃদয়ঙ্গম হল। ঐ নিউইয়র্কীয় নিগ্রো যুবকটি আমাকে নেহাৎ কাঠ বাঙাল বা দেঁহাতি ভেবে নিয়েছে যে অবাক হয়ে মাথা উঁচু করে বড় বড় বাড়ি দেখছে। তা এত বাড়ি, গগনচুম্বী প্রাসাদমালা ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে একটা বালিশ এনে ফুটপাতে শুয়ে পড়াই উচিত। তখন চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে যত ইচ্ছা বড় বড় প্রাসাদচূড়া দেখে যাও, কষ্টও হবে না, ধাক্কা খাওয়ার ভয়ও থাকবে না। তাই তার উপদেশ 'ফিচা পিলা, ফিচা পিলা।'

আবার শৈশবে

দুই ভাই। বড়োজনের বয়েস পাঁচ, তার ডাকনাম বাবু। ছোটো ভাইয়ের বয়েস দুই। বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে নাম মিলিয়ে তার নাম রাখা হয়েছে হাবু।

বাবু কয়েকটা কাঁচের মার্বেল নিয়ে খেলছে। হাবু মার্বেলগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে কান্নাকাটি করছে।

ওদের মা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন, হাবুর কান্না শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বাবুকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছিঃ বাবু, তুমি না দাদা, ভাই যদি খেলতে চায়, অতগুলো মার্বেল আছে, তার থেকে ওকে কয়েকটা খেলতে দাও।'

বাবু বলল, 'কিন্তু মা, মার্বেলগুলো নিয়ে ও খেলছে না। নিজের কাছে রেখে দিচ্ছে।'

মা বললেন, 'কই, হাবুর হাতে তো কোনো মার্বেল দেখছি না।'

বাবু বলল, 'তা দেখবে কি করে? দুটো মার্বেল নিয়েছিল, দুটো মার্বেলই ও গিলে ফেলেছে। এখন আরো চাইছে।'

হাবুকে নিয়ে এবার অবশ্যই ডাক্তারখানায় যেতে হবে। তবে অন্যরকমের একটা মজার গল্প আছে হাবুর দাদা বাবুকে নিয়ে।

বাবু তখন একটু বড় হয়েছে। ইস্কুলে পড়ছে, ইস্কুলের নীচু ক্লাসের পরীক্ষার একটা বিষয়ে সবচেয়ে কম নম্বর পেয়েছে।

রেজাল্ট নিয়ে বাসায় আসতে মা ধরলেন, 'এ কী, তুমি সারা ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে কম নম্বর পেলে কী করে?'

অম্লান বদনে বাবু উত্তর দিল, 'আমি যে ঐ পরীক্ষাটির দিন একেবারে লাস্ট বেঞ্চের লাস্টে বসেছিলাম।'

মা অবাক হয়ে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে?'

'আর কি হবে,' বাবু বলল, 'সবাইকে নম্বর দিতে দিতে আমার কাছ পর্যন্ত এসে আর কোনো দেওয়ার মতো নম্বরই ছিল না।'

শিশুদের কাছ থেকে এত সরল জবাব সচরাচর পাওয়া যায় না। তারা অনায়াসেই যে কোনো ব্যাপারকে জটিল করে তোলে।

একটি ছোট মেয়ে একবার আমাকে বলেছিল, 'কাল রাতে আমি একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি।'

শুনে আমি বললাম, 'কী মজার স্বপ্ন?'

সে বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি জেগে আছি। কিন্তু জেগে উঠে দেখি, আসলে আমি ঘুমোচ্ছিলাম।'

তাড়াতাড়ি স্বপ্নের মধ্যে চলে এসেছি। বাবু আর তার ভাই হাবুর আরো দুয়েকটা গল্প বাকি আছে। এখানে না বলে নিলে আর হয়তো মনে নাও পড়তে পারে।

তখন বাবু-হাবু বেশ বড়ো হয়েছে। একদিন তাদের বাবা অফিস থেকে এসে দেখলেন, বাড়ির সামনের জানলার কাঁচ একটা ভাঙা।

তিনি প্রথমে বাবুকে ধরলেন, 'বাবু জানলার কাঁচ কে ভেঙেছে?'

বাবু সাফ জবাব দিল, 'হাবু ভেঙেছে।'

বলা বাহুল্য সঙ্গে-সঙ্গে হাবু প্রতিবাদ করল, 'না আমি ভাঙিনি, দাদা ঢিল ছুঁড়ে ভেঙেছে।'

হাবুর এই কথার সত্যতা যাচাই করার জন্যে পিতৃদেব বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসল ব্যাপারটা কী?'

আসল ব্যাপার বাবু যা জানাল, তা সত্যিই মর্মান্তিক।

বাবু হাবুকেই ঢিল ছুঁড়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে হাবু তার মাথা সরিয়ে নেওয়ায় ঢিল গিয়ে জানলার কাঁচে লাগে এবং ফলে জানলার কাঁচ ভেঙে যায়। যদি হাবু তার মাথা সরিয়ে না নিত, ঢিল জানলার কাঁচে না লেগে অবশ্যই হাবুর মাথায় লাগত এবং জানলার কাঁচ ভাঙত না।

বাবুদের অন্য একটা ঘটনা বলি, একেবারে যাকে বলে জীবন-থেকে-নেওয়া।

হঠাৎ শোনা গেল, বাড়ির মধ্যের বারান্দায় হাবু খুব কাঁদছে। মা একটু কাজে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ঢুকে হঠাৎ ছেলের কান্না শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হাবুর কী হল? হাবু কাঁদছ কেন?'

হাবু নিজেই জবাব দিল—খুব সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার সেই জবাব। সে কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'দাদা আমাকে মেরেছে।'

মা বললেন, 'সে কী? দাদা কোথায়?'

হাবু বলল, 'দাদা পাড়ার মোড়ে খেলতে গেছে।'

মা বললেন, 'তাহলে সে তোমাকে কখন মারল?'

হাবু বলল, 'সে প্রায় আধঘণ্টা আগে।'

মা বললেন, তাহলে তুমি এখনো কাঁদছ কেন?'

কাঁদতে কাঁদতেই হাবু বলল, 'তখন কেঁদে লাভ কী হত? তখন যে তুমি বাড়ি ছিলে না।'

অন্য এক শিশুর গল্প বলি।

শিশুটি ভাত খাচ্ছিল, সামনেই তার ঠাকুমা দাঁড়িয়ে। সে উচ্ছেভাজা তার থালার একপাশে সরিয়ে রেখেছে। কোনোদিন কোনোরকম তেতো সে খায় না, আজও খাবে না।

তার ঠাকুমা কিন্তু আজ তাকে সহজে ছাড়বেন না। তিনি নাতিকে জোর করতে লাগলেন ঐ উচ্ছেভাজা ফেলে না দিয়ে খাওয়ার জন্যে এবং তাকে জানালেন, 'জানো তোমার বয়সে আমি সোনামুখ করে তেতো খেতুম। উচ্ছেভাজা খেতে খুবই ভালোবাসতুম।'

নাতি ভাতের থালা থেকে মুখ না তুলে প্রশ্ন করল, 'ঠাকুমা, তুমি কি এখনো উচ্ছেভাজা খেতে ভালোবাসো?'

ঠাকুমা বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

সঙ্গে সঙ্গে পৌত্র বলল, 'তাহলে তুমিই আমার উচ্ছেভাজাটা খেয়ে নিয়ো।'

পুনশ্চ ঃ

পৌত্র-পিতামহীর আরেকটা কাহিনী দিয়ে শেষ করি। আসলে এটি একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন।

ঠাকুমা ঃ খোকা, তোমাকে আর কতবার বলতে হবে যে আচারের বয়ামের সামনে বসে থেকো না।

খোকা ঃ না ঠাকুমা, আর একবারও নয়।

ঠাকুমা ঃ মানে ?

খোকা ঃ বয়ামে আর একফোঁটা আচারও নেই।

এসো বসি আহারে

আমি সুদূর মফস্বলের লোক। প্রথম-প্রথম খটকা লাগত, রেস্টুরেন্ট না রেস্তোরাঁ ? কাফে না কেফ্, তা নিয়েও চিন্তা করেছি।

যতদূর মনে পড়ে, কফি হাউসের বাইরে দরজার মুখে কাঠের বোর্ডে লেখা থাকত, রাইট অব অ্যাডমিশন রিজার্ভড (Right of admission reserved)। এই নোটিস দেখে চিন্তিত হয়ে কফি হাউসে প্রথম-প্রথম প্রবেশ করতে ইতস্তত করেছি ; চল্লিশ বছর আগের সেই কথা এখনো অস্পষ্ট মনে আছে।

আমাদের জন্মশহরে চায়ের দোকান যে দু-চারটে ছিল না তা নয়, সেখানেও লোকেরা সকাল সন্ধ্যেয় আড্ডা দিত, তৃষ্ণা নিবারণ করত। কিন্তু ঐ রেস্টুরেন্ট বা রেস্তোরাঁ কথাটি তখনো চালু হয়নি ; লোকে বলত চায়ের দোকান, একটু মার্জিতরা বলতেন চায়ের স্টল, টি স্টল। তবে ঐ পর্যন্তই, কফির দোকান বা কফিখানা যাকে বড়ো শহরে বলে, কফি হাউস সে-সব কিছু ছিল না। প্রত্যন্ত বঙ্গের গহনে তখনো তিক্ত কথায় কফির স্বাদ অনুপ্রবেশ করেনি।

ভুল হয়ে যাচ্ছে।

লিখতে বসেছিলাম 'এসো বসি আহারে'। কিন্তু আহার কোথায়, এ তো পানীয়ের কথা হয়ে যাচ্ছে। তাও তেমন তেমন পানীয়—সিদ্ধি বা হুইস্কি, হাঁড়িয়া কিংবা রাম, নিদেনপক্ষে বিয়ার বা ভাঙের শরবৎ হলে কথা ছিল। ছিঃ ছিঃ তারাপদ, ছিঃ ছিঃ, এতদিনে তুমি চা-কফি দিয়ে লোকের মন মজাতে বসেছো ? তোমার ডগমগে পাঠিকা ঠাকুরানী এত সহজে সন্তুষ্ট হবেন না।

সুতরাং মোটা গদ্যে যাই।

প্রথমে খাওয়া নয়, খাওয়ার পরের কথা বলি। বহু হোটেলেরই সমস্যা হল লোকেরা খাওয়ার পর কাঁটা চামচ পকেটে ভরে নিয়ে যায়।

হায়দরাবাদে এক খানদানি ভোজনালয় তথা সরাবখানায় দেখেছিলাম, ইংরেজি আর উর্দুতে দুটি নোটিস হোটেলের ভেতরের সামনের দেওয়ালে ঝলমল করছে।

বাংলা করলে নোটিসটার সাদা ভাষায় মানে দাঁড়ায় ঃ

'মাননীয় অভ্যাগতবৃন্দ,

আমাদের কাঁটা-চামচগুলো হজমের ওষুধ নয়। ভোজনের পরে ওগুলো গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই।'

অন্য একটা ভোজনালয়ের গল্প বলি। এটা অবশ্য আমার চোখে-দেখা নয়, বিলিতি বইতে পড়া।

সদা হৈচৈ, সদা-জাগরিত এক জনপ্রিয় মার্কিনী ভোজনালয়ে এক ব্যক্তি ঢুকেছে। যে-কোনো বড়ো হোটেলে নানা ধরনের উল্টোপাল্টা লোক ঢোকে। হোটেলের ম্যানেজার সাহেবের কাজই হল সেদিকে নজর রাখা এবং সম্ভবমতো তার যথাসাধ্য সমাধান করা।

আমাদের আলোচ্য গল্পের এই ভদ্রমহোদয় যিনি এই ভোজনালয়ে প্রবেশ করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে তিনি বেশ শান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির। কিন্তু তিনি টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দেওয়ার পর যখন খাবার আনার আগে বেয়ারা প্লেট ছুরি-কাঁটা, ন্যাপকিন এনে দিল, ভদ্রলোক হাত মোছার সেই ন্যাপকিনটা নিয়ে গলায় বাঁধলেন—বাচ্চাদের গলায় যেমন মায়েরা বেঁধে দেয় খাওয়ার আগে, যাতে জামাকাপড়ে তেল-মসলার খাবারের দাগ না লাগে।

কিন্তু নাকউঁচু ভোজনালয়ের খুঁতখুঁতে ম্যানেজার সাহেবের এ-ব্যাপারটা পছন্দ নয়, একটা বড়ো হোটেলের পক্ষে এ ভারি হাস্যকর দৃশ্য।

কী করবেন ভেবে না পেয়ে, অনেকটা চিন্তা করে তিনি তাঁর ভোজনালয়ের সবচেয়ে চতুর বেয়ারাকে ডেকে তাঁর সমস্যার কথা বললেন।

বেয়ারাটি বলল, 'স্যার, এ কোনো ব্যাপার নয়। আমি এক সেকেণ্ডে সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

তারপর সে গুটিগুটি সেই সদাশয় গ্রাহকের কাছে গিয়ে সেলুনের নাপিতের মতো খুব নিচুগ্রামে মিহি গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, চুল কাটবেন না দাড়ি কামাবেন?'

স্যার মহাশয় চুল কাটতেও আসেননি, দাড়ি কামাতেও আসেননি। তিনি এসেছেন খেতে, চটপট গলা থেকে ন্যাপকিনটা খুলে নিয়ে বললেন, 'চুল-দাড়ি নয়, এক প্লেট স্টেক আর এক বাটি সুপ।'

এবার কলকাতার এক বিখ্যাত চীনে দোকানের কথা বলি। সেও অনেককাল আগের কথা।

তখনো আমরা চীনে খাবারের সঙ্গে তেমন পরিচিত হইনি। সব খাবারের নামটাও সড়গড় হয়নি। বেয়ারা যখন খেতে বসার পর আমাদের হাতে ড্রাগন-আঁকা একটা মেনু ধরিয়ে দিল, একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম। অধিকাংশ খাবারের নামের মানে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এরই মধ্যে ফ্রায়েড-রাইস কিছুটা বুঝতে পারলাম, আর সবশেষে দেখলাম লেখা আছে চো এন চিক। চীনে হোটেলে যখন এসেছি একটু চো বা চাও খেতে হবে। মনে হলো চিক যখন দেখছি, এটা সম্ভবত চিকেনের চো—তাই অর্ডার দিলাম। অর্ডার পেয়ে বেয়ারা বেচারি বিস্মিত হয়ে গেল। সে বলল, 'স্যার, এটা খাবার জিনিস নয়, এটা আমাদের ম্যানেজারের নাম।'

পুনশ্চ ঃ

একটি হোটেল নাটিকার অংশ ঃ

বেয়ারা ঃ আমাদের বিরিয়ানি কেমন লাগল স্যার আপনার ? আসল জাফরান দিয়ে তৈরি।

গ্রাহক ঃ চমৎকার।

বেয়ারা ঃ আর আমাদের মাংসের কাবাব ? এমন মোগলাই কাবাব এ-শহরে আর কোনো দোকানে পাবেন না। ঠিক যতটুকু সেদ্ধ, যতটুকু ভাজা হওয়া উচিত, একেবারে ততটুকু। তাছাড়া সব খাঁটি মসলা। আপনার ভালো লাগেনি স্যার ?

গ্রাহক ঃ চমৎকার, খুব ভালো লেগেছে, খুবই ভালো কাবাব তোমাদের।

বেয়ারা ঃ আপনি তো আবার ফিশ তন্দুরি নিয়েছিলেন। এ-রকম তাজা মাছ দিয়ে ফিস তন্দুরি কোথাও বানায় না। যে খায় সেই প্রশংসা করে। আপনার কেমন লাগল স্যার ?

গ্রাহক ঃ চমৎকার। সচরাচর এমন পাওয়া যায় না। খুব ভালো মাছ খেলাম।

বেয়ারা ঃ (একটু ইতস্তত করে, একবার খুব ক্ষীণ একটা গলাখাঁকারি দিয়ে) তাহলে স্যার আপনি এত মনখারাপ করে মুখ কালো করে বসে আছেন কেন ? আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছে।

গ্রাহক ঃ অস্বস্তি আমারও হচ্ছে। সে তোমাদের খাবার খেয়ে নয়। সে তোমাদের খাবারের বিল পেয়ে। অত টাকা তো আমার কাছে নেই।

শুভ নববর্ষ

আমি মফস্বল পূর্ববঙ্গের যে অজ অঞ্চল থেকে এসেছি সেখানে পয়লা বৈশাখের চেয়ে চৈত্র সংক্রান্তি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

চৈত্র সংক্রান্তি মানে চড়ক সংক্রান্তি, নীল পুজো ও গাজনের মেলা বর্ষ শেষের সেই উৎসব ছিল পালাগানে, মেলায় যাত্রায় জমজমাট।

পয়লা বৈশাখের মেলা কোথাও কোথাও ছিল না তা বোধহয় নয় কিন্তু আমাদের ছোট শহরের বৈশাখী মেলাটা হত বাংলা বছরের প্রথম রবিবারে। এক অপরিচিতা গ্রাম্য রমণীর নামে সেই মেলা 'মদনের মার মেলা' আমার বাল্যস্মৃতিতে বিধৃত হয়ে আছে।

এই এতকাল পরে আজ আর কারো কাছে সদুত্তর পাওয়া যাবে না 'মদনের মা' কে ছিল এবং কেনই বা তার নামে মেলা।

আবার এমনও তো হতে পারে মদন মানে মদনগোপাল নামের কোনও বিগ্রহ, সেই বিগ্রহের জননী, জগজ্জননীর মেলা ছিল সেটা।

কার কাছে যেন সেদিন শুনলাম মেলাটা নাকি এখনও হয়। মেলা আর হাট সহজে উঠে যায় না। কত জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, গ্রামগঞ্জ অদৃশ্য হয়ে যায়, কিন্তু পোড়ো মাঠে ভাঙা মসজিদের উঠোনে বুড়ো অশথ গাছের ছায়ায় বছরের নির্দিষ্ট দিনে মেলা যথাসময়ে বসে আসে। শেষ রাতে বড় কালো কড়াই নিয়ে

জিলিপিওলা মাঠের একপাশে বড় গর্ত করে উনুন খোঁড়ে, গরুর গাড়িতে খড় বিছিয়ে মাটির হাঁড়ি মালসা নিয়ে কুমোরের সওদা এসে যায় পথের ধারে, কোথা থেকে তালপাতার ভেঁপু আর বাঁশের বাঁশির লোকটাও তার বাপ ঠাকুরদার মতো বাঁশি বাজাতে বাজাতে মেলায় ফিরে আসে। মেলা জমে যায়।

পয়লা বৈশাখ শাস্ত্রীয় কোন ব্যাপার নয়, নেহাতই সামাজিক অনুষ্ঠান। এই সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্যবসায়িক ব্যাপার শুভ হালখাতা।

অক্ষয় তৃতীয়া বাদ দিলে পয়লা বৈশাখেই অধিকাংশ বাঙালি দোকানে এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নতুন খাতা খোলা হয়।

রথযাত্রাতে যেমন চিৎপুরে যাত্রা কোম্পানির বছর শুরু হয়, বাংলার প্রকাশন ব্যবসায় কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ায় হালখাতা পয়লা বৈশাখ, শুভ নববর্ষ উপলক্ষে বইয়ের দোকান ও প্রকাশক প্রতিষ্ঠানগুলি লেখক পাঠক শুভানুধ্যায়ীর ভিড়ে জমজমাট।

লেখাপড়ার শুভ হালখাতাও এখন শেষ পর্যন্ত পয়লা বৈশাখে এসে গেছে। আমাদের ছোট বয়সে শিক্ষাবর্ষ শুরু হত ইংরেজি নতুন বছরে। এখন বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে মাধ্যমিক পার হয়ে ইস্কুলের শিক্ষাবর্ষ শুরু হচ্ছে বাংলা বছরে।

আমাদের সেই সাবেককালের ওয়ান-টু-থ্রি ইত্যাদি ছাড়াও এখন তার নিচে রয়েছে আরও কয়েক ধাপ নার্সারি ওয়ান-টু-থ্রি বা অন্য নামে কেজি ওয়ান-টু-থ্রি। সে এক বিশাল শিশুমেধ যজ্ঞ। মহাভারতীয় ভাষায় বলা চলে শিশুপাল বধ।

আড়াই বছর তিন বছর বয়েসে তথাকথিত কেজি বা নার্সারিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে শিশুরা।

বাংলা নববর্ষে শিশুপাল বধের একটি ক্ষুদ্র কাহিনী বলি।

কাহিনীটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু বোধহয় সত্যি। নার্সারি ওয়ানের একটি ছেলেকে নার্সারি টুতে প্রমোশন দেয়া হয়নি। শিশুটির উত্তেজিত পিতা শিশু শিক্ষালয়ে এসেছেন তাঁর ছেলে কেন প্রমোশন পায়নি সেটা জানতে।

জানা গেল ছেলেটি অঙ্কে ফেল করেছে। শিক্ষয়িত্রী বললেন, 'দেখুন আপনার ছেলে অঙ্কে একেবারে কাঁচা। এই দেখুন আপনার সামনেই পরীক্ষা করছি।'

তারপর ফেলগ্রস্ত শিশুটিকে কাছে ডেকে নিয়ে দিদিমণি বললেন, 'আচ্ছা বলো তো কার্তবীর্যার্জুন, (ছেলেটির ওইটাই নাম, বাবা মায়ের সন্তানের নামকরণে অভিনবত্বের পরিণাম), ভেবে চিন্তে বল। তোমার যদি দুটো কলা থাকে আর আমি যদি দুটো কলা তোমাকে দিই তাহলে সবসুদ্ধ তোমার কতগুলো কলা হবে।'

অম্লান বদনে কার্তবীর্যার্জুন উত্তর দিল, 'তিনটে কলা হবে।'

দিদিমণি ছাত্রের বাবাকে বললেন, 'দেখলেন তো?'

শিশুটির বাবা এতে আরও উত্তেজিত হয়ে গেলেন, তারপর পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে তার মধ্য থেকে একটা টাকা নিয়ে দিদিমণির হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'সামান্য একটা কলার জন্যে আমার ছেলে ফেল! এই নিন একটা কলার দাম এক টাকা, এইবার ছেলেকে পাস করিয়ে দিন।'

অবান্তর কদলী কাহিনী দিয়ে শুভ নববর্ষের রম্য নিবন্ধ ভারাক্রান্ত করা অনুচিত হল।

গতবছরের একটা ঘটনা বলি।

গতবছর পয়লা বৈশাখে বাল্যস্মৃতি স্মরণে রেখে আমার এক সুগায়িকা বান্ধবীর দুই শিশু দৌহিত্রকে দুটি সাধারণ বাঁশের বাঁশি কিনে দিয়েছিলাম।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, মেলা-টেলা না হলে এমনিতে রাস্তাঘাটে দোকানে বাজারে বাঁশের বাঁশি কোথাও পাওয়া যাবে না।

কালীঘাট বাজারের সামনে বহুকালের একটা পুরনো দোকানে পাওয়া যায়, ও পাড়ার পুরনো দিনের বাসিন্দা বলে এটা আমি জানতাম এবং নতুন বছরে কালী-মন্দির হয়ে আসার পথে সেখান থেকেই আমি বাঁশি দুটি সংগ্রহ করেছিলাম।

সেদিন ওই গায়িকা বান্ধবীর বাড়িতে আমার মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল, প্রতি বছর পয়লা বৈশাখেই থাকে। আমি জানতাম ওই দৌহিত্রদ্বয়, যাদের বয়েস যথাক্রমে সাত এবং পাঁচ তাদের মা-বাবার সঙ্গে ওই দিন মামার বাড়িতে আসবে। তাই তাদের জন্যে বাঁশি দুটো নিয়ে গেলাম।

বাঁশি দুটো পেয়ে নাবালকদ্বয় মহা আনন্দিত। দু'জনেই প্যাঁ পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে নিজেরা ক্লান্ত হল এবং আমাদের ক্লান্ত করে তুলল।

বড় নাতিটির নাম সূর্য এবং ছোটটির নাম চন্দ্র। অনেক সাধ্যসাধনার পরে দুজনে বারান্দায় গিয়ে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বাঁশি বাজাতে লাগল।

আমার বান্ধবীটি বললেন, 'দু ভাই সর্বদাই ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে। আজ বাঁশি পেয়ে ঝগড়াটা করছে না।'

কিন্তু বান্ধবীর কথা শেষ হতে না হতে, দু ভাই বারান্দা থেকে দরজা খুলে ঘরের মধ্যে ছুটে এলো।

বড় ভাই সূর্য চেঁচাতে চেঁচাতে, তার হাতে ফাটা বাঁশি। ছোট ভাই চন্দ্র ফোঁপাতে ফোঁপাতে কাঁদতে কাঁদতে।

'কী হল? কী ব্যাপার?' জিজ্ঞাসা করায় সূর্য বলল, 'চন্দ্র আমার বাঁশি ফাটিয়ে দিয়েছে।'

তাদের দিদিমা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওইটুকু ছেলে চন্দ্র কী ভাবে ফাটালো তোমার বাঁশি?'

নির্বিকারভাবে সূর্য বলল, 'চন্দ্র ঠিকমত ভাবে বাজাতে পারছিল না। তাই ওর মাথায় আমার বাঁশিটা দিয়ে মেরেছিলাম। মারামাত্র আমার বাঁশিটা ফেটে গেল।'

সূর্য চন্দ্রের এই গল্পের পরে অবশেষে একটা ছোটবেলার, মানে আমার নিজের ছোটবেলার গল্প দিয়ে শেষ।

ফকির জাতীয় একজন লোক থাকত আমাদের শহরের প্রান্তে। সম্ভবত তার নাম ছিল মানিকলাল কিংবা মানিকচাঁদ।

বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে ভোরবেলায় গৃহস্থের বাড়িতে উঠোনে এসে মানিকচাঁদ একটা ভাঙা হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে গান শুনিয়ে যেত। তার

বিনিময়ে কিছু দক্ষিণা পেত সে।

দুঃখের কথা, তার ছিল ভয়ঙ্কর বেসুরো আর হেঁড়ে গলা, গান গাওয়ার উপযুক্ত একেবারেই নয়। মফস্বল শহরের উষাকালে নিস্তব্ধ পরিবেশ চমকে চমকে উঠত তার গানের গমকে। ঘুম থেকে শিশুরা কেঁদে জেগে উঠত। অসুস্থ ব্যক্তির বুক ধড়ফড় করত।

স্পষ্ট মনে আছে, একবার এক পয়লা বৈশাখের সকালে গান গাওয়ার পরে আমার সুরসিকা পিতামহী মানিকচাঁদকে একটা আনি আর একটা সিকি দিয়ে বলেছিলেন, 'মানিক এই আনিটা দিলাম গান গাওয়ার জন্য। আর এই সিকিটা গান থামানোর জন্য।'

চিকিৎসা

সেই ভদ্রমহিলার কথা মনে আছে?

যিনি তাঁর অসুস্থ পোষা কুকুরের জন্যে ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন ডাক্তারের দোকানে। কমপাউন্ডার ভদ্রলোক সব শুনে এক বোতল ওষুধ দিলেন মহিলাকে।

ওষুধের বোতলটি হাতে নিয়ে অনেক নেড়ে চেড়ে গায়ের লেবেলের বিবরণী আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার পর ভদ্রমহিলা কমপাউন্ডারবাবুকে বললেন, 'কই এর মধ্যে এই লেবেলের গায়ে তো লেখা নেই যে এটা কুকুরের জন্য অথবা পশুর জন্য।'

এ কথা শুনে কম্পাউন্ডারবাবু জবাব দিলেন, সত্যিমিথ্যা যাই হোক এ রকম জবাব ওঁরা দিয়ে থাকেন, তিনি বললেন, 'আসলে এই ওষুধটা হলো জন্তু আর মানুষ দুইয়েরই জন্যে, উভয়েরই কাজ লাগে।'

কমপাউন্ডারবাবুর কথায় উল্লসিত হয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, 'জন্তু আর মানুষ দুইয়েরই ওষুধ। তাহলে আরেক বোতল দিন। আমার স্বামীর জন্যেও একটা নিয়ে যাই।'

এ হলো স্বামীর চিকিৎসার গল্প।

এবার তাহলে স্ত্রীর চিকিৎসার গল্পও বলতে হয়।

এ গল্পটা একটু নিষ্ঠুর।

এক ভদ্রলোক এক ডাক্তারের খুবই প্রশংসা করছিলেন। সবাই প্রশ্ন করলো, 'ব্যাপারটা কি?'

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীর সব অসুখ একদিনে সারিয়ে দিয়েছেন। আমার স্ত্রী রাতদিন ঘ্যানঘ্যান করতেন মাথাব্যথা, কোমর ঝিঁ ঝিঁ করছে, চোঁয়া ঢেকুর উঠছে। ডাক্তারবাবুর এক কথায় সব সেরে গেলো।'

সবাই অবাক। সর্বরোগহর এমন কি কথা বললেন ডাক্তারবাবু?

তখন ভদ্রলোক জানালেন, 'ডাক্তারবাবু আমার স্ত্রীকে বলেছেন এগুলো সব বয়েস বাড়ার লক্ষণ। কোন্ মহিলা আর নিজের বয়েস বাড়ার কথা মানতে চান। আমার স্ত্রী এরপর থেকে একদম চুপ করে আছেন।'

এর কাছাকাছি আর একটি গল্প আছে অন্য মহিলাকে নিয়ে যিনি ডাক্তারবাবুর কাছে স্বামীর জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছেন। বৃদ্ধ স্বামী, তরুণী ভার্যা। অন্যান্য ওষুধপত্রের পর কয়েকটা স্লিপিং পিল দিলেন।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, এই পিলটা ওঁকে কখন দেবো। ডাক্তারবাবু বললেন, ওঁকে দেবেন না। আপনি সন্ধ্যাবেলা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। তা হলেই উনি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবেন, সুস্থ হয়ে উঠবেন।

অসুখের এই গল্পে ডাক্তারবাবু একটু এগিয়ে আছেন, বৃদ্ধ রোগীর তরুণী ভার্যার ক্ষেত্রে এরকম নির্দেশ সম্ভব।

এবার এক নাবালকের উপাখ্যানে যাই যেখানে ডাক্তারবাবু পিছিয়ে আছেন।

ডাক্তারবাবুর চেম্বারে একটি ছোট শিশুকে নিয়ে আসা হয়েছে। তার বয়েস হবে বছর চারেক। তার পিঠে একটা বড় ফোড়া উঠেছে।

সেই ফোড়াটা কাটতে হবে। ডাক্তারখানার কমপাউণ্ডারবাবু আর শিশুটির মা তাকে জোর করে চেপে ধরে রাখলো উপুড় অবস্থায়, ডাক্তারবাবু ফোড়াটা কাটতে লাগলেন। আর শিশুটি 'মরে গেলাম রে' 'মরে গেলাম রে' বলে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলো।

অবশেষে ফোড়া কাটা সমাপ্ত হলো। এখনো শিশুটি কাঁদছে আর রাগে গজরাচ্ছে।

ডাক্তারবাবু শিশুটিকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে নানা রকম বাবা-বাছা করতে লাগলেন, অবশেষে সেই পুরানো প্রশ্নটি করলেন, 'বাবা তুমি বড় হয়ে কি হবে?'

অশ্রু ও রোষকষায়িত লোচনে শিশুটি বললো, 'বড় হয়ে গুণ্ডা হবো। তোকে পেটাবো।'

এবার সরাসরি অন্য রকম অসুখের আলোচনায় যাওয়ার সময় হয়েছে।

জীবনবীমা করার সময় সকলকেই একটা ফর্ম পূরণ করতে হয়। সাধারণত বীমার এজেণ্ট বা দালাল মহোদয়েরা বীমাকারকের সঙ্গে বসে এই সব ফর্ম পূরণ করেন।

বলা বাহুল্য যে কোনো সরকারি আধাসরকারি ফর্মের মতো এই ফর্মের কলমগুলো ভরানো সহজ কর্ম নয়। এজেণ্ট সাহেবের সাহায্য না নিয়ে এ সব ফর্ম পূরণ করা প্রায় অসম্ভব।

এই ফর্মে বাবা-মা ইত্যাদি নিকটজনের আয়ু, অসুখ ইত্যাদির বিবরণ দিতে হয়। এজেণ্ট সাহেব একেকটা প্রশ্ন করে তথ্য জেনে নিচ্ছিলেন বীমাকারীর কাছ থেকে আর সেই সঙ্গে ফর্ম ভরে যাচ্ছেন এই রকম একটা ঘটনার আমি একবার সাক্ষী ছিলাম।

ঘটনাটি কৌতুকপ্রদ, কারণ বীমাকারী যে সরল উত্তরগুলি দিচ্ছিলেন সেগুলি লেখা কঠিন, যথা:

প্রশ্ন: আপনার মা বেঁচে আছেন না মরে গেছেন?

উত্তর: মরে গেছেন।

প্রশ্ন: কিভাবে মারা গেছেন?

উত্তর ঃ অসুখে।

প্রশ্ন ঃ কি অসুখে ?

উত্তর ঃ এই মারাত্মক কিছু নয়, সাধারণ অসুখে।

আবার প্রশ্ন ঃ আপনার বাবা বেঁচে আছেন ?

উত্তর ঃ না, তিনিও মারা গেছেন।

প্রশ্ন ঃ কি ভাবে মারা গেলেন ?

উত্তর ঃ অসুখে।

আবার প্রশ্ন ঃ কি অসুখে ?

উত্তর ঃ এই মারাত্মক কিছু নয়, সাধারণ অসুখে।

এ রকম সরল প্রকৃতির লোক অবশ্য সচরাচর দুর্লভ যিনি যে অসুখে লোক মারা যায় সেই অসুখকেও সাধারণ অসুখ ভাবেন, ভাবেন যে সেটা মারাত্মক কিছু নয়।

অন্য ধরনের একটা সত্যিকার মারাত্মক ঘটনার কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। আমার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে এই গল্পটা বলেছিলেন। আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়। গল্পটা মোটেই সত্যি নয়, বানানো।

গল্পটা এমনিতে খুব সরল এবং সরাসরি। একদিন এক সকালে এক ভদ্রমহিলা আমার সেই ডাক্তার বন্ধুকে ফোন করেছেন, 'ডাক্তারবাবু কি সাংঘাতিক কথা আমার ছেলে এই মাত্র দুধ খেতে খেতে আস্ত একটা চামচে গিলে ফেলেছে।'

ডাক্তার বন্ধুটি এ কথা শুনে চিন্তিত হয়ে বললেন, 'আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি। আধ-ঘণ্টাখানেক লাগবে। আমি এসে দেখছি। কিন্তু তার আগে এই সময়টুকু আপনি কি করবেন ?'

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে নির্বিকার ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন, 'কোনো অসুবিধা হবে না। আমার আর একটা চামচে আছে। তাছাড়া আমাদের সকাল-বেলার চা খাওয়া তো হয়েই গেছে। বিকেলের আগে আর চামচের দরকার পড়বে না।

পেট থেকে চামচে বার করা কঠিন কাজ, হয়তো অপারেশনও করতে হবে কিন্তু আমাদের অনেকেরই এমন সব যৎসামান্য অসুখ আছে যা কিছুতেই সারে না।'

যার সর্দি বা কাশির ধাত আছে, যার মাথাধরার ব্যামো আছে সেই ভুক্তভোগী জানে এর থেকে কোনো মুক্তি নেই। কত রকম চিকিৎসা, কত রকম পরীক্ষা, কত এলিক্সির ভিটামিন আর কমপাউণ্ড গলাধঃকরণ করার পরে যে তিমিরে সে তিমিরে।

সেই যে বিলিতি একটা কথা আছে না তুমি যদি সর্দির চিকিৎসা করো তবে এক সপ্তাহে সারবে আর যদি কোনো চিকিৎসা না করো তা হলে সাতদিন লাগবে সারতে।

আমার একটা চোখের অসুখ আছে। বাইরের খোলা হাওয়ায় চোখ দিয়ে জল পড়ে।

আমাদের বাড়ির কাছেই ময়দান। আমি স্বাস্থ্যের খাতিরে সেখানে প্রতিদিন সকালে হাঁটতে যাই। কিন্তু যখন বর্ষাকাল কিংবা বিশেষ করে শীতকাল, যখন পূবালী কিংবা উত্তুরে হাওয়া হু হু করে বয় আমার চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ে, চোখের জলে বুক ভেসে যায়। দখিনা হাওয়াতে এতটা হয়তো হয় না কিন্তু জল পড়ে।

সে যাই হোক অশ্রু সম্বরণ করার জন্যে এক বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসকের কাছে গেলাম, তিনি খুব যত্ন করে আমাকে দেখলেন, ওষুধ দিলেন চোখে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু কিছুতেই চোখের জল পড়া বন্ধ হলো না। আবার তাঁর কাছে গেলাম। আবার তিনি খুঁটিয়ে দেখলেন, এবার তিনি ওষুধ দিলেন, এবার আর চোখে দেয়ার জন্যে নয়, খাওয়ার ওষুধ দিলেন।

এর পরেও কিছু হলো না। আবার ময়দানে যাই আবার হাওয়া লেগে চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল পড়ে। আবার ডাক্তার সাহেবের শরণাপন্ন হলাম। আবার তিনি ওষুধ দিলেন তবে এবার আর চোখে দেয়ার বা খাওয়ার জন্যে নয়, এবার সরাসরি ইঞ্জেকশন।

এতেও কিন্তু কোনো লাভ হলো না। ময়দান ভ্রমণের সময় চোখ দিয়ে যথা-রীতি জল পড়তে লাগলো।

ডাক্তার সাহেব কিন্তু এখনও হাল ছেড়ে দেননি বা হতাশ হননি। এবার তিনি আমার পরীক্ষা শুরু করলেন। রক্ত মূত্র সমেত আপাদমস্তক, এক্সরে থেকে স্ক্যানিং এই শহরে যা কিছু করা সম্ভব সব আমার ওপরে করলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা গচ্চা গেলো আমার।

অবশেষে একদিন ডাক্তার সাহেব আমাকে বললেন, 'আপনার রোগটা কিছুতেই ধরা গেলো না।'

আমি বললাম, 'তা হলে এত কিছুর পরেও আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে যাবে?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'না তা কেন? আপনি আর সকালবেলায় খোলামাঠে হাঁটতে যাবেন না, তাহলেই আপনার চোখ দিয়ে জল পড়বে না।'

আমি অবশ্য ডাক্তারবাবুর উপদেশ মান্য করিনি, এখনো হাঁটতে যাই। এখনো হাওয়া লাগলে চোখ দিয়ে জল পড়ে আর ভাবি বৃথা অর্থ নষ্ট হলো। বৃথা পরিশ্রম গেলো এত সব ডাক্তারি পরীক্ষায়।

আমার এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি বিলিতি জোকবুক সংস্করণ আছে, সেটি অবশ্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

এক রোগী তাঁর ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'স্যার, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে ঘণ্টা খানেক বড় মাথা ঘোরে। মাথা ঝিমঝিম করে।'

ডাক্তারবাবু জানতে চাইলেন, 'তারপর?'

রোগী বললেন, 'তারপর মোটামুটি ঠিক হয়ে যায়। ঘণ্টাখানেক পরে মাথাটা আর ঘোরে না।'

ডাক্তারবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করে তারপর পরামর্শ দিলেন আপনি এখন থেকে ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম থেকে উঠবেন।

এ তবু মন্দের ভালো। বিলিতি গল্পের এই ভদ্রলোকের টাকা-পয়সা কিছু খরচ হয়নি, আমার মতো নানা জায়গায় দৌড়তে হয়নি নানা রকম পরীক্ষার জন্যে।

এতগুলি ভয়াবহ আখ্যানের পরে এতক্ষণে দুয়েকটা আজগুবি গল্পের সময় হয়েছে। আজগুবি গল্পের বিশেষ সুবিধে এই যে গল্পটা কোনো কারণে বিশ্বাসযোগ্য অথবা গ্রহণযোগ্য না হলেও গল্পের মজাটা উপভোগ করা যায়।

প্রথম গল্পটা এক ডাক্তারবাবু রোগীদের ফল খাওয়ানোর বাতিক নিয়ে। তিনি সব রোগীকেই বলতেন, 'ফল খান, আরো ফল খান। ফলের কোনো কিছু ফেলবেন না, খোসাসুদ্ধ খাবেন। যার যে ফল পছন্দ সেই ফল খাবেন, যতটা পারবেন খাবেন।'

একদিন এক রোগী এসে ডাক্তারবাবুকে জানালো, 'ডাক্তারবাবু আপনার কথামত খুব চেষ্টা করছি ফল খাওয়ার কিন্তু খেতে তো পারছি না।'

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ?'

রোগী বললেন, 'আপনি তো নিজের পছন্দসই ফল খেতে বলেছেন খোসাসুদ্ধ, তা আমার প্রিয় ফল হলো নারকেল। দৈনিক সকালে উঠেই একটা নারকেল খোসাসুদ্ধ চিবোতে চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছি না।'

এই বলে রোগী বেচারী ডাক্তারবাবুকে জিব বার করে দেখালেন, 'এই দেখুন ডাক্তারবাবু, নারকেলের ছোবড়ায় আমার জিব কেমন ছড়ে গিয়েছে। নারকেল কেন আমি এখন আর কিছুই খেতে পারছি না।'

এরপরের এবং এই রম্য নিবন্ধের শেষ আজগুবি আখ্যানটি হয়তো কারো কারো পুরনো বা চেনা মনে হতে পারে কিন্তু এই রচনায় মাননীয় ডাক্তারবাবুদের হৃদয়আঘাতকারী দুয়েকটি উপাখ্যান আছে বলেই তাঁদের হৃদয়ে আনন্দকারী এই গল্পটি স্মরণ করছি। এই গল্পে রোগীর উচিত শিক্ষা হয়েছে।

এক গোলমেলে রোগী ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়েছেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'আপনার কি হয়েছে ? আপনার কি কষ্ট ? কি অসুবিধে ?'

কিন্তু রোগী আগাগোড়া চুপ করে থাকেন, ডাক্তারবাবু যত প্রশ্ন করেন তাত চুপ করে থাকেন।

তবে তিনি যে বোবা নন সেটা বোঝা গেলো, যখন তিনি ডাক্তারকে বললেন, 'আমি বলবো কেন আমার কি অসুখ, আমার কি কষ্ট, আপনি ডাক্তার, আপনাকে আমি ভিজিট দিচ্ছি আপনিই বলুন আমার কি হয়েছে, কেন হয়েছে ?'

ডাক্তারবাবু খুব চটে গেলেন এ কথা শুনে। তারপর ভুরু কুঁচকিয়ে রোগীকে বললেন, 'আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন। আপনার যাওয়া উচিত হবে কোনো পশুচিকিৎসকের কাছে। শুধু তাঁরাই পারেন রোগীকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে চিকিৎসা করতে।'

পুনশ্চ ঃ

কথাটা আগেও বলেছি, এবারো বলি।

যে কোনো ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসার জন্যে যান দেখবেন অনিবার্যভাবে তিনি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন ঃ

'সকালে কি খান ?···

দুপুরে কি খান ?···

বিকেলে কিছু খান কিনা ?

রাতে কি খান ? মাছ, মাংস না নিরামিষ ?'

আপনি হয়তো ভাবেন আপনি কি খাওয়া-দাওয়া করেন সেই সব জেনে নিয়ে ডাক্তারবাবু আপনার চিকিৎসা করবেন।

তা কিন্তু মোটেই নয়।

আপনি কি খান বা না খান সেটা ডাক্তারবাবু জানতে চান আপনার আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করার জন্যে। কারণ তার ওপরই ভিত্তি করে তিনি আপনার চিকিৎসা করবেন। আপনার যত টাকা ব্যয় করার ক্ষমতা আছে সেই মানের চিকিৎসা হবে আপনার।

রমণী সমাজে

পুরো কথাটা হল 'সুত-মিত-রমণী সমাজে'। সুত মানে হল পুত্র, মিত মানে হল মিত্র এবং সেইসঙ্গে রমণী সমাজ। বিষয়টা খুব বড়ো হয়ে যাচ্ছে। তাই শুধু রমণী-সমাজই থাক এবারের বিষয়।

প্রথমে একটা মেয়েদের ক্লাব দিয়ে আরম্ভ করি। সেখানে এক পুরুষ-বক্তা কঠোর ভাষায় আধুনিকা রমণীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ঘোর নিন্দা করছিলেন। কতক্ষণ আর মহিলা শ্রোতারা সহ্য করবেন ; সভাকক্ষ থেকে কয়েকজন রেগে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজন টেবিল চাপড়াতে লাগলেন।

তাতেও কিন্তু ভদ্রলোক নিরস্ত হলেন না। অবশেষে একজন অতি-মুখরা রমণী উঠে সরাসরি তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, মশায়, আপনি যে ধরনের উচ্ছৃঙ্খল মেয়ের নিন্দে করছেন, জীবনে সে-রকম একটি মেয়েও কি আপনি দেখেছেন ?

প্রশ্নকারিণীর দিকে শীতল হিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বক্তা অতি ঠাণ্ডা গলায় জানালেন, 'একটি মানে ? সে ধরনের একটিকে তো আমি নিজেই বিয়ে করেছি।'

এর পরে অবশ্য আর কথা চলে না।

মহিলাদের সম্পর্কে কটূক্তি, নিন্দা চিরকালই পুরুষমানুষেরা করেছে—এ তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা ছোটো বয়সে গ্রামাঞ্চলে শুনেছি, মহিলাদের মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। সেই ধুতি-শাড়ির পৃথিবীতে প্রচলিত কথাই ছিল বারো হাত কাপড়ে কাছা দেয় না যারা, অর্থাৎ মহিলারা, তাঁরা আবার মনুষ্য পদবাচ্য কিনা, এ-বিষয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের বঙ্গদেশীয় পুরুষেরা তখনো দক্ষিণী রমণীদের দেখেননি, যারা সত্যিই কাছা দিয়ে শাড়ি পরে। তখনো ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ,

নানা অঞ্চল এত কাছাকাছি হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে বাংলার অভ্যন্তরে, এমন কি ঢাকা অথবা চট্টগ্রামের মতো শহরেও দক্ষিণ ভারতীয় খুব কম দেখা যেত, বলা উচিত দেখা যেত না।

এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথাও খেয়াল রাখা উচিত—কাছা দিয়ে শাড়ি পরার চল যাদের মধ্যে ছিল, তারাও কিন্তু আর কাছা দিয়ে শাড়ি পরছে না। কিছু-কিছু সাবেকি পরিবারে হয়তো এখনো কাছা দেওয়ার চল আছে, তবে সারা ভারতে এখন শাড়ি পরার একটাই রীতি, তবে হিন্দুস্থানী ঢঙে অনেকে আঁচলটা বুকের ডানদিকে না দিয়ে বাঁয়ে দেয়।

রম্যরচনার বিষয়বস্তু থেকে একটু দূরে সরে গেলাম। তাছাড়া শাড়ির ব্যাপারটা আমার বিষয়বস্তু হতে পারে না।

সুতরাং আবার মহিলাদের কথায় যাই।

মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের পার্থক্য বোঝাতে এক মহাপুরুষ একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কোনো পুরুষমানুষকে যদি কোনো কথা বলো তাহলে সে এক কান দিয়ে শুনবে আর অন্য কান দিয়ে সেই কথা বেরিয়ে যাবে।

আর যদি কোনো মহিলাকে কোনো কথা বলো তাহলে সে দু কান দিয়ে শুনবে, তারপর আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলেই সেই কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

শিল্পী পিকাসো একদা একটি বিপজ্জনক রসিকতা করেছিলেন মেয়েদের সম্পর্কে। কে যেন তাঁকে এমনি-এমনিই কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, বিশ বছর বয়েস হয়ে যাওয়ার পর মেয়েদের ছেলেদের তুলনায় ক্রমশ বেশি বুড়োটে দেখায় কেন?'

এই প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ চিন্তা করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর। তারপর একটু ঠোঁট টিপে হেসে উত্তর দিলেন, 'মেয়েদের ছেলেদের থেকে বেশি বুড়োটে দেখায়, তার কারণটা সম্ভবত এই যে, একজন পঁচিশ বছর বয়েসী মহিলা, তার বয়সটা হয়তো সত্যিই পঁচিশ নয়, তিরিশ কিংবা হয়তো চল্লিশও হতে পারে।'

সত্যিই মেয়েদের বয়েস ব্যাপারটা খুব গোলমেলে—এ নিয়ে জগৎ-সংসারে কতরকম ঠাট্টাই না প্রচলিত আছে।

সেই গল্পটা তো সবাই জানে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলেছিল, 'তোমার বয়েসটা বলো?' প্রেমিকা হঠাৎ এই প্রশ্নে অবাক হয়ে বলেছিল, 'কেন? হঠাৎ ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমার বয়েস দিয়ে কী হবে?'

প্রেমিক বলেছিল, 'তোমার যত বয়েস, তত নম্বর ঘোড়ার ওপর বাজি রাখবো। দেখি তুমি কীরকম লাকি।'

প্রেমিকা সলজ্জ হেসে বলেছিল, 'চব্বিশ' এবং দুরুদুরু হৃদয়ে ঘোড়দৌড়ের বাজির পরিণতি লক্ষ্য করছিল। ঘোড়দৌড় শেষ হল, বাজি জিতল বত্রিশ নম্বর ঘোড়া এবং প্রেমিকা সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

কারণ নিশ্চয় একটাই, সে যদি তার সঠিক বয়েসটা বলত, বাজিটা তারাই জিতত।

অনেক গোলমেলে লোক আছেন, যাঁরা বলেন, মেয়েরা সত্যি সত্যি মোট বয়েসটা কমান না কখনো। গড়ে ঠিকই থাকে, শুধু নিজের বয়েসটা যতটুকু কমান ততটাই যোগ দিয়ে দেন ননদের কিংবা বান্ধবীর বয়সের সঙ্গে।

মেয়েদের শাড়ি হলো, বয়েস হলো এবার অন্য কিছু বলি, বুদ্ধির কথা বলি।

গল্পটি বিদেশী। এক মহিলা এক বড়ো ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে—মানে যে সব বিশাল দোকানে জামা-জুতো, বই-খাতা, খেলনা স্টেশনারি—যাবতীয় জিনিস বিক্রি হয়, সেখানে গিয়ে দোকানের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেন।

ম্যানেজার ভদ্রমহিলার সাক্ষাতের কারণ জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, 'আপনারা কি কোনো জিনিস পছন্দ না-হলে সে-জিনিস কেনার পরে ফেরত নেন?'

কঠিন প্রশ্ন। ম্যানেজার সাহেব বেশ একটু চিন্তা করে বললেন, 'জিনিসটা কী, সেটা দেখতে হবে।'

ভদ্রমহিলা তাঁর ব্যাগ থেকে একটা বই বার করে বললেন, জিনিসটা হল একটা বই।'

ম্যানেজার বইটা হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে বললেন, 'কেন, বইটা কী দোষ করল? খুব নাম করা লেখকের বই।'

মহিলা বললেন, 'বইটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। শেষটা ভালো হয়নি। তাই ফেরত দিতে চাই।'

চা

বিশের শতক প্রায় শেষ হতে চলেছে। খবরের কাগজে, প্রবন্ধে-নিবন্ধে, সভা-সমিতিতে লোকেরা একুশ শতক, একুশ শতক বলে হৈচৈ শুরু করেছে।

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে বিশ শতকের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা কি, হয়তো একে-একে মনে হবে—দুই মহাযুদ্ধ, সাম্যবাদের প্রসার ও পুনর্বিন্যাস, উপনিবেশতন্ত্রের অবসান, পারমাণবিক বোমা, চাঁদ ও মহাকাশের রহস্যে প্রবেশ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু এই সঙ্গে আমি যদি যোগ করি চা নামক অতি পরিচিত নিরামিষ একটি পানীয়ের নাম খুব বোকামি করব কি?

পৃথিবীর সব দেশে সমস্ত প্রান্তে, নাইজেরিয়া থেকে পাকিস্তান, মরু সাহারা থেকে মেরু আলাস্কা চীন, ভারত কিংবা সাহেবদের দেশে তো বটেই, গত একশো বছরে মানুষের অপরিহার্য সঙ্গী হয়েছে চা। ঘরে-ঘরে গরম জলে চায়ের পাতা ভেজানোর সৌরভে ভোর হয়। সরাইখানায়, হোটেল, রেস্তোরাঁয় চায়ের পেয়ালা

সামনে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করে আলাপচারী জনতা।

চা ইংরেজদের প্রিয়তম পানীয়। বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে চায়ের জনপ্রিয়তা তারাই বাড়িয়েছে। আর আমেরিকার মুক্তিবিপ্লব সেও তো জাহাজ থেকে চায়ের পেটি নামানো নিয়েই।

আর আমরা, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা জানি, সহস্র-সহস্র দরিদ্র শ্রমিকের রক্ত, অশ্রু ও স্বেদ ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে। তার স্বাদ, বর্ণ, সৌরভ সব কিছুকে পূর্ণতা দিয়েছে। আমাদের কৈশোরে অবশ্যপাঠ্য উপন্যাস ছিল মুলুকরাজ আনন্দের 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'। বোধহয় বাংলায় অনুবাদটা ছিল স্বর্গত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের। আবেগপ্রাণ প্রথম যৌবনে সেই বই পড়ে আমরা শিহরিত, মুগ্ধ, মথিত হয়েছিলাম।

রক্ত-স্বেদ-অশ্রুর কথা আপাতত একপাশে থাক। চায়ের প্রথম যুগের অন্য কথা বলি।

ইংরেজ কবি উইলিয়াম কাউপার লিখেছিলেন চায়ের সম্পর্কে, অতি চমৎকার একটি স্তুতিবাক্য।

বহুখ্যাত সেই বাক্যটি হল ঃ

'The Cups that cheer but not inebriate.'

পরবর্তীকালে যখন এনড্রু ইয়ুল কোম্পানি ভারতে চায়ের ব্যবসা প্রথম শুরু করে তখন এই কোম্পানি চা-পান জনপ্রিয় করার জন্যে কিছুকাল বিনাপয়সায় রাস্তাঘাটে, বাজারে, হাটে, রেলস্টেশনে, স্টিমারঘাটে বহু লোককে চা খাইয়েছিল। কাউপার সাহেবের পদ্যের অনুকরণে তারা সে-সময়ে ইংরেজিতে বিজ্ঞাপন দিত ঃ

'A Cup that inebriate but not intoxicates.'

তখন কলকাতাই হল সব-কিছু। বাংলা ও বাঙালি, তারাই সব ব্যবসায়ের অধিক্ষেত্র এবং বলা বাহুল্য, পাটনা গৌহাটি কিংবা কটক, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এবং আসামের শিক্ষিতজন মাত্রেই বাংলাভাষায়ও লিখিত।

এনড্রু ইয়ুল ঠিক করলেন বাংলাভাষায় চায়ের বিজ্ঞাপন করবেন এবং উপরোক্ত পঙ্‌ক্তির যিনি সবচেয়ে ভালো বঙ্গানুবাদ করে দিতে পারবেন তাঁকে ভালো পুরস্কার দেবেন।

একদিন স্মরণীয় গদ্যকার অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে এক বন্ধু এসে ঐ পুরস্কারের কথা বললেন, তারপর অক্ষয়চন্দ্রকে বললেন, 'আপনি ঐ বিজ্ঞাপনের ইংরেজি লাইনটির একটি বাংলা তর্জমা করে দিন, আমি ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে চাই।'

অক্ষয়চন্দ্র বললেন, 'একটা গরম (অর্থাৎ ধূমায়িত) চায়ের পেয়ালা-পিরিচ এঁকে তার নিচে লিখে দিন—

"আমি ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে চাই।"'

অক্ষয়চন্দ্র বললেন, 'একটা গরম (অর্থাৎ ধূমায়িত) চায়ের পেয়ালা-পিরিচ এঁকে তার নিচে লিখে দিন—

"তাতায় কিন্তু মাতায় না।"

বলা বাহুল্য, অক্ষয়চন্দ্রের এই তর্জমাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিল।

চায়ের মতো হালকা পানীয় বিষয়ে এই রম্য নিবন্ধটি কেমন যেন কাঠখোট্টা প্রবন্ধের দিকে বাঁক নিয়েছে। এবারে এটার একটু মোড় ঘোরাই।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি নিজে নাকি গামলা-গামলা চা পান করতেন অথচ অনবরত চেঁচাতেন, চা খেয়েই বাঙালি জাতি অধঃপতনে যাচ্ছে, চা-পান না বিষ-পান।

চা-পান না বিষ-পান প্রসঙ্গে একটি পুরনো তরল আখ্যানে যাই।

এক ভদ্রলোক এক রেস্তোরাঁয় এক পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়েছিলেন। চা আসার পর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দেখেন সেটা যেমন তেতো, তেমনি বিস্বাদ।

তিনি বেয়ারাকে ডেকে বললেন, 'এটা কি চা খাচ্ছি না বিষ খাচ্ছি?'

বেয়ারা প্রশ্নবোধক চোখে প্রশ্ন করল, 'স্যার কোনো গন্ধ পাচ্ছেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'গন্ধ? খাঁটি ফিনাইলের গন্ধ পাচ্ছি।'

তখন বেয়ারাটি বলল, 'ফিনাইল? তাহলে তো চা দিইনি আপনাকে। আমাদের চায়ে কেরোসিনের গন্ধ। আপনাকে কফি দিয়েছি, ফিনাইলের গন্ধ হল আমাদের কফিতে।'

চা-বিষয়ক এর চেয়েও অখাদ্য (নাকি বলা উচিত অপেয়) আরেকটি গল্প আমি জানি।

অনন্তকাল আগে গল্পটি আমাকে বলেছিলেন সুকবি দেবতোষ বসু।

তখন কলকাতায় ঠাণ্ডা চা অর্থাৎ কোল্ড টি-এর হঠাৎ খুব রমরমা। ঠাণ্ডা চা জিনিসটা আর কিছু নয়, কাপের বদলে গেলাসে খেতে হয়, একটু বেশি দুধ, বেশি চিনি অনেকটা বরফ আর বলা বাহুল্য, দাম গরম চায়ের ডবল।

সেই সময়ে বহু চায়ের দোকানেই সাইন বোর্ডে লেখা থাকত গরম চা চার আনা, ঠাণ্ডা চা আট আনা।

দেবতোষ নাকি দেখেছিল, অন্তত সে আমাকে তাই বলেছিল, এইরকম একটা দোকানে এক খদ্দের এক কাপ গরম চা নিয়ে হঠাৎ সাইন বোর্ডের দিকে তাকিয়ে পুরো চা-টুকু প্রায় এক চুমুকে জিব, ঠোঁট, গলা পুড়িয়ে গিলে নিয়েছিল।

এই অস্বাভাবিক ঘটনা দেখে দেবতোষ সেই চাপায়ীকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'এত গরম চা এক চুমুকে খেলেন কি করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কি করব বলুন? ঠাণ্ডা হলেই যে দাম দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

পুনশ্চ ঃ

কবির লড়াইতে চাপান আর উতোর বলে একটা কথা আছে, সে চাপান আর এই চা-পান এক জিনিস নয়। তবু অবশেষে চিরস্মরণীয় কবির চা-বিষয়ক সেই গানটি স্মরণ করছি ঃ

'চা স্পৃহা চঞ্চল
চাতক দল চলো চলো হে।'

রামচরণবাবু

বহুদিন পরে রামচরণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। রামচরণবাবু আমাদের সদর থানার ছোটদারোগা ছিলেন। ছোটদারোগার কোয়ার্টার ছিলো আমাদের বাসার পাশেই। রামচরণবাবুর বৃত্তিতে দারোগা ছিলেন কিন্তু আমরা কখনো তাঁকে দারোগা বলে ভয় পাইনি। অবশ্য এখন বুঝি,, যাদের দারোগা প্রতিবেশী তাদের পক্ষে দারোগাভীতি থাকা সম্ভব নয়।

সে যা হোক আমি বর্তমানে কোনো অবসরপ্রাপ্ত মহৎ ছোটদারোগার জীবন-চরিত্র লিখতে ইচ্ছুক নই। রামচরণবাবুকে দেখে আমার একেবারে অন্য কথা মনে পড়ে গেলো। এর সঙ্গে আমাদের একটি পারিবারিক ঘটনাও জড়িত। তাই আমার আত্মজীবনীতে এই ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন বলে অনুভব করছি।

রামচরণবাবু সামনের দিক থেকে আসছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হলো। কিন্তু তাঁকে দেখামাত্র আমার তাঁর ঘাড়ের কথা মনে পড়লো, আমি চট করে একটু ঘুরে গিয়ে তাঁর ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এখনো স্পষ্ট হয়ে রয়েছে, ঘোড়ার দাঁতের পর পর তিনটে দাগ তাঁর ঘাড়ে এখনো জ্বলজ্বল করছে।

এর পশ্চাতে যে কাহিনী রয়েছে যাঁরা আমার মুখে হাম্বো জাম্বো জাম্বো লা গান শুনেছেন সেটা তাঁদের পক্ষে অবিশ্বাস্য হতে পারে। সত্যি কথা বলতে গেলে সঙ্গীতসাধনার জন্যে এতবড় আত্মত্যাগ বাংলাদেশের আর কোনো পরিবার করেছে বলে জানি না।

আমার এই আত্মজীবনীর অন্যান্য অংশ যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন যে আমার পিতৃ-পিতামহ পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। আমি এবং আমার এক খুল্ল-প্রপিতামহ ব্যতীত গত দেড় শতাব্দীতে এর কোনো ব্যতি-ক্রম নেই। উক্ত খুল্ল-প্রপিতামহ সঙ্গীতরসিক ছিলেন। তাঁর রচিত একটি সঙ্গীত আমাদের অলিখিত পারিবারিক সংবিধানে উষাকালে সমস্বরে গীত হবার নির্দেশ ছিলো। কালক্রমে আমাদের পরিবার নানা কারণে কি করে নির্দেশচ্যুত হয়ে পড়ে। কিন্তু মদীয় পিতৃদেবের আমলে পুনরার সঙ্গীতচর্চার পারিবারিক রেনেসাঁর চেষ্টা করা হয়।

রেনেসাঁর প্রথম স্টেপ উষাকালে খুল্লপ্রপিতামহের সেই স্বরচিত সঙ্গীত। এত-দিন পরে সমস্ত পংক্তিগুলি স্পষ্ট মনে নেই, আবছা আবছা মনে পড়ছে। আমরা ডজন দেড়েক খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো, পিসতুতো ভাই-বোন, মুহুরিবাবুরা, দুই-একজন উৎসাহী মক্কেল, বাবা এবং বাড়িতে অতিথি কেউ থাকলে তিনি, এছাড়া কোনো নববধূ থাকলে (প্রথম সন্তান না হওয়া পর্যন্ত) এই সঙ্গীতলহরীতে অংশ নিত। গানের প্রথম অংশটি বোধহয় এইরকম ছিল ঃ

ওরে দুর্দান্ত, যম কৃতান্ত
তোকে নিতান্ত
কি আর কহিব।

হোক না প্রাণান্ত, হোক জীবনান্ত
প্রাণ-মন ভরে ঈশ্বর বৃত্তান্ত
কহিব কহিব কহিব।
যতদিন এ ধরাধামে রহিব।
ওরে কৃতান্ত তোকে নিতান্ত
কি আর কহিব।

এই কৃতান্ত-বৃত্তান্ত সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক আত্মত্যাগের কাহিনী এবং রামচরণবাবুর কাঁধে ঘোড়ার দাঁতের চিহ্নের ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট। ঘটনাটি সংক্ষেপে পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

বাবার একজন শাঁসালো মক্কেল ছিলেন। তিনি খুব ভোরের দিকে ঘোড়ায় চড়ে আমাদের বাড়িতে এসে পেঁছাতেন। তার ঘোড়াটির মত নিরীহ জীব আমি জন্মে দেখিনি। অমন মারাভরা চোখ, এমন নির্লিপ্ত দার্শনিক উদাসীনতা মানুষের মধ্যেও বিরল। মক্কেল ভদ্রলোক বাবার সঙ্গে আদালত চলে গেলেই আমরা অশ্বারোহণে ব্রতী হতাম, একসঙ্গে যতজন সম্ভব। ঘোড়াটি কখনো আপত্তি করেনি।

সেদিনও সকালে যথারীতি সঙ্গীত-লহরী আরম্ভ হয়েছে। আমরা ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে বাইরের কাছারীঘরের সামনে জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক এসে গেছেন। ভদ্রলোক ঘোড়াটির পিঠ থেকে জিনটা নামিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময়, 'ওরে দুর্দান্ত, যম কৃতান্ত'! ঘোড়াটা প্রথমে কানটা খাড়া করে আকাশের দিকে তাকালো, সেকেণ্ড পনেরো স্থির হয়ে রইলো, তারপরে মালিককে মুহূর্ত মাত্র বুঝবার কিছু সুযোগ না দিয়ে ৪৫ ডিগ্রী ঘুরে গিয়ে পিছনের জোড় পায়ে এক লাথি ছুঁড়ল। পরক্ষণেই রুদ্ধশ্বাস আর্তনাদ (মালিক এবং ঘোড়ার একসঙ্গে) আমাদের কর্ণগোচর হলো, কিন্তু পারিবারিক অনুশাসনক্রমে আমাদের পক্ষে সঙ্গীত বন্ধ করা সম্ভব হলো না। আমরা দ্রুতধাবমান অশ্বখুরের শব্দ এবং আর্তনাদ শুনতে শুনতে গেয়ে চললাম ঃ

যতদিন এ ধরাধামে রহিব
প্রাণ মন ভরে ঈশ্বর বৃত্তান্ত
কহিব কহিব কহিব!

এ কাহিনীর একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে। রামচরণবাবু সেই সময়ে প্রাতঃভ্রমণ করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে সঙ্গীত-উত্তেজিত অশ্ব এবং স্থানীয় থানার ছোটদারোগার সাক্ষাৎকার চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো রামচরণবাবুর স্কন্ধে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রামচরণবাবু প্রাতঃভ্রমণের সময় অতিউচ্চ কণ্ঠে নিজেও কি একটি গান গুনগুন করে গাইতেন। সেই গানটি আমি জানি না, এই ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণও কোনোদিন জানা যায়নি। শুধু সতেরোদিন পরে জেলার সদর হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে আসবার পর রামচরণবাবু একটি বদলির দরখাস্ত করেছিলেন। সেই হাসপাতালে পাশের বেডে নাকি বাবার সেই মক্কেলও ছিলেন। তাঁর বদলির দরখাস্তের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি আর কোনদিন আমাদের বাড়িতে আসেননি। তাঁর দুটি বড় মামলা একতরফা ডিক্রি হয়ে

গিয়েছিল।

সেই ঘোড়াটির আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে এক ভদ্রলোক নাকি সেই দিন সূর্যোদয়ের সময় একটি দ্রুতচারী ঘোড়াকে ধলেশ্বরীর জলে (ধলেশ্বরী আমাদের বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে) লাফিয়ে পড়তে দেখেছিলেন। সম্ভবত ঘোড়াটি আত্মহত্যা করেছিলো।

চিড়িয়াখানায়

আমার এই অতি হাস্যকর লেখক-জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ঘটেছিল চিড়িয়াখানায়। ঘটনাটা অনেক সময় হাসতে হাসতে অনেককে বলেছি, তবে কখনও লিখিনি। এখনও লিখতে একটু সংকোচ হচ্ছে, একটু আত্মপ্রচারের মত হয়ে যাচ্ছে। তবু লিখছি, বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকা দয়া করে লক্ষ্য করবেন নেহাত মজার গল্পের খাতিরেই ঘটনাটা লিখছি, আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

ষোল-সতের বছর আগেকার কথা। সেটা উনিশশ পঁচাত্তর সাল। বাংলাদেশ যুদ্ধের বছর। আমার নিজের লোকেরা সব দেশ থেকে শূন্য হাতে কপর্দকহীন অবস্থায় কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। রীতিমতো উদ্বেগ ও আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন যাচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ স্বাধীন হল, বাবা-মা এবং আর সবাই বাড়ি ফিরল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

স্পষ্ট মনে আছে তারিখটা, নববর্ষের সকাল, বাহাত্তর সালের পয়লা জানুয়ারি। ডোডো আর তাতাইকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গেছি। তাতাই আমার ছেলে, ডোডো তার বন্ধু। সেই সময়ে আমি সোমবারের আনন্দবাজারের আনন্দমেলার পাতায় সপ্তাহে সপ্তাহে ধারাবাহিক 'ডোডো-তাতাই' লিখছি।

এই সব দিনে যেমন হয়, সেদিন চিড়িয়াখানায় ভয়াবহ ভিড়। শোনা যায় এই সব ছুটির দিনে বিশেষত শীতকালে চিড়িয়াখানায় লক্ষাধিক লোক হয়। এক লক্ষ লোক অবশ্য একসঙ্গে ঢোকে না। সারাদিন ধরে লম্বা লম্বা লাইন দিয়ে ঢোকে। তবে কোনো কোনো সময়ে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক লোক চিড়িয়াখানার ভিতরে থাকে। তার মানেই গাদাগাদা মানুষ, গিজগিজে ভিড়।

ঐ ভিড়ের মধ্যে বার বার ডোডো-তাতাই চোখের আড়াল হয়ে যাচ্ছিল। তখন তারা খুবই ছোট, বড়জোড় পাঁচ ছয় বছর বয়েস। চিড়িয়াখানার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে যেখানে গণ্ডারের খন্দ রয়েছে সেই খন্দের রেলিংয়ের এপাশে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি ডোডো-তাতাইকে সাপের ঘর দেখতে পাঠালাম, সেখানে বিরাট লাইন দেখে আমি আর নিজে ঢুকলাম না। অনেকক্ষণ পরে ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসে দিক ভুল করে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম তার বিপরীত দিকে হন-হন করে রওনা হল। আমি ডোডো-তাতাই, এই ডোডো-তাতাই বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম।

আমার সামনে দিয়ে একদল লোক যাচ্ছিল; পরনে ধুতি শার্ট, গায়ে র‍্যাপার। [illegible] দেখে, [illegible] দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনার মানুষ বলে মনে হল।

তারা আমার মুখে ডোডো-তাতাই ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল, ততক্ষণে ডোডো-তাতাই ছুটে আমার কাছে চলে এসেছে। ওরা বুঝতে পারল, এই দুজনের নাম ডোডো আর তাতাই। দলের মধ্যে একজন লোক বাচ্চা দুটোকে ভাল করে দেখে নিয়ে তারপর আমার প্রতি কটাক্ষপাত করে আমাকে শুনিয়ে বেশ জোরে জোরে বলল, 'শালা, আদেখলে খবরের কাগজ দেখে ছেলেদের নাম রেখেছে।'

বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে আমি সেদিন যথেষ্টই গৌরবান্বিত বোধ করেছিলাম এবং আমার রচনার এরকম স্বীকৃতি পাব কখনই আশা করিনি।

এই একটি ঘটনা ছাড়া চিড়িয়াখানা-জনিত আমার বাকি যা কিছু স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা তা খুব মধুর নয়। বানরের খাঁচার গায়ে খুব ছোট ছোট অক্ষরে কি একটা জটিল লেখা ছিল, সেটা কাছে গিয়ে ভাল করে পড়তে যাচ্ছি, শিকের মধ্যে দিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাজি বানর আমার চোখ থেকে চশমাটা কেড়ে নেয়। তখন জেনেছিলাম, নোটিসটিতে অতি ক্ষুদ্র হরফে যা লেখা আছে তার মর্ম হল ঃ

'পাজি বানর আছে।

খাঁচার নিকটে আসিবেন না।'

এছাড়া অনেক আগে একবার ছোলা খাওয়াতে গিয়ে একটা কালো রাজহাঁস আমার হাতে ঠুকরে দেয়, অমন দীর্ঘগ্রীবা, ঝলমলে, রাজকীয় সৌন্দর্যময় একটি প্রাণী যে এত হিংস্র হতে পারে তা ভাবাই কঠিন।

শুধু রাজহাঁস কেন, একবার একটা জেব্রাও আমার হাত থেকে খাবার খেতে গিয়ে আচমকা ডান হাতের তর্জনীটা এমন চিবিয়ে দেয় যে একসঙ্গে দশ পাতার বেশি লিখলেই এখনও আঙুলটা টনটন করে, বেশ ফুলে ওঠে। ফলে এ-জীবনে আমার কোন বড় লেখা, এমনকি পুজোর উপন্যাস পর্যন্ত লেখা হল না। এর জন্য কোনও কোনও পাঠক অবশ্য জেব্রাটিকে প্রভূত ধন্যবাদই দেবেন।

আমি যখন যে শহরেই যাই, খুব অসুবিধা না হলে সেই শহরে একটা চিড়িয়াখানা থাকলে সেখানে একবার যাওয়ার চেষ্টা করি।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানার গা-ঘেঁষেই বিশাল পাহাড়ী খাদ। হরিণের খাঁচার পাশ বরাবর ঢালু খাদ নেমে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি চিড়িয়াখানার এক কর্মচারীকে বলেছিলাম, 'এই খাদে নিশ্চয় মাঝে মাঝে কেউ কেউ পড়ে যায়।' সেই ব্যক্তি ঠোঁট উল্টিয়ে আমাকে জবাব দিয়েছিল, 'মাঝে মাঝে পড়ে না, পড়লে একবারই পড়ে। পাঁচশ ফুট খাদের নিচে মাঝে মাঝে পড়ার সুযোগ কোথায় ?'

বিদেশে আরও গোলমালে পড়েছিলাম। লস এঞ্জেলস শহরে এক মেমসাহেবকে আমি বলেছিলাম যে আমি জু দেখতে চাই। আমার বাঙাল উচ্চারণে 'জু' (Zoo) বোধহয় মেমসাহেবের কানে 'Jew' অর্থাৎ 'ইহুদি' হয়ে গিয়েছিল। তিনি পর পর দুবার যাচাই করলেন সত্যি আমি কী দেখতে চাই। আমি যখন তৃতীয়বারেও 'জু' বললাম, তিনি ধরে নিলেন, আমি নিশ্চয় কোন ইহুদিকে দেখতে চাইছি। তিনি নিজে ইহুদি, দুপা এগিয়ে একদম আমার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দেন সি মি, আই এ্যাম এ জু (Then see me, I am a Jew)।' ব্যাপারটা বুঝে উঠতে আমার বেশ কাল লেগেছিল।

স্বপ্ন

এক অনতিবিখ্যাত ইংরেজ কবি প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

যদি স্বপ্ন বিক্রি হতো,
যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেতো
সুখের স্বপ্ন আর দুঃখের স্বপ্ন
আনন্দের স্বপ্ন আর বেদনার স্বপ্ন
যদি রাস্তায় রাস্তায় 'স্বপ্ন চাই' বলে
হেঁকে বেড়াতো ফেরিওয়ালা—
তুমি তার কাছ থেকে কিরকম স্বপ্ন কিনতে ?

কবির এই জটিল প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। অন্য এক কবি তাঁর এক বহুবিদিত পংক্তিতে বলেছিলেন, 'আমাদের মধুরতম সঙ্গীতগুলি করুণতম দুঃখের কথা বলে।'

স্বপ্নের পক্ষে অবশ্য মধুর হওয়া কঠিন। স্বপ্ন স্বপ্নই, দিনের আলোয় সেটা চুরমার হয়ে মিলিয়ে যায়। সুখস্বপ্ন বলে কিছু নেই, সব সুখস্বপ্নই হারিয়ে যাওয়ার অথবা না পাওয়ার দীর্ঘনিঃশ্বাসে ভরা।

স্বপ্নের কোনো বিকল্পও নেই। বাংলা কিংবা ইংরাজী, কোনো অভিধানেই স্বপ্ন কিংবা ড্রিম (Dream) শব্দটির কোনো প্রকৃত প্রতিশব্দ পাওয়া যাবে না, শুধু একটু ইনিয়ে-বিনিয়ে মানেটা ব্যাখ্যা করা আছে। রাজশেখরবাবুর চলন্তিকায় স্বপ্ন শব্দের অর্থ দেওয়া আছে 'নিদ্রাবস্থায় মনের ক্রিয়া'। সি ও ডি অর্থাৎ কন-সাইজ অক্সফোর্ডে বলা হয়েছে vision।

স্বপ্ন কবিতার কাছাকাছি একটা ব্যাপার। কবিতার মতোই স্পষ্ট অস্পষ্ট বাস্তব অবাস্তব, স্বপ্ন এই পৃথিবীর মধ্যে অন্য এক পৃথিবী। ধরা-ছোঁয়ার খুব কাছে, কিন্তু বাইরে।

স্বপ্ন নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের অন্ত নেই। মনোবিজ্ঞানী থেকে বুজরুক জ্যোতিষী সবাই স্বপ্নের কারবারি, স্বপ্নের ব্যাখ্যাদার। পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা বোধহয় নেই, যে ভাষায় স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে গ্রন্থ নেই।

স্বপ্ন নিয়ে তত্ত্বের কথা থাক। কবিতার কথাও আপাতত মুলতুবি। স্বপ্ন নিয়ে একটা রূপকথার কাহিনী। হিমানী নামে একটি মেয়ের কাহিনী।

হিমানী খুব স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে।

কত রকমের যে স্বপ্ন দেখে হিমানী, পাহাড়ের স্বপ্ন, সমুদ্রের স্বপ্ন, নদীর স্বপ্ন, নৌকার স্বপ্ন।

কোনো দিন কোনো নৌকায় চড়েনি হিমানী, তবু সে কখনও কখনও নৌকার স্বপ্ন দেখে, অচেনা নদীর কালো জলে ছোট ডিঙি নৌকায় দুলতে দুলতে স্বপ্নের মধ্যে মালতী ভেসে যায়, তীরে আসে।

শেষ রাত্রের দিকে যখন বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে, কালো জামদানির

ঘোমটা খুলে নীলাম্বরীর ওড়নায় মুখ ঢাকে আকাশ, যখন দূরের তারাগুলোকে শিশিরবিন্দুর মতো দেখায়। উঠোনের সিঁড়ির পাশে অযত্নের তৃণদলের শিষের ওপরে শিশিরবিন্দুগুলোকে দূর আকাশের তারার মতো দেখায়, তখনই আশ্চর্য সব স্বপ্ন এসে ভিড় করে হিমানীর চোখের পাতার নিচে। সারা রাতের ঘন গভীর ঘুমের শেষে তখন হালকা আমেজ মেশা তন্দ্রায় দূরের নীল পাহাড়ের স্বপ্ন দেখে হিমানী, ঊর্মিচপল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখে, নদী আর নৌকা তো রয়েছেই। রয়েছে আরও কত কি ?

স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে হিমানী।

দিন আর রাতের মধ্যেকার সামান্য একটু আবছায়া, রহস্যময় সময় হিমানী স্বপ্নের ঘোরে থাকে।

স্বপ্নের মধ্যেই থাকে। তার বাইরে যাওয়ার সাহস নেই তার। স্বপ্নের ভিতরে ডিঙি নৌকায় মাঝেমধ্যে একটুখানি ভেসে গেলেও, স্বপ্ন ভাঙার আগেই যথাস্থানে ফিরে আসে হিমানী। তারপর ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে যথারীতি জীবন। আবার পরের দিন প্রদোষের জন্য প্রতীক্ষা। স্বপ্নের জন্যে প্রতীক্ষা। সামান্য কিছুক্ষণ স্বপ্নের মধ্যে ভেসে তারপর ফিরে আসা।

কিন্তু একদিন স্বপ্নের ভেতর থেকে হিমানী আর ফিরে আসতে পারল না।

কোথায় যে সে চলে গেল কে জানে ?

কয়েকদিন হলো স্বপ্নের মধ্যে এক রাজপুত্র দেখা দিচ্ছিলো হিমানীকে। কি সুন্দর দেখতে সেই রাজপুত্র। লম্বা, ফরসা, বাঁশির মতো নাক, পটল-চেরা চোখ, মাথায় সোনার মুকুট, তাতে হীরে মুক্তো বসানো, গায়ে জরির পোশাক, রুপোর নাগড়া পায়ে।

শেষ রাতের আকাশ যখন কালো জামদানির ঘোমটা খুলে নীলাম্বরী ওড়না পরে, তখন সে আসে। কখনও দূর নীল পাহাড়ের ঢাল ভেঙে ধুলো আর পাথর কুচি উড়িয়ে সাদা ডানা লাগানো সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে নেমে আসে স্বপ্নের রাজপুত্র।। কখনও সে আসে ময়ূরপঙ্খী সোনালী জাহাজে চড়ে সাগরের ঢেউয়ে দুলতে দুলতে হাজার রঙের নিশান উড়িয়ে।

ছোট নদীর সেই ডিঙি নৌকা, সেটা এখন স্বপ্নের এক পাশে পড়ে থাকে। তাতে আর ওঠা হয় না হিমানীর। সে শুধু অবাক হয়ে দেখে কোনোদিন রাজকুমারের পক্ষীরাজ ঘোড়া, কোনোদিন রাজকুমারের ময়ূরপঙ্খী জাহাজ আর কোনোদিন শুধু রাজকুমারকে।

এক একদিন রাজকুমার খুব কাছে আসে, একেবারে হিমানীর বিছানায়, বালিশের পাশে চলে আসে। তন্দ্রার মধ্যে হিমানীর ঠোঁটে গালে লাগে ঘোড়ার নাকের গরম নিঃশ্বাস, ময়ূরপঙ্খী জাহাজের রঙিন পালের শীতল বাতাস।

হিমানীকে রাজকুমার শিয়রে এসে 'এসো', 'এসো' বলে ডাকে, হিমানীর কেমন ভয় হয়, তার সাহস হয় না রাজকুমারের সঙ্গে যেতে। চোখ শক্ত করে বন্ধ করে, হিমানী বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে দিনের সব আলো জানলা দিয়ে হিমানীর চোখেমুখে, বিছানায়

এসে পড়ে। পক্ষীরাজ ঘোড়া আর ময়ূরপঙ্খী জাহাজ নিয়ে রাজকুমার ফিরে যায়।

হিমানী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। হাতমুখ ধোয়। আর একটা দিন শুরু হয়।

কিন্তু একদিন ব্যতিক্রম তো হবেই।

তাই হলো।

সেদিন সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া। হিমানীর ঘরের বন্ধ জানলার কাঁচে সারারাত নিরবচ্ছিন্ন ঝিরঝির ঝিরঝির করে শব্দ। সেদিন আর আকাশের তারা নেই, ঘাসের শিষে শিশিরবিন্দুও নেই। আকাশ পৃথিবী বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে একাকার।

আজও হিমানীর স্বপ্নে রাজকুমার এলো। শেষ রাতে বৃষ্টি যখন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে, বাতাস যখন আরও বেশি সোঁ সোঁ করে আওয়াজ করছে, রাজকুমার হিমানীকে এসে জড়িয়ে ধরলো। তারপর সে কোনো কিছু টের পাওয়ার আগে সাদা ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল তাকে। ছুটে চললো ঘোড়া পাখা মেলে। বৃষ্টিতে রাজকুমারের জামাকাপড়, জরির ঝলমলে পোশাক কিছুই ভিজছে না, এমন কি ঘোড়ার গায়ের লোম পর্যন্ত ভিজছে না।

অঝোর বৃষ্টির মধ্যে হিমানীকে কোলে তুলে উড়ে চলেছে রাজকুমার। হিমানীর গায়েও একফোঁটা বৃষ্টির জলের ছোঁয়া লাগছে না। কেমন ভয় লাগলো হিমানীর, সে তার স্বপ্নের রাজকুমারের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছ?' প্রশ্ন শুনে রাজকুমার অবাক হয়ে বললো, 'আমি কি করে বলব? এ তো তোমার স্বপ্ন, তুমিই জান কোথায় যাচ্ছ?'

স্বপ্নের রাজকুমারের কোলে সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে এখন হিমানী যেখানে ইচ্ছে যাক, তার রূপকথার পৃথিবীতে সে যতক্ষণ থাকতে পারে থাকুক, ইতিমধ্যে স্বপ্ন নিয়ে অন্তত দুটো গরম গল্প বলি।

দুটোই দাম্পত্য কাহিনী। অনেকদিন আগে দুই জায়গায় দুই সূত্রে লিখেছিলাম গল্প দুটো, এবার একত্র করছি।

স্বভাবতই এবং স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ স্বামী-স্ত্রী একই শয্যায় শয়ন করেন এবং সেই হেতু একই স্বপ্নের তারা অংশীদার।

সে যা হোক একটি গল্প একটু সরল, সেটাই আগে বলি। স্বামী সারারাত ঘুমের মধ্যে 'জলি' 'জলি' করে কাকে যেন ডেকেছেন, খুঁজেছেন। বলাবাহুল্য জলি সহধর্মিনীর নাম নয়। সুতরাং ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে সারারাত স্বপ্নের মধ্যে 'জলি-জলি' করলে, জানতে পারি কি জলিটা কে?'

স্বামী বেচারা থতমত খেয়ে গিয়ে দুবার ঢোঁক গিলে বললেন, 'আরে না না, তুমি যা ভাবছ তা নয়, জলি কোনো মেয়েছেলে-টেলের নাম নয়, জলি হলো একটা রেসের ঘোড়া, কাল রেস খেলতে গিয়েছিলাম না, ঐ জলির ওপরেই বাজি ধরেছিলাম।'

তখনকার মতো স্বামী পার পেয়ে গেলেন। একটু পরে স্বামী বাথরুমে দাড়ি

কামাতে গেছেন এমন সময় একটা ফোন এলো। স্ত্রী ধরলেন সেই ফোনটা, তার পর ফোনটা নামিয়ে বাথরুমে গিয়ে স্বামীকে বললেন, 'কাল যে রেসের ঘোড়াটার ওপরে তুমি বাজি ধরেছিলে, ঐ যে তোমার জলি নামের ঘোড়াটা, সেই ঘোড়াটা তোমাকে ফোনে ডাকছে।'

এবার জটিল গল্পটিতে যাই। গল্পটি ছোট কিন্তু মারাত্মক।

মধ্যরাতে বৌ ঘুম ভেঙে উঠে পাশে শায়িত ও নিদ্রিত স্বামীকে বুকে-পিঠে দমাদম ঘুষি মারতে লাগল। স্বামীর প্রহৃত হওয়ার অভ্যাস আছে, কিন্তু এরকম অতর্কিতে ঘুমের মধ্যে মার খেয়ে সে বেচারা ঘাবড়িয়ে গেল। কেবল চেঁচাতে লাগল, 'কি হলো, আমার কি দোষ, আমি কি করলাম?'

ইতিমধ্যে প্রহারকারিণী ক্লান্ত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে, স্ত্রীর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে স্বামী প্রশ্ন করল, 'বলো না কী হয়েছে। কাঁদছ কেন? মারলে কেন?'

এই প্রশ্নে ফোঁপানি থামিয়ে স্ত্রী বলল, 'আমি যদি আর কখনও স্বপ্নে দেখি যে, তুমি অন্য কোনো মেয়েকে আদর করছ, তাহলে আমি সুইসাইড করব, আত্মহত্যা করব।'

এরকম একটি মারাত্মক কাহিনী দিয়ে রম্য নিবন্ধ শেষ করা উচিত হবে না, বিশেষ করে যে নিবন্ধের নাম 'স্বপ্ন'।

কবিতা দিয়ে শুরু করেছিলাম, কবিতা দিয়েই শেষ করি। মূল কবিতাটি নিতান্ত স্বপ্নময়, লেখক উইলিয়ম বাটলার ইয়েটস। আমার প্রথম অনুবাদ সামান্য কয়েক পংক্তি নিবেদন করছি ঃ

আমি নিতান্ত দরিদ্র
আমার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নেই।
আমার সেই স্বপ্নগুলি
আমি তোমার পায়ের তলায় বিছিয়ে দিয়েছি,
তুমি একটু সাবধানে যেও,
দেখো আমার স্বপ্নগুলো
তোমার পা দিয়ে মাড়িয়ে দিও না।

কলকাতা তিন হাজার তিনশ

কলকাতার বয়স যে মাত্র তিনশ বছর এ কথা আমি স্বীকার করি না, বিশ্বাস তো করিই না। পণ্ডিতেরা যে যাই বলুন কোনও পণ্ডিতের, কোনও ঐতিহাসিকের সঙ্গেই এ বিষয়ে আমি একেবারেই একমত নই।

তাতে অবশ্য পণ্ডিত মহোদয়দের কিছু এসে যায় না। তাঁরা মনের আনন্দে সভা করে যাচ্ছেন, বক্তৃতা করছেন, বড় বড় সুগম্ভীর তথ্যমূলক প্রবন্ধ লিখছেন দৈনিকের ক্রোড়পত্রে, নামীদামী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায়। সেসব সংখ্যা অলঙ্করণ করেছেন বড় শিল্পীরা, কি চমৎকার সেইসব ড্রইং। জব চার্নক থুড়ি জব হবে না,

আমাদের বাল্যকালের জব চার্নক ইতিমধ্যে জোব চার্নক হয়ে গেছেন। তা সেই জোব সাহেব কলকাতার গঙ্গার ঘাটে পদার্পণ করছেন বটতলায়, কি আশ্চর্য সেই বটগাছ যার পাতাগুলো একেবারে আমপাতার মত আর আলখাল্লা পরা চার্নক হুবহু ইতিহাস বইয়ের নানা সাহেবের মত দেখতে।

এদিকে হে-কলকাতা, আহা কলকাতা, ওগো কলকাতা আ-মরি কলকাতা, কলকাতা-কলকাতা সর্বসমেত কাল দুপুর পর্যন্ত এক হাজার সাতশ বত্রিশটা গান ও আবৃত্তির ক্যাসেট বেরিয়েছে। গায়ক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, আমলা, অধ্যাপক, সবাই প্রাণপণ কলকাতা তিনশ-র পিছনে দৌড়চ্ছেন।

দৌড়চ্ছেন মানে সত্যিই দৌড়চ্ছেন, লিটারালি দৌড়চ্ছেন। শ্যামবাজারের পাঁচমাথার নেতাজির মূর্তি থেকে সল্ট লেক, গোল পার্ক থেকে রবীন্দ্রসদন প্রবল বৃষ্টিতে, ঘোর ঠাণ্ডায়, প্রখর রৌদ্রে রাস্তার যানবাহন তুচ্ছ করে, জীবন বিপন্ন করে বৃদ্ধ ঐতিহাসিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়চ্ছেন প্রবীণ কবি। দুজনেই কলকাতার জন্যে দৌড়চ্ছেন, সবাই কলকাতার জন্যে দৌড়চ্ছে।

কেউ খেয়াল করছেন না কলকাতার কোনও বয়েস থাকতে পারে না। কোনও জায়গারই কোনও আলাদা বয়েস নেই, সব জায়গাই পৃথিবীর সমান বয়েসী।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমি একটা অনিয়মিত পত্রিকায় যথাসাধ্য নিয়মিত লিখতাম। তখনও কলকাতা তিনশ-র হুজুগ ওঠেনি। কিন্তু সেই সম্পাদক মহোদয়ের ঘটে কিছু বুদ্ধি ছিল, তাঁর কাগজের নাম ছিল কলকাতা দুহাজার। অবশ্য এখন আমি যদি কোনও কাগজ করি তবে ঠিক করেছি যে তার নাম দেব কলকাতা।

১০,০০,০০,০০,০০০,০০০ অর্থাৎ কলকাতা দশ অক্ষৌহিণী।

কলকাতার উল্লেখ যে আবুল ফজলের আইন-ই আকবরী গ্রন্থে রয়েছে, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে যে গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতার কথা বলা আছে কলকাতা তিনশ-র কল্যাণে এবং সংবাদপত্রসহ অধ্যাপক মহোদয়, মাস্টারমশাইদের দৌলতে সেসব খবর সবাই জানে। এসব থলেপচা বিষয় নিয়ে আমার কিছু লেখার ইচ্ছে নেই, যোগ্যতাও অবশ্যই নেই।

কিন্তু আমি যাব আরও পিছনে। কলকাতা যে কত পুরনো সেটা প্রতিপন্ন করার জন্যে আমার তূণীরে আছে দুটি অব্যর্থ শর।

প্রথম শরটি সংক্ষেপে নিক্ষেপ করি।

নবদ্বীপবাসী প্রাচ্য বিদ্যার্ণব জ্ঞানেন্দ্রনাথ তর্কবাচস্পতির কাছে আমি স্বয়ং একথা শুনেছি। সবাই নিশ্চয় অবগত আছেন সংস্কৃত ভাষায় বা পুরাণ সাহিত্যে আমার দখল অপরিসীম নয়। সুতরাং এটা শোনা কথা।

তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমাকে যা বলেছিলেন তা আমার মত অভাজনের পক্ষে যাচাই বা পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়, যেরকম শুনেছি তাই লিখছি।

বাচস্পতি মহোদয়ের মতে কলকাতার তিনশ বছর বয়েস ব্যাপারটা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কলিকাতা কথাটা আসলে কালিকাতা। কালী, কালিকা, কালিকাতা।

কালিকাতা নামে কারও কোনরকম সংশয় থাকা উচিত নয় কারণ সত্যিই তো কোনও জায়গার কোনও বাঁধা নাম নেই। চোখের সামনেই তো পিকিং, ফেচিং, বেজিং, ভেটজিং হয়ে গেল। ভাইজাগ হল বিশাখাপত্তনম। বোম্বাই, বোম্বে, দ্রুত মুমবাই হওয়ার দিকে এগোচ্ছে।

আর সত্যিই তো কলকাতার নামের অন্ত নেই। কলকাতার মত এমন জায়গা আর কোথায় আছে যার সাধুভাষায় আর চলিতভাষায় দুরকম নাম, কলিকাতা আর কলকাতা। বাঙালেরা বলে কইলকাতা।

ঢাকায় গেলে শিক্ষিত লোকেরা জানতে চান, 'কেলকাটা থেকে কবে আসলেন ?'

হিন্দুস্থানীরা বলেন 'কলকাত্তা'। ওড়িয়ারা খুব জোরের সঙ্গে বলেন 'কুলীকাতা'।

সাহেবদের তো কথাই নেই—ক্যালকাটা থেকে কালকুত্তা, একেক জাতের সাহেবের কাছে কলকাতার একেকরকম নামডাক।

তা এইসব নামের মধ্যে সবচেয়ে আদি নাম কালিকাতা। কালীঘাটের কালিকা মন্দির থেকে কালিকাতা, জন থেকে যেমন জনতা, শূন্য থেকে যেমন শূন্যতা, পূর্ণ থেকে যেমন পূর্ণতা,, মানব শব্দ থেকে যেমন মানবতা ঠিক তেমনভাবেই কালিকা শব্দ থেকে কালিকাতা।

কলিতীর্থ কালীঘাটের কালিকামন্দির আজকের ব্যাপার নয়, তিনশ বছরের ব্যাপারও নয়। সেই দক্ষযজ্ঞের পৌরাণিক যুগে পাগল শিব প্রমথেশ পিতৃগৃহে অভিমানে অপমানে দেহত্যাগকারিণী সতী পার্বতীর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে প্রলয় নাচন শুরু করেছিলেন, সৃষ্টি রক্ষা করার জন্যে স্বয়ং বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলেন, সেগুলো পৃথিবীর নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।

কালীঘাটে পড়েছিল সতীর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল। আমরা যখন কথায় কথায় কাউকে হেয় করার জন্যে বলি, 'তুই আমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নস।'

আমরা কী সাংঘাতিক কথা বলি তা কি আমরা জানি।

সে যা হোক, সেই দক্ষযজ্ঞ, মহাদেবের সেই প্রলয় নাচন সে কি আজকের কথা !

চার্নকের বাপঠাকুর্দা চৌদ্দপুরুষ তখন জন্মায়নি, সে তাদের চোদ্দ হাজার পুরুষ আগের কথা। চার্নক সাহেবের আদি পূর্বপুরুষেরা সেই টিউডর, নরমানেরা এমন কি স্যাক্সন বা ডেনেরা পর্যন্ত তখনও এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়নি।

তর্কবাচস্পতি মহোদয় আমাকে পরিস্কার করে বুঝিয়ে বলেছেন যে কালিকা-পুরাণই হল কালিকাতাপুরাণ। কালিকাপুরাণে যে বরাহ উপাখ্যান আছে, নরকাসুরের উপাখ্যান আছে সেসব যে কলকাতার পটভূমিতেই রচিত, বাচস্পতি মহোদয়ের মতে, সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়, এবং সেইজন্যেই কলকাতার বয়েস কালিকাপুরাণের চেয়ে কম নয়, কম হতে

পারে না।

মনে রাখতে হবে কালিকাপুরাণ যদিও ব্যাসাদি মুনি প্রণীত ব্রহ্মপুরাণ বা পদ্মপুরাণের মত মূল পুরাণ নয় একটি উপপুরাণ, তবুও তার প্রাচীনতা প্রশ্নাতীত।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমার মনের মধ্যে যেটুকু সংশয় বা প্রশ্ন উঠেছিল তা দূর হল ডক্টর বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার পরে। কলকাতার প্রাচীনতার সপক্ষে আমার তূণীরে দ্বিতীয় শরটি ডক্টর ভট্টাচার্যই দান করেছেন।

ডক্টর বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্য কোনও সামান্য কেউকেটা লোক নন। ইন্টার-ন্যাশনাল মহাভারত সোসাইটির তিনি প্রতিষ্ঠাতা, সভাপতি ও প্রাণপুরুষ। একশ দশ বাই তেত্রিশ গরচা চতুর্থ লেনে তাঁরই বসবার ঘরে আন্তর্জাতিক মহা-ভারত সমিতির হেড অফিস।

ডক্টর ভট্টাচার্য আমাকে যা বললেন তা নিতান্ত প্রণিধানোগ্য। মহাভারতের নাকি একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে যেটি কোনও বিশেষ কারণে বেদব্যাস মূল মহাভারত থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কাশীরাম দাস, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়রাও এই অংশটুকু মহাভারতে রাখতে সাহস পাননি।

সম্প্রতি ডক্টর ভট্টাচার্য দূরদর্শনে মহাভারতের প্রযোজক প্রমোদসম্রাট মিস্টার বি. আর. চোপরা সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছিলেন এই প্রক্ষিপ্ত অংশে, তিনি কথাও দিয়েছিলেন বিবেচনা করবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেননি।

ঘটনাটি মহাভারতের বনপর্বের শেষভাগের। বারো বৎসর বনবাসের পরে পাণ্ডবদের যখন এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময় এল তাঁরা গোড়াতেই বিরাটনগরে গিয়ে ছদ্মবেশে এক বছর কাটিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেননি। তাঁরা প্রথমে অন্যত্র, হস্তিনাপুর থেকে যতদূর সম্ভব থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয়নি।

ঘটনাটি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বলা প্রয়োজন। বনবাসের বারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার মুখে পাঞ্চালীসহ পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতবাসের স্থান ঠিক করার জন্যে গঙ্গার পশ্চিম তীর ধরে ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগোতে লাগলেন। তাঁরা শুনেছিলেন সাগরদ্বীপে গঙ্গার মোহনায় কপিল মুনির আশ্রম আছে এবং তার চারপাশে জনমানবহীন গহন সব জঙ্গল। পাণ্ডবেরা ভাবলেন এই একটা বছর ঐ জঙ্গলে কোনক্রমে অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে দেবেন।

গঙ্গার তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে এক অপরাহ্ণ বেলায় দ্রৌপদী ও পাণ্ডবেরা এমন জায়গায় এসে পেঁছালেন যেখান থেকে সাগরদ্বীপ খুব দূরে নয়। এখানে গঙ্গানদীর মূল ধারা থেকে একটা সংকীর্ণ শাখা বেরিয়েছে লোকেরা যাকে বলে কাটিগঙ্গা।

কাটিগঙ্গার পূর্বধারে ঘনবসতি গ্রাম-নগর, মন্দির দেবস্থান। কিঞ্চিৎ খোঁজ-খবর করে পাণ্ডবেরা জানতে পারলেন কাটিগঙ্গার পাড় দিয়ে কপিলমুনির আশ্রমে যাওয়াই নিরাপদ এবং পথও কিছুটা কম। তাঁরা গঙ্গা অতিক্রম করে

কাটিগঙ্গার পশ্চিমতীরে এসে পেঁছালেন। সেটা গ্রীষ্মকাল। কাটিগঙ্গা মাত্র পনের-বিশ হাত চওড়া, তাতে কোমরজলের বেশি জল নেই। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। অন্তত সেদিনের মত রাত্রিবাসের একটা জায়গা প্রয়োজন। তাছাড়া ওপারে কালিকামন্দির দেখা যাচ্ছে একটা, সেখানে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, ঢাকের বাজনাও শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, 'টাকডুমাডুম', সেই সঙ্গে পাঁঠার আর্তনাদ ব্যা ব্যা ব্যা। দ্রৌপদী মেষবলী দেখতে খুব ভালবাসেন। তিনি যে যজ্ঞ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন সেই যজ্ঞে পাঞ্চালরাজ একশ আটটি মোষ বলি দিয়েছিলেন, সেই জন্মলগ্ন থেকে দ্রৌপদীর পশুবলির ওপরে ঝোঁক।

বারো বছর বনবাসে পশুবলি দেখার খুব একটা সুযোগ দ্রৌপদী পাননি। কখনও ভীম গদার আঘাতে একটা বাইসন বা নীলগাই মেরে এনেছে, কখনও অর্জুন তীর দিয়ে হরিণ বা সম্বর মেরে এনেছে, নকুল ও সহদেব সাধ্যমত খরগোশ বা বন্য কুক্কুট শিকার করে গলায় মালার মত করে পরে এসেছে। কিন্তু রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আসার পর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর দ্রৌপদীর পশুবলি দেখা হয়নি।

আজ বলির বাজনা শুনে দ্রৌপদীর হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠেছে। তিনি যুধিষ্ঠিরের কাছে বায়না ধরলেন, 'ধর্মপুত্র আমি ঐ কালিকামন্দিরে গিয়ে মেষবলি দেখব।'

প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সাবধানী, ধুরন্ধর, বহুদর্শী লোক। একটা অচেনা জনপদের অচেনা মন্দিরে দল বেঁধে, ভাইবৌ নিয়ে হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা যাওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত কতটা নিরাপদ বিশেষত দ্রৌপদীর মত সুন্দরী গৃহিণী যেখানে সঙ্গে রয়েছে, তাই একটু চিন্তা করে তিনি ভীমকে অনুরোধ করলেন, 'মধ্যম পাণ্ডব, পাঞ্চালী ওপারের কালিকামন্দিরে মেষবলি দেখতে যেতে চাইছে, তুমি একটু ওপারে গিয়ে দেখ দেখি স্থানটা নিরাপদ কিনা?'

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পেয়ে মহাবলী ভীম 'যথা আজ্ঞা' বলে এক লাফে কাটিগঙ্গা পেরিয়ে ওপারে চলে গেলেন।

কিন্তু ওপারে যাওয়ার পরে ভীমের আচার আচরণে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবান্তর পরিলক্ষিত হল। এপারে দাঁড়িয়ে চার পাণ্ডব এবং দ্রৌপদী দেখলেন ভীম কাটিগঙ্গা পার হয়েই হঠাৎ হাতের গদা দিয়ে পাড়ের জমি মাপতে লাগলেন, এবং মুখে কি সব বিড়বিড় করতে লাগলেন।

ঘটনা দেখে যুধিষ্ঠির চিন্তায় পড়লেন, তাঁর কেমন খটকা লাগল, ভীমের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। এপার থেকে যুধিষ্ঠির চেঁচিয়ে বললেন, 'ভীমসেন অযথা বিলম্ব করছ। তাড়াতাড়ি কর। আমাদের জানাও যে আমরা ওপারে আসব কি না?'

এই কথা শুনে মাথার ওপরে গদা বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে রোষ কষায়িত লোচনে ভীমগর্জনে ভীমসেন বললেন, 'এদিকে এক পা বাড়িয়েছ তো একদম মাথা গদার এক আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব।'

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রমাদ গণলেন, সত্যিই তো বারো বৎসর বনবাসের কষ্টে তারপরে শেষ কয়দিনের পথশ্রমের ফলে মধ্যম পাণ্ডবের মস্তিষ্ক-বিকার দেখা দিয়েছে, তিনি তাড়াতাড়ি অর্জুনকে অনুরোধ করলেন, 'ধনঞ্জয়, তুমি একবার

ওপারে গিয়ে দেখ তো মধ্যম পাণ্ডব এরকম করছে কেন ?'

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ওপারে চলে গেলেন। তারপর যা কোনওদিন কখনও হয়নি ভীম অর্জুনকে দেখে তাড়া করে এলেন।

স্থিরচিত্ত অর্জুনও বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে ভীমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুজনে কাদার ওপরে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। দুজনেই দুজনকে বলতে লাগলেন, এ এলাকা আমার। শয়তান, তুই এখান থেকে ভাগ, না হলে আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। রীতিমত গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

দ্রৌপদীকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে বিমূঢ় যুধিষ্ঠির নকুল-সহদেব দুই মাদ্রীপুত্রকে নির্দেশ দিলেন ওপারে দৌড়ে গিয়ে ভীমার্জুনের বিবাদ মেটাতে।

কিন্তু নকুল-সহদেব ওপারে পৌঁছতে গোলমাল আরও বেড়ে গেল। এবার চার পাণ্ডবে শুরু হল তুমুল ধস্তাধস্তি, জাপটাজাপটি। এ ওকে মারে, ও তাকে মারে। ভীম লাথি মেরে ফেলে দেয় অর্জুনকে, নকুল ভীমের কেশাকর্ষণ করে, সহদেব ঘুষি চালাতে থাকে নকুলের ওপরে। খামচাখামচি, কামড়া-কামড়ি ভয়াবহ ব্যাপার, ছোটখাট কুরুক্ষেত্র একটা।

কাটিগঙ্গার এপারে দাঁড়িয়ে এই ভয়াবহ ভ্রাতৃকলহের তথা পতিকলহের দৃশ্য দেখে দ্রুপদনন্দিনী থরথর করে কাঁপতে লাগলেন, কিন্তু মহামতি যুধিষ্ঠির সর্বজ্ঞান, ত্রিকালদর্শী পুরুষ। তিনি মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে অপর প্রান্তে বিবাদরত ভ্রাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'ভালই হয়েছে, তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কর, দ্রৌপদী এখন থেকে আমার একার।'

এই কথা শোনা মাত্র ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এক দৌড়ে কাটিগঙ্গা পার হয়ে যুধিষ্ঠিরকে তাড়া করে এলেন। এসে দেখলেন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পাশে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। ইতিমধ্যে ভীম অর্জুন নকুল সহদেবের সম্বিৎ ফিরে এসেছে। তাঁরা যথেষ্ট লজ্জিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে জিভ কেটে স্বীকার করলেন, 'মহা অপরাধ হয়ে গেছে। ওপারে গিয়ে মাথার মধ্যে কিকরম হয়ে গিয়েছিল। কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে হিতাহিত বোধশূন্য হয়ে পড়েছিলাম। কি করছিলাম কিছুই বুঝতে পারিনি।'

তখন মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠির বললেন, 'তোমাদের কারও কোনও দোষ নেই। কাটিগঙ্গার ওপারে ঐ কালিকা মন্দির আর কালিকাপুরাণোক্ত দুর্দান্ত কালিকাতা নগরী। ওখানে গেলে মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সংকীর্ণমনা, স্বার্থপর হয়ে ওঠে। যে যার ভাগ গোছাতে ব্যস্ত থাকে। ভাইয়েরা ভাইয়ের সঙ্গে কলহে, মারামারিতে, বাদবিসম্বাদে মেতে ওঠে।'

এই বলে যুধিষ্ঠির নির্দেশ দিলেন, 'আর এক মুহূর্তও দেরি নয়। এই স্থান থেকে যত তাড়াতাড়ি যতদূর যাওয়া যায় ততই মঙ্গল।' দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব কালিকাতা নগরী বর্জন করে যে পথ ধরে এসেছিলেন সে পথ ধরে ফিরে গেলেন সেই রাতেই।

এই কাহিনী পুরোপুরিই আমার ডক্টর বিদ্যাসুন্দর ভট্টাচার্যের কাছে শ্রুত। তিনি আমাকে আরও দুটো তথ্য দিয়েছিলেন।

এক, এই ঘটনার কারণেই কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলা হয়।

এবং দুই, মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ভারতের সমস্ত রাজাই কোনও না কোনও পক্ষে লড়েছিল। বঙ্গদেশ লড়েছিল দুর্যোধনের পক্ষে।

কলকাতার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে এই মহাভারতীয় কাহিনী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু কালিকাতা তথা কলিকাতা তথা কলকাতা মহানগরী যে কৌরব-পাণ্ডবের আমলেও ছিল এ বিষয়ে নিশ্চয় কারও মনে অতঃপর আর কোনও সন্দেহ থাকছে না। অধ্যাপক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিকেরা যে যা ইচ্ছে বলুন, দুটো প্রমাণের মত প্রমাণ দিয়ে দিলাম।

মহাভারতের কথা
অমৃত সমান।
তারাপদ রায় কহে
শুন বুদ্ধিমান ॥

সমালোচনা

সমালোচককে সবাই ভয় পায়, হয়তো সমীহও করে কিন্তু মনের মধ্যে তাঁর কোন স্থান নেই, তাঁকে কেউ ভালোবাসে না। পছন্দ করে না। পৃথিবীর যে কোনো শহরে যাও, তুমি যাবেই কে তোমাকে ঠেকাবে, দেখবে শহরের বড় রাস্তায়, রাস্তার মোড়ে, পার্কে, ময়দানে কতরকম মূর্তি। সেই মূর্তিমানেরা জীবদ্দশায় কেউ ছিলো দেশনেতা, কেউ দার্শনিক, কেউ বা কবি, লেখক বা নাট্যকার। এমনকি কলকাতা ময়দানের শেষ প্রান্তে পায়ে ফুটবল সমেত প্রবাদপ্রতিম ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল মশায়ের মূর্তিও রয়েছে।

কিন্তু সমালোচক? আজ পর্যন্ত কোথাও কেউ কোনো সমালোচকের মূর্তি স্থাপিত হতে দেখেছে? তুমি নিশ্চয় দেখোনি। যাঁর সমালোচনা পাঠ করে লোকেরা উত্তেজিত হয়েছে, অস্থির হয়েছে, উত্তপ্ত হয়েছে, যাঁর সঙ্গে দেখা হলে তুমি পার্টিতে হেসে হেসে কথা বলেছো, যাঁর সামান্য স্তুতিতে তুমি মুগ্ধ, বিচলিত হয়ে গেছো তাঁর শোকসভায় তুমি যাওনি। তাঁর মূর্তি স্থাপনের প্রশ্নই আসেনি। প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকীতে খবরের কাগজে তাঁর ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়নি, যে কাগজে আমৃত্যু আড়াই কলম বাঁধা ছিলো তাঁর।

কেন?

তুমি জিজ্ঞাসা করছো 'কেন'?

আমি এ প্রশ্নের উত্তর দেবো না। অনেক, অনেকদিন আগে উত্তর অথবা সংকুচিত জবাব দিয়েছিলেন শ্রীমধুসূদন ওরফে মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মনে আছে:

'চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!'

মধুসূদনের এ আক্রমণের প্রতিপক্ষ ঠিক কোনো সমালোচক নন, তাঁর এই কবিতার নাম ছিলো ঃ

'কোনো এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া'

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী—৯৬ সংখ্যক কবিতা)

এর চেয়ে অনেক সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বনলতা সেনের শিশিরের শব্দের মতন, চিলের ডানার রৌদ্রের গন্ধের মতন শান্ত সমাহিত জীবনানন্দ কেন যে এত রূঢ় হয়েছিলেন কে জানে ? কবিতার নামই সমারূঢ়, সমারূঢ় শব্দের কোনো সমাসবিন্যাসে না গিয়ে সোজাসুজি বলা যায়

সমালোচক + রূঢ় = সমারূঢ়

আরেকবার সেই তিক্ত কবিতাটিকে স্মরণ করি। তোমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে এই ভেবে কবিতাংশ স্মরণ করছি ঃ

'বরং নিজেই তুমি লেখোনাকো একটি কবিতা—'
বলিলাম ম্লান হেসে···
কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই, চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি।
রাগ ও ক্ষোভের কথা থাক। বরং সমালোচকের গল্প বলি।

অল্প আগে এক বিখ্যাত সমালোচকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শৈলসুন্দর দার্জিলিংয়ের এক হোটেলে আমরা তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি ঘরে তিনদিন ছিলাম। বদলেয়ার থেকে যামিনী রায়, রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে ঢাকা থিয়েটার, উদয় শঙ্কর থেকে শ্রীমতী ইফফত আরাখান সবই তাঁর নখদর্পণে। তিনি জানেন না এমন কোনো সাংস্কৃতিক বিষয় নেই এবং সেই সব বিষয়ের কি কি খুঁত এবং ত্রুটি তাও তিনি খুব ভালোই জানেন। আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হই বা না হই তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, তাঁর শানিত এবং সুচিন্তিত মতামত তিনি আমাদের শোনাবেনই।

এ সবই সহ্য করা চলে কিন্তু ভয়াবহ কাণ্ড ঘটলো টাইগার হিলে।

তুমি তো জানো, দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলে সূর্যোদয় দর্শন মানবজন্মে অতিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। খুব ভোরবেলা উঠে সূর্যোদয়ের আগে টাইগার হিলে পৌঁছতে হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় আমরা জীপের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। সমালোচক ভদ্রলোক বললেন তিনি আমাদের সঙ্গী হতে চান আগামী প্রত্যুষ কালে শার্দূল পাহাড়ে (টাইগার হিল নয়) সূর্যোদয় দর্শনে। শার্দূল পাহাড় না হয় মেনে নেয়া গেলো কিন্তু পরদিন ঊষাকালে যখন আমরা মুগ্ধ, বিমোহিত হয়ে সূর্য ও পাহাড়ের রৌদ্রকিরণ ও বরফের অপূর্ব রঙের খেলা দেখছি, নির্বাক হয়ে সবাই পূর্ব দিগন্তে তাকিয়ে আছি, সহসা হিমালয়ের সেই পরম মৌনতা ভঙ্গ করে সমালোচক বললেন, আচ্ছা আপনাদের কি মনে হয় ? নিচের দিকে ঐ সোনালী রং, ওটা আরেকটু হালকা হলে ভালো হতো না ?

পুনশ্চ ঃ তাঁর নাম বলবো না, বলা যাবে না, বলা উচিত হবে না। কিন্তু তুমিও তাঁকে জানো। তাঁর আঁকা ছবি তোমার বাইরের ঘরের দেয়ালে টাঙানো আছে।

বেশ কিছুদিন আগে সেই স্মরণীয় চিত্রশিল্পী বিগত হয়েছেন। এখন তাঁর নাম উল্লেখ করেও তাঁর কথা বলা যায়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, এক চিত্রপ্রদর্শনীতে। তখন তাঁর চোখে ছানি পড়েছে। ভালো দেখতে পান না। সে বছরও বার্ষিক প্রদর্শনীতে তাঁর বেশ কয়েকটি ছবি টাঙানো হয়েছে।

আমাকে তিনি চিনতেন। তাঁর সঙ্গে প্রদর্শনীতে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলো, স্বভাবতই জানতে চাইলাম, 'এখনো ছবি আঁকছেন, চোখে দেখতে পাচ্ছেন ?'

তিনি মধুর হেসে বললেন, 'এখনো কিছুটা দেখতে পাচ্ছি। যেদিন একদম দেখতে পাবো না, তোমার কোনো কোনো বন্ধুর মতো সমালোচক হয়ে যাবো।'

নিবন্ধ শেষে অন্য একজনের কথা বলি, তিনি সমালোচক নন, ঠিক তার বিপরীত। তাঁর কোনো কথায় কেউ কখনো আহত হয়নি। তাঁর মুখে কেউ কখনো কোনো রূঢ় কথা শোনেনি। শুধু রূঢ় কথা নয় তিনি এমনিতে কথাই কম বলেন। তা প্রশ্ন করেছিলাম আপনার এই মিত এবং মিষ্ট ভাষণের রহস্যটা কি ? তিনি বলেছিলেন, 'প্রত্যেকটা কথা বলার আগে আমি একবার নিজের মুখের মধ্যে শব্দগুলো চেখে নিই, ভালো এবং সুস্বাদু না মনে হলে নিজেই গিলে ফেলি।'

কুকুর ও বিয়ার

এ গল্প কুকুরের গল্প। কুকুরের বিয়ারপানের গল্প। তবে গল্প খুব ছোট, তার আগে বিয়ারের অন্য কথা একটু বলি। রসরাজ বলেছিলেন,

'আমি আর গুরুদেব
যুগল ইয়ার,
বিনির বাড়িতে গিয়া
খেতেম বিয়ার।'

এই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি স্মৃতি থেকে তুলে আনতে একটু বোধহয় ঘুলিয়ে গেল। তা যাক।

সে গুরুদেবও নেই, সে বিনিও নেই। আর বিয়ারও যথেষ্ট দুর্লভ। গুরুদেব কবে শ্বেত দ্বীপে পাড়ি দিয়েছেন, শ্বেতাঙ্গিনীদের নিয়ে তাঁর আশ্রম ভালই চলছে। আর বিনিও এই দুঃখীর দেশ ছেড়ে বিলেতে হাউস অফ কমনসে গিয়ে নাকি গবেষিকার কাজ নিয়েছে। এখন রাজারাজড়া শ্বেত কাউন্টদের সঙ্গে তার রঙ্গতামাশা, ওঠাবসা-শোয়া।

আর বিয়ার ? বিয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে আরও বাড়ছে, আরও বাড়বে। বাড়ছে, বাড়বে। গত বছর এই রকম সময়ে একটি চমৎকার কার্টুন এঁকে, 'ছিঃ ছিঃ' করে কুট্টি আজকালের পাতায় বিয়ারের মূল্যবৃদ্ধিকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

ইচ্ছে করলে সম্পাদক মহোদয় সেই কার্টুনটি এ বছরেও পুনর্মুদ্রণ করতে

পারেন। সামনের বছরও এই সময়ে করতে পারবেন। প্রত্যেক বছরই বিয়ারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, যাবে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। এর থেকে সহজ ভাবে শুল্ক আদায় আর কোথাও সম্ভব নয়।

আমরা বড় হয়েছিলাম সোনালি ঈগলের তিন টাকার যুগে। সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, হিমশীতল, তিক্তমধুর সফেন পানীয়ের আস্বাদে অভ্যস্ত হতে আমাদের মফঃস্বলী ঠোঁটের অনেকদিন লেগেছিল, যেমন প্রথম প্রথম লেগেছিল কফির বেলায়।

* * * *

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—ভদ্রলোক বাঙালীর তিনটি বিষয়ে অহংকার খুব বেশি। এক তার ইংরেজী জ্ঞান, প্রত্যেকেরই ধারণা তার মত ইংরেজী কেউ লিখতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে শ্বশুর এবং বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাদের থেকে ভাল ইংরেজী শুধু তাদের শ্বশুর কিংবা বাবা লিখতে পারে, আর কেউ পারে না।

এর পরেই হল গাড়ি চালানো। যে সব বাঙালী ভদ্রলোকের গাড়ি আছে এবং নিজে চালায় তাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে ধারণা যে তার চেয়ে ভাল গাড়ি জগৎ-সংসারে আর কেউ চালাতে পারে না। পারবে না।

তৃতীয় হল বিয়ার। বিয়ার পান নয়, বোতল থেকে বিয়ার গ্লাসে ঢালা। যে দুচারজন বিয়ারপায়ী বাঙালী এই দুর্মূল্যের বাজারে এখনও বিয়ারে আসক্ত রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে তার চেয়ে ভাল বিয়ার ঢালতে কেউ পারে না।

সে যে কি চূড়ান্ত কসরৎ, যোগব্যায়ামের কোন মার্গে উঠলে এই কৃতিত্ব, এক বিন্দুও বিয়ারের ফেনা উপচিয়ে পড়তে না দিয়ে বোতল থেকে ফেনিল বিয়ার গেলাসে ঢেলে টইটম্বুর ভরে ফেলা, এই অসাধারণ ক্ষমতা কত দিনে আয়ত্ত করা যায় তা আমার জানা নেই। গেলাস, বোতল এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শরীর একই সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত করে তিল তিল করে প্রতিটি ফেনাকে বিয়ারবিন্দুতে রূপান্তর করার যে সাধনা, প্রত্যেক বিয়ারসেবীর ধারণা সেই সাধনায় সে একাই সিদ্ধিলাভ করেছে।

কিন্তু শ্যাম্পেনের যেমন বিয়ারের ক্ষেত্রেও তাই, তার ফেনিল উচ্ছলতা তাতে যদি একটু বিয়ার নষ্ট হয় হোক, তবু সেই উপচিয়ে পড়ার মধ্যে যে মাদকতা আছে তা পান করার মাদকতার চেয়ে কিছু কম নয়।

অনেকের কাছে গ্রীষ্মের দুপুরে ঠাণ্ডা বিয়ার এক অমৃত আসব, স্বর্গীয় পানীয়। বিয়ার সম্পর্কে আমার যে স্মৃতি আছে সে এক তুষারশীতল সন্ধ্যার। ওয়াশিংটন ডি সিতে এক বিপদগামী মার্কিন প্রৌঢ়ের পাল্লায় পড়েছিলাম। মধ্য জানুয়ারির ঠাণ্ডা হিম রাত্রি, হঠাৎ তুলোর আঁশের মত হাল্কা বরফপাত শুরু হল। সেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গেলেন শহর থেকে দূরে একটি আইরিশ বারে। একটি ছোট প্রায়ান্ধকার ঘর, যার অর্ধেক দখল করে রেখেছেন অতিশয় স্থূলবপু মেমসাহেব।

সেখানে আইরিশ বিয়ার অর্ডার দেওয়া হল। রাতের অন্ধকারে অদূরবর্তী পটোম্যাক নদীর কালোজলের চেয়েও কালো সেই বিয়ার, ঘন ব্ল্যাক কফির চেয়েও কৃষ্ণতর সেটা। ঠাণ্ডা হিম, ডিপ ফ্রিজ থেকে বড় ক্যান বার করে মোটা কাঁচের গ্লাসে সেটা ঢেলে দেয়া হল। অন্য বিয়ারের মত তত ফেনা নেই। আর কি ভয়াবহ স্বাদ তার, নিমপাতা, কুইনিন, উচ্ছে সব একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন করে সরবত করলে যে রকম স্বাদ হবে তার চেয়েও মর্মান্তিক। সেই সঙ্গে চিলি সসেজ, কালো লঙ্কার গোলায় চোবানো ছোট ছোট সসেজ, একটা জিবে ছোঁয়াতে আপাদমস্তক ঝিনঝিন করে উঠল। যেমন বিয়ার তেমনি সসেজ, সেই বরফঝরা রাতকে মনে হয়েছিল ঃ খর নিদাঘের দ্বিপ্রহর।

বিস্তারিত বিবরণে প্রয়োজন নেই। আসল গল্পটায় আসি। আমার অন্য গল্পের মতই এ গল্পটা পুরনো, বহুবিদিত, তবু না লিখলে অন্যায় হবে।

তারিখ দোসরা এপ্রিল রবিবার। আগের দিনই অন্যান্য মদের সঙ্গে বিয়ারের বাৎসরিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। বেলা দ্বিপ্রহর, চৌরঙ্গী রোডে সুরাভাণ্ডার নামক পানশালায় আজ ভিড় খুব কম, পুরনো ম্যানেজার জগাবাবু প্রায় একা একা বসে হাই তুলছেন।

এমন সময় একটা কুকুর প্রবেশ করল, সুরাভাণ্ডারে। সে বেশ সাব্যস্তের মত একটি চেয়ারে গিয়ে বসল এবং এক বোতল বিয়ার অর্ডার দিল। বেয়ারা গেলাস, বোতল নিয়ে এসে গেলাস ভরে বিয়ার ঢেলে দিয়ে গেল। কুকুরটি চুকচুক করে বিয়ার খেল। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে বেয়ারার কাছে বিল চাইল। বিল দেখে দাম মিটিয়ে যখন বেরোতে যাচ্ছে, ম্যানেজার জগাবাবু আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে কুকুরটিকে বললেন, 'স্যার, আজ প্রায় তিরিশ বছর মদের দোকানের ম্যানেজারি করছি, কিন্তু কোনদিন কোনও কুকুরকে বিয়ার খেতে দেখিনি।'

ম্যানেজারের কথা শুনে কুকুরটি বলল, 'আর দেখতেও পাবে না। এই শেষ। বিয়ারের যা দাম হয়েছে, কুকুরদের আর কি সাধ্যি যে বিয়ার খাবে।' এই বলে কুকুরটি রাস্তায় বেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বইমেলা

বইমেলা সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা তা নিতান্তই পাঠক বা ক্রেতার। কবি, লেখক বা গ্রন্থকার হিসেবে বইমেলায় প্রবেশ করার কোনো সুযোগ কখনো আমার হয়নি। লাইনে দাঁড়িয়ে কাউণ্টার থেকে টিকিট কেটে আর সকলের মত সারি দিয়ে বইমেলায় আমি ঢুকি। বইমেলার উদ্যোক্তারা, হয়তো সঙ্গত কারণেই, আমাকে কখনো গ্রন্থকার বা কবি হিসেবে খাতির করেননি।

তবে আমি থাকি বইমেলার মাঠের খুব কাছে। প্রতিদিনই সকালে এবং ছুটির দিনে বিকেলেও আমি আমার বৃদ্ধ সারমেয়টিকে নিয়ে এরই কাছাকাছি এলাকার ময়দানে বা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের চারপাশে শৌখীন ভ্রমণচর্চা করি।

ঐ কাছে থাকি বলেই বইমেলার সময়ে আমি প্রথম দিনে একসঙ্গে আট-দশটা প্রবেশপত্র ক্রয় করে রাখি। কারণ শেষের দিকে ভিড় বেড়ে যায়। তখন টিকিট কাটা যেন কঠিন হয়ে পড়ে, বহু সময় লাগে।

বিকেলের দিকে অফিস থেকে ফিরে একটু হাতমুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে ধীরেসুস্থে বইমেলাই পেঁছাই। বইমেলায় পেঁছে কিন্তু এই ধীরতা বা সুস্থতা থাকে না। ভিড়, চেঁচামেচি, হৈচৈ, হট্টগোল। বইমেলার মত এত ভিড়, এত ধুলো কলকাতার আর কোনো মেলাতেই হয় না, শেয়ালদার রথের মেলাতেও নয়।

বইমেলায় আমি যে খুব বইটই কিনি তা নয়। কারণটা খুবই সরল, বই-মেলায় যে কমিশনে বই বিক্রি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি কমিশন আমি কলেজ স্ট্রীটে পাই।

তবু বইমেলায় যাই। বই কিনেও ফেলি। সেগুলো একটু আলাদা ধরনের বই। হয়তো সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

আমার বই কেনার ব্যাপারটা অবশ্য সৈয়দ মুজতবা আলি কথিত ভদ্রমহিলার মত নয়। এই মহিলার কথা আমি নিজেও এর আগে লিখেছি, তবু এখানে তাঁকে আরেকবার স্মরণ করা হয়তো অন্যায় হবে না।

তবে এ যাত্রায় গল্পটা সংক্ষিপ্ত করে বলছি।

এক ভদ্রমহিলা একটা বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে, মানে যে রকম দোকানে মনিহারি, প্রসাধন দ্রব্য থেকে শুরু করে জামাকাপড়, ঘড়ি, কলম, বই-খাতা ইত্যাদি সব জাতীয় জিনিসপত্রই পাওয়া যায়, তাঁর স্বামীর জন্মদিনের জন্যে একটা উপহার কিনতে গিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা সিগারেট কেস দেখলেন, চপ্পল দেখলেন, নেকটাই দেখলেন, শার্ট, জরিদার পাঞ্জাবি সবই ঘুরে ঘুরে দেখলেন কিন্তু কিছুই তাঁর পছন্দ হলো না। দোকানের মালিক দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন. অবশেষে তিনি ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন।

যখন তিনি শুনলেন মহিলা তাঁর স্বামীর জন্য উপহার কিনতে এসেছেন, তিনি মহিলাকে বললেন, 'দাঁড়ান, আমি আপনাকে বেছে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে মহিলাকে রঙীন টেবিল ল্যাম্প, বেতের লাঠি, হাতির দাঁতের এলাচ রাখার বাক্স কত কি দেখালেন, কিন্তু মহিলা যা কিছুই দেখেন, বলেন, 'না ঠিক এই জিনিস আমার বরের একটা আছে।' দোকানী অবশেষে অপারগ হয়ে মহিলাকে বললেন, 'তা হলে বইয়ের সেকশনে যান, সেখান থেকে নতুন একটা বই নিয়ে যান।' এই পরামর্শ শুনে নির্বিকার ভদ্রমহিলা জবাব ছিলেন, 'বই চলবে না, আমার বরের বইও আছে একটা।'

এই গল্পর সমান্তরাল আরেকটা গল্পও বিদ্যাবুদ্ধি নাকি জ্ঞানগম্যিতে লিখেছিলাম। প্রায় একই ব্যাপার, জন্মদিনের উপহার ও বই নিয়ে সেই গল্প।

ঐ একই মহিলা একই দোকানে গিয়েছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, এবার একটা বই কিনতে গিয়েছেন। দোকানের সেই মালিক ভদ্রমহিলাকে দেখে এগিয়ে এলেন এবং যখন শুনলেন ইনি এবার বই কিনতে এসেছেন, তাঁর প্রায় মূর্ছা যাবার

যোগাড়, কোনো রকমে সামলে উঠে তিনি বললেন, 'সে কি ম্যাডাম, আপনি না সেবার বললেন, আপনাদের একটা বই আছে। আরেকটা বই কি কাজে লাগবে?' ম্যাডাম বললেন, 'আমার জন্মদিনে আমার বর একটা টেবিল ল্যাম্প দিয়েছে। সেটা ব্যবহার করার জন্যে আমার নিজের একটা বই চাই। আগের বইটা তো আমার বরের।'

বইমেলার, বইমেলার প্রকাশক, গ্রন্থকার এবং দোকানদারদের ভাগ্য ভালো যে ওই ভদ্রমহিলা কিংবা আমার মত খদ্দের বইমেলায় খুব বেশি যায় না।

বইমেলায় ধুলো ভরা কিংবা জল-কাদা ভরা উঠোনে গাদাগাদি রুদ্ধশ্বাস ভিড়ে পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়ায় চিরদিনের পাঠক। সে নির্বিচারে বইয়ের পাতা ওলটায়, নির্বিকারভাবে বই কেনে কিংবা কেনে না, লোলুপ দৃষ্টিতে চাটে শো কেসের নতুন বইয়ের আহ্লাদি মলাট।

মোটা কাঁচ, স্টিলের ফ্রেম, গোল চশমা রিটায়ার্ড মাস্টার মশাই হুমড়ি খেয়ে পড়বেন শালোয়ার কামিজ পরিহিতা ও কলেজের কিশোরী পাঠিকার গায়ে ; নবীন যুগের নবীন কবি মোটা আমলার নেকটাই ধরে ঝুলে পড়বে, 'দাদা, বলবে, একটা কবিতার বই।' গাঁজাভরা সিগারেট টেনে পৃথিবীর শেষ পাঠক বলবে, 'ধুৎ!' এই হলো বইমেলা।

বইমেলা নিয়ে কয়েক বছর আগে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম। মজার কথা এই যে কবিতাটির নাম ছিলো 'প্রতিবাদের কবিতা' এবং ঐ নামের একটি কাব্য সংকলনের জন্য কবিতাটি রচনা করেছিলাম। সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন মঞ্জুষ দাশগুপ্ত। কবিতাটি কঠিন নয়, আরেকবার নিবেদন করছি।

সে বছর বইমেলায়
ময়দানের শেষ প্রান্তের নিঃসঙ্গ বকুল গাছটির
ডালে ডালে পাতায় পাতায়
লাল নীল টুনি বাল্ব জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

বকুল গাছের সেটা মোটেই পছন্দ হয় নি।
এমনিই এত ভিড়, হট্টগোল
ধুলো আর ছেঁড়া কাগজ
এত ব্যর্থ পাঠক আর অসফল লেখক
এগুলো বকুল গাছ স্বভাবতই ভালোবাসে না।

তারপর ঐ লাল নীল আলো সবুজ পাতার মধ্যে
পুরো শীতকালটা
বকুলগাছ গম্ভীর হয়ে রইলো।
এমন কি যেদিন গভীর রাতে গভীর হাওয়ায়
ভিক্টোরিয়ার চূড়ায় কৃষ্ণপরী
অনেকদিন পরে ডানা মেলে ধরলো,

বকুল গাছ একবারের জন্যেও
মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো না।

শুধু পরের ফাল্গুনে
ময়দানের শেষ প্রান্তের সবুজ ঘাস ছেয়ে গিয়েছিলো
নিঃশব্দ প্রতিবাদের অনন্ত সাদা ফুলে।

* * * *

এই গুরুগুরু গম্ভীরগম্ভীর নিবন্ধটি শেষ করার মুহূর্তে আমার একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলি বইমেলা বিষয়ে।

একদিন বইমেলা ভাঙার পর বেরিয়ে আসছি। রাস্তায় ভিড়, লোকে লোকারণ্য, এমন সময় এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা। কেমন যেন চেনা-চেনা, কিন্তু কিছুতে মেলাতে পারলাম না।

ভদ্রমহিলাও আমাকে দেখেছেন, তিনি হাসিমুখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন, হাত তুলে নমস্কার করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমার থতমত ভাব দেখে চমকে গিয়ে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আমি বোধহয় ভুল করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম আপনি আমার এক বাচ্চার বাবা।'

ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম কিন্তু কিছু বলার আগেই তিনি ধুলো আর ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন এবং সেই মুহূর্তে মনে পড়লো অনেক দিন আগে প্রাইমারি ইস্কুলে আমার ছেলে একদা তাঁর ছাত্র ছিলো।

সাশ্রয়

এ গল্পটা তো সবাই জানে।

একটি ছোট ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে স্কুল থেকে বাড়ি এল। স্পষ্টই বোঝা গেল যে পুরো পথটা দৌড়ে এসেছে।

তার বাবা তার এই অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ব্যাপার খোকা? এত হাঁপাচ্ছ কেন?'

হাঁপাতে হাঁপাতেই খোকা বলল, 'জানো বাবা, এইমাত্র আমি সত্তর পয়সা বাঁচিয়েছি।'

স্বভাবতই পিতৃদেব সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করে?'

ছেলে বলল, 'আমি স্কুল থেকে ফেরার পথে বাসে না উঠে বাসের পেছনে পেছনে দৌড়ে এসেছি, তাই বাসভাড়া সত্তর পয়সা বেঁচে গেছে।'

ছেলের এই কথা শুনে বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'ও, এই তোমার বুদ্ধি? তা দৌড়েই যখন এলে বাসের পিছনে না দৌড়িয়ে একটা ট্যাক্সির পিছনে দৌড়িয়ে এলে অন্তত পাঁচ-ছয় টাকা বাঁচাতে পারতে।'

এ ধরনের সাশ্রয়ের বুদ্ধি খুব অস্বাভাবিক নয়।

সংসারী লোকেরা জানেন, সাশ্রয় করার একটা উপায় হল নিয়মিত আয়ব্যয়ের হিসেব রেখে বাজেট করে চলা।

অবশ্য এই হিসেব রাখার ব্যাপারটা খুব ক্লান্তিকর ও একঘেঁয়ে, তা ছাড়া সময় সাপেক্ষও বটে। একবার এক দম্পতি কবুল করেছিলেন যে সারাদিনের হিসেব মেলাতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর পুরো সন্ধ্যাটা ব্যয় হয়ে যায় ফলে আর বাইরে কোথাও বেরনো হয়ে ওঠে না, সিনেমায়, রেস্টুরেন্টে কোথাও যেতে পারি না, হিসেব মেলানোর ধান্দায় পয়সাও সাশ্রয় হয়।

একটা মার্কিন দেশীয় গল্প মনে পড়ছে। মার্কিন মুলুকের একটা ছোট শহর, এই শহরের লাগোয়া একটা নিজস্ব কবরখানা আছে শহরের অধিবাসীদের জন্যে।

একবার শহরের অধিবাসীদের এক সভায় অনেক আলোচনা করে ঠিক করা হল যে কবরখানাটা একটু বড় করতে হবে কারণ কবরখানাটা প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। আর বেশি কবরের জায়গা ফাঁকা নেই।

এই সময়ে এক বর্ষীয়ান নাগরিক সভা থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। সভা যথারীতি চলতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই প্রবীণ লোকটি ফিরে এলেন। এসে বললেন, 'দেখুন ওই যে ঘণ্টাখানেক আগে আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কবরখানাটা বড় করতে হবে, তার কোনও প্রয়োজন নেই।'

ভদ্রলোকের কথা শুনে সবাই অবাক। সভাপতি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি এ কথা বলছেন কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি এইমাত্র কবরখানার ফাঁকা জায়গাটুকু মেপে এলাম। তারপর হিসেব করে দেখছি যে এখন আমরা এই শহরের যত লোক আছি সবাই মারা গেলে যতটা জমি লাগবে কবরখানায় এখনও তার চেয়ে কিছু বেশি জমিই আছে।'

সাশ্রয় করার ব্যাপারটা অনেক সময়েই খুব গোলমেলে।

এক প্রবন্ধকার বলেছিলেন, 'আয় করতে যতটা কষ্ট হয়, ব্যয় করতেও যদি ততটা বা তার চেয়েও বেশি কষ্ট হয় তাহলে আর আয় করে লাভ কী?'

অন্য এক ভদ্রলোক অনেকদিন আগে বলেছিলেন কেনাকাটা করে কিংবা ব্যয় করে সাশ্রয় করার চেষ্টা মানেই হল টাকা খরচ করার আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

* * * *

মিতব্যয়িতা বিষয়ে আমরা সজ্ঞান হওয়ার পর থেকে, অতি বাল্যকাল থেকে মা-বাবা, গুরুজনদের কাছ থেকে মহাপুরুষদের কাছ থেকে বই থেকে উপদেশ পেয়েছি, খরচ সাশ্রয় কর, দুর্দিনের জন্যে সঞ্চয় কর। বর্ষার দিনের জন্যে জমাও।

পরে বড় হয়ে এবং অবশেষে এখন প্রায় বুড়ো হয়ে বুঝতে পেরেছি ব্যয় সাশ্রয় করার ব্যাপারটা আসলে প্রয়োজনের, কঠিন প্রয়োজনের সময় বহু কষ্টে হাত মুঠো করে, খরচ না করে থেকে অবশেষে সেই টাকা ব্যয় করা। অবশ্য কখনও কখনও

সঞ্চিত টাকা খুব প্রয়োজনেও লাগে, বিপদের দিনে উদ্ধার করে দেয়।

হাসির নিবন্ধে আবার বিপদআপদের কথা কেন।

বরং সাশ্রয়ের গল্পে দুয়েকজন কৃপণের গল্প বলা যেতে পারে। সেই যে কৃপণ সন্দেশ না খেয়ে সেই সন্দেশের ছায়া জলে ফেলে জলটা খেত সেই কৃপণকে নিয়ে একটা বিলিতি গল্প আছে।

কৃপণ ভদ্রলোক লন্ডনের রাস্তায় হাঁটছিলেন। এমন সময়ে সামনের দিক থেকে অন্য এক পথচারী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা আপনার কাছে কি একটা দেশলাই আছে ?'

এই প্রশ্ন শুনে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে এবং সতর্কতার সঙ্গে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে, কৃপণ ভদ্রলোকটি তাঁর পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করলেন।

দেশলাইটা পকেট থেকে বার করা মাত্র দ্বিতীয় ভদ্রলোক প্রায় খপ্ করে কৃপণ ভদ্রলোকের হাত থেকে দেশলাইটা ছিনিয়ে নিয়ে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে লাগলেন।

এই অচেনা ভদ্রলোকের আচার আচরণ দেখে কৃপণ ভদ্রলোক খুব বিস্মিত বোধ করলেন এবং ভাবতে লাগলেন, এ আবার কি জোচ্চরের পাল্লায় পড়লাম।

কিন্তু জোচ্চুরি তো নয়ই তার বদলে যা ঘটল সেটা অভাবিত। দেশলাইটি উলটে পালটে পরীক্ষা করে সেই ভদ্রলোক অতি অমায়িক হেসে বললেন, 'দেখুন এই যে টেক্কা মার্কা দেশলাই আপনি ব্যবহার করেন, এই কোম্পানির আমি একজন ডিরেক্টর। আমি রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়াই খুঁজে দেখবার জন্যে কারা আমাদের দেশলাই ব্যবহার করে, আর যেই তেমন লোকের সঙ্গে দেখা হয় সঙ্গে সঙ্গে তাকে দশ পাউন্ড (প্রায় দুশো পঞ্চাশ টাকা) দিয়ে দিই।'

এই কথা বলে ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা দশ পাউন্ডের নোট কৃপণ ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিলেন, এবং নিঃশব্দে টুপি তুলে মৌন ভদ্রতা জানিয়ে চলে গেলেন।

কৃপণ ভদ্রলোক হঠাৎ দশ পাউন্ডের একটা নোট পেয়ে হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন, জোচ্চুরির ব্যাপারটা, ঠকানোর ব্যাপারটা, তাঁর তেমন মাথায় খেলেনি, তাড়াতাড়ি দশ পাউন্ডের নোটটা কোর্টের ভেতরের পকেটে রাখতে রাখতে হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, আরে এই লোকটা তো দেশলাইটা নিয়ে চলে গেল।

ততক্ষণে টেক্কা কোম্পানির ডিরেক্টর ভিড়ের মধ্যে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর নিতান্ত হতাশ হয়ে কৃপণ ভদ্রলোক খেদোক্তি করলেন, 'শালা, দেশলাইটা মেরে নিয়ে গেল।'

কে তাঁকে বোঝাবে দশ পাউন্ডে হাজারটা, অন্তত হাজারটা দেশলাই হয়।

স্বামী-স্ত্রী

এবারের বিষয়ের নাম 'স্বামী-স্ত্রী'।

প্রথমে এক নবদম্পতির গল্প দিয়েই আরম্ভ করছি।

এক ভদ্রলোক নতুন বিয়ে করেছেন। বিয়ের পরে, যেমন হয়, তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো, তুমি যে এত সুন্দরী, তা তো আগে আমি বুঝতে পারিনি। বিয়ের আগে খেয়ালই হয়নি। এখন দেখছি তুমি রীতিমত ডাকসাইটে সুন্দরী।'

স্বামীর এই কথা শুনে স্ত্রী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সে কান্না আর থামে না। অঝোরে কেঁদে চলেছেন তিনি, তারই মধ্যে সামান্য বিরতি পেয়ে উদ্বেগান্বিত স্বামী স্ত্রীকে ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'ওগো কী ব্যাপার? কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কাঁদছ কেন? সুন্দরী হওয়ার সঙ্গে কাঁদাকাটির কী আছে?'

উত্তরে স্ত্রী বললেন, 'আমি যে এত সুন্দরী এ কথা তো আগে কোনওদিন কেউ আমাকে বলেনি, আগে যদি একথা জানতাম তা হলে কি তোমার মতো পাত্রকে আমি বিয়ে করতে রাজি হতাম।'

স্বামী-স্ত্রী বিষয়ে এর আগে অনেকবার অনেক রকম লিখেছি। আবার অনেকবার একই রকম লিখেছি।

তবু মনে হয় অনেক কথাই এখনও লেখা বাকি আছে, কিংবা আসল কথাটা হল স্বামী-স্ত্রীর মনে এমন অভাবনীয় বিষয়ে সব সময়েই কিছু না কিছু লেখার থাকবে, এই অনন্ত পাঁচালি কোনওদিন ফুরোবে না, ফুরোবার নয়।

এবার অনুপস্থিত স্ত্রী এবং উপস্থিত স্বামীর একটা গোলমেলে আখ্যান স্মরণ করি।

ব্যাপারটা নাটকীয়। নাটকের আকারেই বলছি।

স্বামী জনৈক বন্ধুকে অন্য এক বন্ধুর নাম করে বললেন, 'আজ থেকে জগার দুর্ভাগ্যের শুরু হল।'

এই কথা শুনে উক্ত জনৈক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ জগার দুর্ভাগ্যের শুরু হচ্ছে কী করে? কী করে আজকেই দুর্ভাগ্যের শুরু হচ্ছে?'

স্বামী গম্ভীর মুখে বললেন, 'আজকেই ও আমার স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়েছে।'

স্ত্রী-পালানো সব স্বামীই নিশ্চয়ই এভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবেন না।

লুম্বিনী পার্কের সেই গল্পটা আরেকবার বলি। তাঁরও নাম জগাবাবু। তিলজলা না কসবা, শহরতলিতে সেই ভদ্রলোক থাকতেন। একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরে দেখলেন স্ত্রী নেই, স্ত্রী পলাতকা। বাড়ির কিশোর হিন্দুস্থানি ভৃত্য বদন ব্যাদান করে সংক্ষিপ্তভাবে জানালো, 'মেমসাহেব ভাগ গিয়া।'

কখন ভাগ গিয়া, কার সঙ্গে ভাগ গিয়া, কেন ভাগ গিয়া এসব বিষয়ে সেই চাকরটি কোনও সদুত্তর দিতে পারল না। শুধু অনবরত দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে বাইরের বারান্দায় বসে থেকে তারপর বাথরুমে গিয়ে

ঘাড়ে মাথায় একটু জল দিয়ে জগাবাবু অনেক ভাবলেন। তারপরে কোনও কূল-কিনারা না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিকটবর্তী মানসিক চিকিৎসালয় 'লুম্বিনী উদ্যানে' গিয়ে অফিসঘরে ঢুকে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের হাসপাতাল থেকে আজ কোনও পাগল পালিয়েছে?'

অফিসের লোকেরা বললেন, 'অসম্ভব। হঠাৎ আমাদের এখান থেকে পাগল পালাবে কেন? আপনি এ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন কী জন্যে!'

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে জগাবাবু বলেছিলেন, 'দেখুন আমার বউকে নাকি কে নিয়ে পালিয়েছে। পাগল ছাড়া কে আর তাকে নিয়ে পালাবে? তাই আপনাদের কাছে জানতে এসেছিলাম আপনাদের এখান থেকে কোনও পাগল পালিয়েছে কিনা।'

এই গল্পের ঠিক অন্য প্রান্তের একটা গল্পও মনে পড়ছে।

স্বামী প্রত্যেক রবিবার বাইরে বাইরে আড্ডা দিয়ে বেড়ান। ছুটির দিনে, রবিবারে তাঁকে এক মুহূর্ত বাসায় পাওয়া যায় না।

হঠাৎ একদিন কী হলো। কোনও এক রবিবারে স্বামী বললেন, 'আজ আর বাইরে যাব না। আজ বাসাতেই থাকব।'

শুনে স্ত্রী বললেন, 'আমি জানি তুমি থাকবে না। একটু পরেই আড্ডা দিতে, তাস খেলতে ছুটবে।'

স্বামী বললেন, 'তোমার এরকম মনে হচ্ছে কেন? তুমি আজকের দিনটা দ্যাখো, তারপরে বোলো।'

স্ত্রী চপলকণ্ঠে বললেন, 'তুমি যদি এই রবিবারে বাড়ি থাকো আমি খুশির চোটে হার্টফেল হয়ে যাব।'

স্বামী শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বড় বেশি লোভ দেখাচ্ছ। জানি শেষ পর্যন্ত তুমি তোমার কথা রাখবে না।'

পুনশ্চ ঃ একটি কথোপকথন।

স্ত্রী ঃ আমি একটা গাধা, তা না হলে তোমাকে বিয়ে করি।

স্বামী ঃ বিয়ের আগে আমি তোমার সঙ্গে প্রেমে এত মশগুল ছিলাম যে ব্যাপারটা আমি খেয়াল করিনি।

পুনরায় স্বামী-স্ত্রী

এই কাহিনীতে স্বামীর নাম রাসবিহারী। স্ত্রীর নাম প্রয়োজন নেই।

স্বামী বেচারা বাইরের ঘরে জানালার ধারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে পথের চলমান দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। অন্দরমহলে স্ত্রীর মেজাজ আজ বিষম চড়া।

রাসবিহারী সকালে বাজার করতে গিয়েছিলেন। সেখানে কী সব গোলমাল হয়েছে কেনাকাটায়, সাদা শিমের বদলে সবুজ শিম এনেছেন, মাগুর মাছের জায়গায় সিঙ্গি মাছ এনেছেন, তারপর থেকে সময়টা ভাল যাচ্ছে না, যথেষ্ট নাজেহাল, অপদস্থ এবং কিঞ্চিৎ প্রহৃত হয়েছেন। বাজার করলে সাধারণত এক

কাপ চা পাওনা হয়, কিন্তু আজ তারও কোন ভরসা নেই।

ছুটির দিন মোড়ের দোকানে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসবেন, ইচ্ছে করলে আসতে পারেন, কিন্তু সে জন্যেও সাহস সঞ্চয় করতে হবে, বাড়ি থেকে বেরনোর জন্যে জবাবদিহি করতে হতে পারে, তার পরিণামও খুব সুখকর নয়।

পথের দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে জোর এল, ওই তো রাস্তার মোড়ে 'রতন টি স্টল' দেখা যাচ্ছে, লোকজন ঢুকছে বেরুচ্ছে। রাসবিহারী মনস্থির করে ফেললেন, 'যাবই, আমি যাবই।'

তিনি উঠতে যাচ্ছেন এমন সময় বাড়ির মধ্যে থেকে কাঁদতে কাঁদতে কিশোর পুত্রটি ছুটে এল। পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে কাঁদছিস কেন? কী হয়েছে?'

ছেলে দু হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললো, 'মা বিনা দোষে আমার গালে থাপ্পড় মেরেছে।'

বাবা এই শুনে ম্লান হেসে বললেন, 'ছি! ছি! এ জন্যে কাঁদে নাকি? বোকা ছেলে। আমাকে দেখছিস না, আমি কোনওদিন কাঁদি নাকি?'

এই জাতীয় গল্পই স্বামীর দুঃখের গল্প, অপমান ও বেদনাবহ এই সব কাহিনী। তাই বলে সুখের গল্প যে একেবারেই নেই তা কিন্তু মোটেই নয়। তবে দুঃখের গল্পগুলোই বোধহয় আগে বলে নেওয়া ভাল।

রাসবিহারী গঙ্গার ধারে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আর নিজের মনেই বলে যাচ্ছিলেন, 'ওগো, তুমি অকালে চলে গেলে কেন? তুমি এত কম বয়েসে কেন মারা গেলে? ওগো, তুমি আমাকে কী বিপদে ফেলে গেলে? ওগো, আমি এখন বাঁচি কী করে?'

অপরিচিত এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গঙ্গার ঘাটেই রাসবিহারীর ঠিক পাশে বসে-ছিলেন। ভদ্রলোক একটু নরম মনের মানুষ।

রাসবিহারীর কান্না বেশ কিছুক্ষণ শোনার পর রাসবিহারীর পিঠে হাত বুলিয়ে ভদ্রলোক সান্ত্বনা দেওয়া আরম্ভ করলেন, 'কাঁদবেন না। কেঁদে কী হবে? যে গেছে সে তো গেছে। সে তো আর ফিরে আসবে না।'

রাসবিহারী বৃদ্ধের অন্তরঙ্গ কথা শুনে কান্না না থামিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'সেই জন্যই তো কাঁদছি।'

বৃদ্ধ সমবেদক বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, আপনার কোনও নিকট আত্মীয়?'

রাসবিহারী ঘাড় নেড়ে জানালেন যে তা নয়।

বৃদ্ধ আবার জানতে চাইলেন, 'কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়?'

এবারও নিঃশব্দে রাসবিহারী জানালেন না তা নয় এবং যাঁর জন্যে কাঁদছেন তিনি বহুদিন আগে দেহরক্ষা করেছেন। কৌতূহলী বোধ করে বৃদ্ধ এবার বললেন, 'তা হলে?'

রাসবিহারী বললেন, 'তা হলে আবার কী? আমি যাঁর জন্যে কাঁদছি, তাঁকে কোন দিন চোখেও দেখিনি।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে বললেন, 'মানে!'

'মানে আর কী?' রাসবিহারী বললেন, 'যাঁর জন্যে কাঁদছি তিনি আমার স্ত্রীর

আগের স্বামী।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, 'মানে?'

রাসবিহারী বললেন, 'তিনি যদি মারা না যেতেন আমার সঙ্গে তো আমার স্ত্রীর, তাঁর বিধবা পত্নীর বিয়ে হত না। আমি একদম বেঁচে যেতুম।' এই বলে দুই হাতের তালুর মধ্যে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন রাসবিহারী।

এরপর রাসবিহারী পরিবারের একটা বাস্তব কাহিনী বলা প্রয়োজন না হলে এসব রম্যকাহিনী বিশ্বাসযোগ্য করা কঠিন।

পতিদেবতার সুখের গল্পের আগে বিশ্বাসযোগ্য কাহিনীটা বলে নিই।

সেই রাসবিহারী আর রাসবিহারিণী, আর সেই কিশোর পুত্র। তবে সেই কিশোর পুত্রটি ইতিমধ্যে একটু বড় হয়েছে কিঞ্চিৎ সাবালক। তার নাম রসময়।

রসময় ছোট বয়েস থেকে দেখে আসছে, শুনে আসছে মা বাবার ঝগড়া। সেদিন সকাল থেকে কথা কাটাকাটি, চিৎকার চেঁচামেচি, মাঝে মধ্যে ধাক্কাধাক্কি চলছিল সঙ্গে কিছুটা হাতাহাতি রাসবিহারী এবং রাসবিহারিণীর মধ্যে।

অবশেষে পরাস্ত হয়ে রাসবিহারী স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি কী বল, তোমার কথা আমি মোটেই বুঝতে পারি না।'

এই শুনে শ্রীমান রসময় বলল, 'কিন্তু বাবা, আমি তো মার কথা সবই বুঝতে পেরেছি।'

হতভম্ব রাসবিহারী বললেন, 'তুই বুঝতে পেরেছিস? আশ্চর্য! কী করে বুঝতে পারলি?'

রসময় বলল, 'কারণ একটাই। তুমি মাত্র পনেরো বছর ধরে মাকে দেখছো আর আমি দেখছি আমার জন্ম থেকে।'

আর দেরি করা উচিত হবে না, সুখের আগমন বিলম্বিত করতে নেই। অবশেষে এবার সুখের গল্প বলি। এটাই শেষ গল্প।

গল্পটা গোলমেলে, সেটা এক জনপ্রিয় বিখ্যাত লেখককে নিয়ে।

সবাই জানেন লেখক ব্যাপারটা আমি খুব ভয় পাই। বিশেষ করে তিনি যদি জনপ্রিয়, বিখ্যাত হন তাঁর থেকে আমি শত হস্ত দূরে থাকি। সাহিত্য ও সাহিত্যিক ব্যাপারটা আমার সত্যিই আসে না, কিছুতেই আসে না।

কিন্তু গল্পটা তো বলতেই হবে।

সেই এক বিখ্যাত লেখক সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত, কখনও মধ্যরাত থেকে ভোর পর্যন্ত, তারপর মধ্যাহ্ন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হয় বই লিখছেন বা বই পড়ছেন।

তাঁর আহ্লাদিনী স্ত্রী একদিন উত্তেজিত হয়ে গিয়ে আমাকে যা-তা বললেন।

আমার যা চরিত্র, আমি তাঁর স্বামীকে গিয়ে সেই সবই জানালাম এবং সেই সঙ্গে বললাম, 'তোমার বউ বলেছে, সামনের জন্মে যদি জন্মাই তবে যেন বই হয়ে জন্মাই, আপনার বন্ধুর সবচেয়ে কাছে থাকতে পারব।'

বন্ধু হেসে বললেন, 'খুব ভাল প্রস্তাব। শুধু একটা কথা। আমার মেম-সাহেবকে বল সে যেন পঞ্জিকা বা ডায়েরি হয়ে জন্মায়। বছর বছর যেন এডিশন হয়।'

শিক্ষার বিষয়ে

শিক্ষিকা মহোদয়া ক্লাসে হিংস্র জীবজন্তুর কাহিনী পড়াচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে সামনের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা বল তো রুমা, যদি তোমাকে কোনও ম্যান ইটার (Man eater) বাঘ তাড়া করে তুমি কী করবে ?'

রুমা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি কিছুই করব না। আমার কিছুই করার দরকার নেই।'

শিক্ষিকা কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু করবে না কেন ? তোমাকে যদি বাঘ খেয়ে ফেলে ?'

রুমা বলল, 'না। খাবে না।'

শিক্ষিকা বললেন, 'কেন ?'

রুমা বলল, 'আপনি যে বললেন বাঘটা ম্যান ইটার। আমি তো উম্যান (Woman), আমাকে তো খাবে না।'

এই শিক্ষিকাই অন্য একদিন রুমাকে একটা অঙ্কের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা বল দেখি তোমাদের বাড়িভাড়া যদি পাঁচশো টাকা করে হয়, আর বাড়িভাড়া বাকি পড়ে তিন মাস, মুদির দোকানে দেনা হয় সাড়ে সাতশো টাকা, ধোপা পঞ্চাশ, বাড়ির কাজের লোক দেড়শো, ইলেকট্রিক বিল আড়াইশো—'

শিক্ষিকাকে তালিকা দীর্ঘতর করতে না দিয়ে রুমা উঠে দাঁড়াল, 'থাক দিদিমণি। আপনার লিস্ট আর লম্বা করতে হবে না। যোগ দেবার কোনও দরকার পড়বে না, তার চেয়ে অনেক সোজা হবে আমাদের ওই বাড়ি থেকে চুপি চুপি উঠে যাওয়া।'

রুমাকে নিয়ে আরও একটা গল্প আছে। সে গল্পটা কিঞ্চিৎ করুণ রসের। এও সেই ক্লাসের মধ্যে শিক্ষিকার সঙ্গে রুমার প্রশ্নোত্তর—

শিক্ষিকা মহোদয়া কিঞ্চিৎ বিগতযৌবনা কিন্তু সে কথা তাঁর মনে থাকে না। একদিন ইংরেজি ব্যাকরণে টেন্স (Tensc) পড়াতে গিয়ে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি সুন্দরী, এই কথাটা বল তো কোন টেন্স ?'

আবার ওই রুমাই উঠল, মাননীয়া শিক্ষিকা মহোদয়াকে ভাল করে আরেকবার অবলোকন করে নিয়ে বলল, 'পাস্ট টেন্স দিদিমণি, অতীতকাল।'

রুমাকে নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামানো উচিত হবে না। তবে রুমার অভিভাবকেরা অনেক কিছুর পর অবশেষে রুমার লেখাপড়ার জন্য খবরের কাগজের কলমে একটা ছোটখাট বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, সেটি বেরিয়েছিল, 'গৃহশিক্ষক চাই' এই শিরোনামে এবং তার বক্তব্য ছিল

'সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, স্বাস্থ্যবতী, হাইয়ার সেকেন্ডারি পড়ুয়া তরুণীর জন্যে অন্তত পক্ষে গ্র্যাজুয়েট, সুদর্শন, লম্বা, চরিত্রবান ও প্রকৃত উচ্চাভিলাষী একজন আদর্শ গৃহশিক্ষক অবিলম্বে প্রয়োজন।'

মনে হয় শিক্ষিকা মহোদয়া রুমাকে প্রায় কিছুই শিক্ষা দিতে পারেননি তাই এতদিন পরে আদর্শ গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন পড়েছে।

এ সমস্তই আমাদের দেশি গল্প। অতঃপর একটা বিলিতি ঘটনা বলি।

মার্কিন রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্প। অধ্যাপক মহোদয় নানা কাজে গবেষণায় সব সময়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তিনি ঠিকমত কখনও ক্লাস নিতে পারেন না। সব সময়েই তাঁর কাছে নানা ধরনের লোকজন আসে। অথবা কোথাও না কোথাও তাঁর সভাপতিত্ব করার কাজ। আর বক্তৃতা তো হরদম লেগেই আছে। পুরো মার্কিন দেশে, মার্কিন দেশের বাইরে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁকে বক্তৃতা করে বেড়াতে হয়।

সুতরাং নিজের ক্লাসটাস আর তেমন নেয়া হয় না। তিনি চান অধ্যাপনা ছেড়ে দিতে, কিন্তু যেহেতু তাঁর যথেষ্ট নামডাক আছে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ছাড়তে চায় না। ফলে মাঝে মধ্যে দু-চারটে ক্লাস তাঁকে নিতেই হয়।

তাও কিন্তু সময় পান না। তখন তিনি এক বুদ্ধি বার করলেন।

অবসর মত বাসায় বসে বসে তিনি তাঁর বক্তৃতা অর্থাৎ ক্লাস লেকচারগুলি টেপে রেকর্ড করে ফেললেন। তারপর ক্লাসে গিয়ে টেপ রেকর্ডারটি চালিয়ে দিলেন, চালিয়ে দেওয়ার আগে বললেন, 'আমার যা কিছু বলার আমি সব কিছু টেপ করে নিয়ে এসেছি। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও। আমার অন্য জায়গায় একটা কাজ আছে, আমি সেখানে যাচ্ছি, কিন্তু সেজন্যে তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। টেপে সব কথাই বলা আছে।'

এই বলে বিবেকপীড়িত শিক্ষক শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করে নিজের কাজে চলে গেলেন এবং এরপর থেকে তিনি নিজে ক্লাসে না গিয়ে একের পর এক টেপ পাঠিয়ে দিতে লাগলেন তাঁর ক্লাসে।

অবশেষে অনেকদিন পরে একদিন অধ্যাপক মহোদয়ের এক জায়গায় কাজ একটু তাড়াতাড়ি মিটে যাওয়ায় ভাবলেন, যাই একটু দেখে আসি আমার ক্লাস কেমন হচ্ছে।

অধ্যাপক তাড়াতাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে নিজের ক্লাসের দিকে এগোলেন কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেলো।

ক্লাসে একটিও ছাত্র বা ছাত্রী নেই। ক্লাস সম্পূর্ণ ফাঁকা। তাঁর টেবিলে তাঁর টেপ রেকর্ডার চলছে, আর এক ছাত্রের ডেস্কে একটা করে টেপ রেকর্ডার, সেগুলো তাঁর টেপের কথাগুলো রেকর্ড করে নিচ্ছে।

জীবজন্তুর একটা গল্প শিক্ষকের সূত্রে আবার হয়ে যাক। এ ঘটনাও সেই ক্লাসের মধ্যেই।

জলহস্তীর বিষয় পড়াচ্ছিলেন মাস্টার মশায়। একটু গোলাকার, থপথপে, কালো কালো চেহারার ভদ্রলোক, তাঁর কথা কেউই ক্লাসে মন দিয়ে শুনছিল না, সবাই গোলমাল করছিল।

নানাভাবে নাজেহাল হয়ে অবশেষে ভদ্রলোক বললেন, 'দ্যাখো সবাই মিলে অত চিৎকার, চেঁচামেচি করলে কিছুই বুঝতে পারবে না। সবাই চুপ কর। চুপ করে

আমার দিকে তাকাও। জলহস্তী যাকে হিপো বা হিপোটেমাস বলে তাকে যদি ভাল করে বুঝতে চাও, আমার দিকে তাকাও একবার আমার দিকে ভাল করে তাকাও।

ছাত্রেরা জলহস্তীর চেহারার বিষয়ে কী বুঝলো কে জানে, তথাপি অন্য এক বুদ্ধিমান অধ্যাপকের কথা মনে পড়ছে।

অধ্যাপক মহোদয় এবং জনৈক বাচাল ছাত্রের মধ্যে এই কথোপকথনটি যথা সংক্ষিপ্তভাবে স্মরণ করছি।

অধ্যাপক ঃ তুমি কি নিজেকে এই ক্লাসের অধ্যাপক মনে করেছ নাকি ?

ছাত্র ঃ না, স্যার।

অধ্যাপক ঃ তাহলে চুপ কর। গাধার মতো কথা বোলো না। আমাকে বলতে দাও।

ভালবাসার গল্প

সেই এক কবি অনেকদিন আগে এক নবাগতাকে বলেছিলেন, 'শেষ ভালবাসা দিয়েছি তোমার পূর্বের মহিলাকে'। সেই কবির সঙ্গে এই জন্মে যদি আমার কখনও দেখা হয়, তাঁর কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইব।

আমি যদি এ কালের কোনও নব্য কাগজের নব্য লেখক হতাম তবে স্বভাব-সিদ্ধ নাক কুঁচকিয়ে এবং ভুরু তুলে বলে দিতাম, 'ভালবাসা তার আবার শেষ ভালবাসা প্রথম ভালবাসা কি ? ভালবাসা আদি ও অনন্ত।'

সেই গল্পটি মনে আছে ?

এক পার্কে এক মহিলা বেড়াচ্ছিলেন, একা একাই বেড়াচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে বড় কথা হল তিনি পরমা সুন্দরী। সুতরাং অনেকেরই দৃষ্টি তাঁর উপরে পড়ল।

বলাবাহুল্য পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষমতা যে তাঁর আছে সেটা ভদ্রমহিলা ভালভাবেই জানেন এবং ব্যাপারটা যে খুব একটা অপছন্দ করেন তা নয়।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ জটিল আকার ধারণ করেছে। কিছুক্ষণ হল মহিলা লক্ষ্য করেছেন যে একটি বেয়াড়া যুবক তাঁর সঙ্গ নিয়েছে, তাঁর পিছু পিছু আসছে।

অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হয়ে মহিলা যুবকটির দিকে ঘুরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমার পিছু নিয়েছেন কেন ?'

যুবকটি বলল, 'আমি তোমার ভালবাসায় মুগ্ধ।'

মহিলাটি অবাক হয়ে বললেন, 'ভালবাসা ? আপনি আমার ভালবাসায় মুগ্ধ ? আপনি আমাকে এর আগে কখনও দেখেছেন ? চেনেন ?'

নির্বিকার ভাবে যুবকটি বলল, 'তা অবশ্য চিনি না। কিন্তু আমার এই ভালবাসা, খাঁটি ভালবাসা, শেষ ভালবাসা। যাকে বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম, আমি তোমাকে একবার দেখেই প্রেমে মুগ্ধ হয়ে গেছি।'

এই কথা শুনে মহিলাটি হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, 'ও, এই কথা! তা আপনি হঠাৎ আমার প্রেমে পড়তে যাচ্ছেন কেন। ওই তো আমার একটু পিছনেই আসছে আমার বান্ধবী, যে আমার চেয়ে ঢের সুন্দরী। আমাকে প্রেম নিবেদন করার আগে তাকে অন্তত একবার যাচাই করে দেখুন।'

ভদ্রমহিলার পরামর্শ শোনা মাত্র যুবকটি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল। কিন্তু পিছনে কোথাও কোনও সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেল না। বরং বিগতযৌবনা প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধা দু'য়েকজনকে পার্কের রাস্তায় দেখা গেল।

ততক্ষণে পূর্বের মহিলাটি হন্‌হন্‌ করে হেঁটে বহুদূর চলে গেছেন। যুবকটি বোকা বনে গিয়ে একটু হতবিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। এবার একটু দৌড়ে গিয়ে মহিলাটির কাছে অভিযোগ করলেন, 'তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলে জব্দ করলে কেন?'

ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন, 'আপনিই কি আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন?'

এইটুকু ছুটে এসেই যুবকটি হাঁপাচ্ছিল, হাঁপাতে হাঁপাতেই সে বলল, 'কী মিথ্যে কথা বলেছি?'

মহিলা বললেন, 'শেষ ভালোবাসা? প্রথম দর্শনে বিশুদ্ধ প্রেম। শেষ থেকে প্রথম আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছেন। সত্যি ভালবাসা হলে কি আর পিছন ফিরে আমার চেয়েও সুন্দরীতরকে খুঁজতে যেতেন?'

এরই পাশাপাশি অন্য এক গল্প অনেক দিন আগে একটা রেলের কামরায় শুনেছিলাম।

কয়েকটি ছেলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে অফিস যাচ্ছিল।

প্রেমের গল্প হচ্ছিল। কথায় কথায় একজনকে ধরা যাক তার নাম অনিমেষ, সেই অনিমেষকে সবাই মিলে চেপে ধরল, 'তুই যে কলেজ পাড়ায় সেই অচেনা মেয়েটার প্রেমে পড়েছিলি, পিছু পিছু হাঁটতিস, সেটার কি হল?'

অনিমেষ বলল, 'আর বলিস না, অতি গুরুতর বিপদে পড়েছিলাম।'

সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বিপদ?'

অনিমেষ রুমাল দিয়ে একবার মুখ মুছে নিয়ে তারপর বলল, 'গত শনিবার সন্ধ্যাবেলা বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি, এমন সময় দেখি মেয়েটা একলা যাচ্ছে। সুবর্ণ সুযোগ, রাস্তাঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকা। আমি তাড়াতাড়ি মেয়েটির পাশে ছুটে গিয়ে নরম গলায় বললাম, 'এই যে।' তারপর যা হল তা আর বলবার নয়।'

বন্ধুদের একজন বলল, 'ভাব হয়ে গেল?'

অনিমেষ কপালে চোখ তুলে বলল, 'ভাব? শয়তান মেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে পুলিস ডেকে বসল! কী বিপদ?'

উলটো দিকের বেঞ্চে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ততক্ষণ খুব মনোযোগ দিয়ে অনিমেষের কথা শুনছিলেন, এবার সবাইকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'এ কিছুই বিপদ নয় বাবা। তুমি খুব বাঁচা বেঁচে গেছ। মেয়েটি পুলিস ডেকে তোমার উপকার করেছে। আজকাল তো এরকম হলে মেয়েরা পুরুত ডেকে আনে। তাহলে যে

সারা জীবনের মত ঝুলে যেতে হে।'

সকলেই অনিমেষের মত সৌভাগ্যবান নয়। অনেককেই শেষ পর্যন্ত ঝুলে পড়তে হয়, বিয়ে করতে হয়।

অনতি সদ্য বিবাহিত এক যুবককে ক্লাবে এক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাল সন্ধ্যেবেলায় সিনেমা হলে আপনাকে দেখলাম পরমা সুন্দরী এক মহিলার সঙ্গে।'

যুবকটি, ওর নাম নিমেষ, নিমেষ অতি সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'আজ্ঞে।'

ভদ্রলোক অতি কৌতূহলী, এবার তাঁর জিজ্ঞাসা হল, 'মহিলাটি কে?'

নিমেষ জবাব দিল, 'বলা উচিত হবে না, তবু আপনি যখন জিজ্ঞাসা করছেন বলতে পারি, তবে এক শর্তে।'

'কী শর্ত?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

নিমেষ বলল, 'আপনি কখনও আমার স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু বলবেন না।'

ভদ্রলোক এবার বললেন, 'তা বলতে যাবো কেন? তাছাড়া আমি কী করে আপনার স্ত্রীকে বলব, তাঁর সঙ্গে তো এখনো আমার আলাপ পরিচয়ই হয়নি।'

নিমেষ বলল, 'কিন্তু যদি কখনও পরিচয় হয়, আলাপ হয়, তখনও বলবেন না।'

ভদ্রলোক বললেন, 'এ আর বেশি কথা কী? আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন, সম্পূর্ণ গোপন থাকবে কথাটা।'

এতক্ষণে নিমেষ বলল, 'ওই মহিলাটি আমার স্ত্রী। তিনি যে পরমা সুন্দরী এ কথা তাঁকে জানতে দিতে চাই না।'

খাদ্যাখাদ্য

খাদ্য+অখাদ্য, খাদ্য ও অখাদ্য দুইয়ে মিলে খাদ্যাখাদ্য।

প্রাচীনেরা বলেছিলেন খাদ্যের মধ্যে রয়েছে চর্ব, চোষ্য, লেহ্য এবং পেয়। বলা চলে খাবার চার রকম, কিছুটা চিবোতে হবে যেমন মাছের মুড়ো কিংবা মুরগির ঠ্যাং। কিছুটা চুষতে হবে যেমন পাঁঠার মাংসের হাড়ের নলি কিংবা সজনে বা কুমড়োর ডাঁটা বড়জোর পুঁইশাক।

চিবোনো ও চোষার পরে চাটা যেমন দই বা চাটনি। সপসপ, সুপসুপ। একালের আইসক্রিম বা রসমালাই হলেও চলবে।

সর্বশেষ পেয়। কেমন সন্দেহ হয়, প্রাচীনেরা বিলিতি ডিনারের আভাস কোথায় পেয়েছিলেন। সব শেষে পেয়, সুবাসিত গোলাপি গন্ধ বিহ্বল চা কিংবা রোস্টেড কফি এবং তারপরেও আছে, তারপরে তদুপরি ব্র্যান্ডি, কনিয়াক, নিতান্ত মদিরা।

* * * *

খাদ্যাখাদ্যের কথিকাসূত্রে ভোজনালয়ে প্রবেশ করা যাক।

ভোজনালয় নানা জাতের, নানা দামের। রেস্তোরাঁ, হোটেল, পাইস হোটেল, বিশুদ্ধ হিন্দু হোটেল, মুসলিম হোটেল। দক্ষিণ ভারতে আছে মিলিটারি হোটেল,

সেখানেই শুধু আমিষ মাছ, মাংস পাওয়া যায়।

তা যাক। আপাতত একটা গল্প বলি।

খাবার টেবিলে পুরনো খদ্দের পাইস হোটেলের মালিককে বলল, 'মনে হচ্ছে, আপনার রান্নার ঠাকুর বদল হয়েছে।'

মালিক বললেন, 'ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু ধরলেন কী করে? রান্নাটা একটু অন্যরকম, ভাল হয়নি।'

খদ্দের বললেন, 'না। রান্না ভাল-খারাপের কথা বলছি না। তবে আগে তরকারির মধ্যে সাদা চুল পেতাম, আজ দেখছি একটা কালো চুল।'

অন্য একটা হোটেলে একটা লোক অনেক খেয়েদেয়ে তারপর আর দাম দিতে পারল না। অনেক দামি দামি খাবার অর্ডার দিয়েছিলেন, বেয়ারাও বকশিশের লোভে তাড়াতাড়ি করে সব খাবার এনে দিয়েছে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। লোকটা বেসিনে হাত ধুয়ে দরজা দিয়ে কেটে পড়বার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সতর্ক ম্যানেজার প্রথম থেকেই কি একটা সন্দেহ করেছিল, পলায়ন পথে সে তাকে ধরে ফেলে, 'কী হল আপনার বিলটা মিটিয়ে যান।'

লোকটি তখন আমতা আমতা করে বলল, 'বিল মেটাব কী করে? আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।'

লোকটিকে সার্চ করা হল, সত্যি একটা কানাকড়িও তার পকেট থেকে বেরল না। তখন ম্যানেজার তাকে ধরে পেটাতে লাগলেন।

একেবারে যাকে বলে প্রচণ্ড পেটানো। যতরকম সম্ভব। কিল, ঘুসি, চড় এমনকি লাথি পর্যন্ত। তারপর লোকটার শার্টের কলার ধরে টানতে টানতে বেরনোর দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজার জোরে এক গলাধাক্কা দিয়ে লোকটাকে রাস্তায় বের করে দিয়ে বললেন, 'যা ব্যাটা ভাগ। তোর খাওয়া শোধ।' এত মারধোরের পর অবশেষে ম্যানেজারের শক্ত কবজির গলাধাক্কা লোকটা সইতে না পেরে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেই অবস্থায় কোনওভাবে শরীরের ও জামার ধুলো ঝেড়ে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় সেই বেয়ারা যে খাবার দিয়েছিল হঠাৎ ছুটে এসে লোকটার দুটো কান আচ্ছা করে মলে দিল।

লোকটা বলল, 'ম্যানেজারই যথেষ্ট মেরেছে তুমি আবার কেন?' আরও জোরে কান মলতে মলতে বেয়ারা বলল, 'এটা আমার বকশিশ।'

ভাল বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় ছাপানো মেনু থাকে, যেমন থাকে পাইস হোটেলে টিনের সাইন বোর্ডে কিংবা পাড়ার চায়ের স্টলে ব্ল্যাকবোর্ডে।

মেনু মানে কী কী খাবার পাওয়া যাবে তার বিবরণ এবং মূল্য তালিকা। নামী, দামি হোটেলের মেনুও খুব সুন্দর করে ছাপা হয়। চমৎকার কাগজে, সচিত্র রঙিন সেই মেনু সংরক্ষণ করার মতো।

এক ফরাসি রেস্তোরাঁয়, প্যারিস শহরে, দম্পতি ও প্রেমিকযুগলের খুব ভীড় হয়, সেখানে একই মেনু দু'রকম ভাবে ছাপা আছে। একটি মেনুতে সব কিছুর দাম খুব বেশি করে দেখানো আছে, অন্যটিতে ঠিকঠাক ন্যায্যমূল্য।

না,, এটা কাউকে ঠকানোর জন্যে নয়। দম্পতি বা প্রেমিক-প্রেমিকা যখন খেতে আসে তখন রেস্তোরাঁয় বেয়ারা মহিলাটির হাতে দামে চড়া মেনুটি দেয় আর আসল মেনুটি দেয় তার প্রেমিকের হাতে। প্রেমিক যাই অর্ডার দিন প্রেমিকা ভাবে, 'বাবা কী সব দামি দামি খাবার।'

আমাদের কলকাতা শহরে এ রকম কোনও ব্যবস্থা নেই তবে আমার পরিচিত এক যুবক এর একটা বিকল্প উপায় বার করেছিল।

সে তার প্রেমিকার একটু আগে রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হয়ে টেবিল থেকে মেনুটা তুলে নিয়ে মূল্যবান খাবারগুলো কলম দিয়ে কেটে দিত। যাতে দেখে মনে হয় এগুলো স্পেশাল খাবার। আজ তৈরি হয়নি কিংবা এখন তৈরি হয় না। এরপর প্রেমিকা এলে সে বাকি সস্তা দামের খাবার থেকে তাকে বলত বেছে নিতে।

বিদেশি গল্পেই হোটেল নিয়ে রসিকতা বেশি। বাইরে খাওয়া বা হোটেল কালচার এখনও এদেশে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ দিনে বা বিশেষ প্রয়োজনে লোকে হোটেল-রেস্তোরাঁয় খায়। এখনও অনেক লোক আছে যারা বাড়ির বাইরে খেতে চায় না।

বিদেশি হোটেলের পটভূমিকায় এক ভারতীয়ের গল্প বলছি।

ভারতীয় মানে নিতান্ত নিরামিষাশী ভারতীয়। তিনি বিদেশের এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় খেতে গেছেন। সেই রেস্তোরাঁয় বিজ্ঞাপনে বলা হয় যে সেখানে আমিষ ও নিরামিষ দু'রকম খাদ্যই পাওয়া যায়।

ভারতীয় ভদ্রলোক খেতে এসে একটা নিরামিষ পদ অর্ডার দিলেন, নিতান্ত ভেজিটেবল চপ! এখন সেই হোটেলের কেতা হল ছাপানো প্যাডে অর্ডার লিখে দিতে হয়।

মিনিট পনেরো পরে খাবার এল কিন্তু দুঃখের কথা সেটা নিরামিষ চপ নয় মাংসের কাবাব। ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে ভোজনালয়ের ম্যানেজারের কাছে নালিশ জানাতে, ম্যানেজার বললেন, 'কোনও চিন্তা নেই। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।' এই বলে সেই অর্ডার লেখা কাগজটা নিয়ে দ্রুত হস্তে ভেজিটেবল চপ কেটে মাংসের কাবাব লিখে দিলেন।

এক সর্দারের গল্প (১)

না, এক কিস্তিতে সম্ভব হবে না। একাধিক কিস্তি লিখতেই হবে।

সর্দার মানে যা তা, যেমন তেমন সর্দার নয়, রীতিমত সর্দার খুশবন্ত সিং। এই বিতর্কিত সাংবাদিক যতটা সম্ভব সংবাদ পরিবেশন, সম্পাদনা অথবা মৌলিক চিন্তার জন্যে বিখ্যাত তার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় তাঁর অসামান্য রসিকতার জন্যে। উপহাস, পরিহাস, কটু বাক্য কখনও কিঞ্চিৎ শ্লীলতার সীমানা ছাড়িয়ে বহু বহুবার অসামান্য সব মন্তব্যের জন্মদাতা, রচনাকার সর্দার খুশবন্ত সিং।

সর্দার খুশবন্তের সব রসিকতাই যে তাঁর নিজস্ব তাও নয়। অবশ্য রসিকতার আবার নিজস্ব, পরস্ব কী, রসিকতা পাঁচজনের। মহাভারতের দ্রৌপদীর মতো

ভাগেযোগে উপভোগ করার।

খুশবন্ত সিংয়ের রসিকতাগুলো তিনভাগে ভাগ করা যায়, (এক) যেগুলো সর্দারজির নিজেরই চিন্তা বা রচনা, যদিও হলপ করে বলা কঠিন তবুও যেগুলো সম্ভবত তাঁর মৌলিক ভাবনা।

(দুই) যে রসিকতাগুলো সুপ্রচলিত অথবা পূর্বপ্রচলিত, যেগুলোকে, অনেকটা আমি যে রকম করে থাকি, নিজের কায়দায় নিজের ভঙ্গিতে নতুন ফ্রেমে উপস্থাপন করেছেন খুশবন্ত। তবে বলা বাহুল্য সর্দারজির উপস্থাপনার সঙ্গে আমার উপস্থাপনার কোনও তুলনা হয় না। আমি তাঁর কাছে নাবালক।

(তিন) শেষের ব্যাপারটাই সবচেয়ে সহজ কিন্তু সবচেয়ে ভাল এবং জনপ্রিয়। এই রসিকতাগুলো আর কিছুই না। নানা জায়গা থেকে নানা পাঠক পাঠিকা যা কিছু মজার গল্প তরল আখ্যান শুনেছেন সেগুলো খুশবন্তকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তার থেকে বেছে হয়তো বা কিঞ্চিৎ সম্পাদনা করে প্রেরকের নাম উল্লেখ করে (অর্থাৎ ঋণ স্বীকার করে) তিনি সেগুলি ছাপিয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন আগে সর্দার খুশবন্ত সিং তাঁর সুদীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের এইসব রসিকতাগুলো থেকে বেছে নিয়ে একটি জোকবুক বার করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি খুবই জনপ্রিয় হয়। এডিশনের পর এডিশনের পর এডিশন।

ফলে সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের আরও জোকবুক বেরিয়েছে। প্রথম বইটির এর মধ্যেই দশটি সংস্করণ হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটিও সমানই জনপ্রিয় হতে চলেছে। তারও পরে আরও খণ্ড বেরিয়েছে কিনা আমি জানি না, তবে জানি সেগুলোও সমান জনপ্রিয় হবে।

* * *

সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের মতো ঝলমল চরিত্র এবং তাঁর জোকবুকের মতো ঝলমল গ্রন্থ নিয়ে আমি আপাতত যে ভনিতা করলাম তা আমার মূর্খতারই পরিচায়ক।

সুতরাং আমি আর সময় নষ্ট না করে সরাসরি রসিকতায় যাই। খুশবন্তীয় রসিকতা।

আমি ইতিপূর্বে যে তিন ধরনের রসিকতার উল্লেখ করেছি, এক সর্দারের গল্পের প্রথম কিস্তিতে সেই তিন জাতের আখ্যানই পেশ করছি পর্যায়ক্রমে।

খুশবন্ত সাহেবের নিজের গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। তবে আগেও বলেছি এবারেও বলি, রসিকতা, গল্পে কোনটা যে কার নিজের গল্প কোনটাই বা অন্যের গল্প কেউ বলতে পারবে না দেবতারাও না।

যা হোক আমার এই প্রথম গল্পটায় খুশবন্ত সিংয়ের দুটো বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটি অসাধারণ, সর্দার সাহেবের অধিকাংশ ঠাট্টা নিজেকে নিয়ে, নিজেদের নিয়ে, এ গল্পেও তাই এক সর্দার পরিবার নিয়ে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সেটা কিঞ্চিৎ গোলমেলে, একটু অশালীনতার দিকে ঝোঁক সর্দার সাহেবের, ব্যাপারটা আমার তেমন আসে না, নব যৌবনেই আসে নি আর এই পড়ন্ত যৌবনে? কিন্তু একটু রেখেঢেকে লিখতে (মানে অনুবাদ করতে)

আপত্তি কী ?

কি আছে, আগে লিখি তো তারপর বোঝা যাবে।

এক সর্দার পরিবারে নতুন বিয়ে হয়ে একটি বউ এসেছে। বউয়ের বর চার ভাইয়ের মধ্যে একজন। ভাসুর, দেওর, বর সব ভাই একসঙ্গে একই বাড়িতে থাকে। একই সঙ্গে চাষবাস করে।

প্রতিদিন সকালে বাড়ির পুরুষেরা জমিতে যায় চাষের কাজে, তারপর সন্ধ্যে-বেলা বাড়ি ফিরে আসে। তখন সবাই একসঙ্গে খেতে বসে। নতুন বউ আর শাশুড়ী ওড়নায় মুখ ঢেকে তাদের খাবার দেয়।

বিয়ের দিন পনেরোর মাথায় নববধূ তার শাশুড়িকে খুব নরমভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ওই যে আপনার চার ছেলে একসঙ্গে চাষে যায়, একসঙ্গে চাষ থেকে ফেরে তারপর একসঙ্গে খেতে বসে ওর মধ্যে ঠিক কোনজন আমার বর ?'

এই প্রশ্ন শুনে হেসে শাশুড়ি উত্তর দিলেন, 'বউরানি, তোমার মাত্র দুই হপ্তা বিয়ে হয়েছে, আমার বিয়ে হয়েছে আজ পঁচিশ বছর, এখন পর্যন্ত আমি আমার স্বামীকে তার ভাইদের থেকে আলাদা করে চিনতে পারলাম না। জানতেই পারলাম না কে আমার স্বামী, কেউ বা দেওর, কেউ বা ভাসুর ?'

এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্প।

এই গল্পগুলো পুরনো এবং প্রচলিত। সর্দার খুশবন্ত সিং নিজের মতো করে লিখেছেন। যেমন ঃ

এক ধোপার গাধা অন্য একটা গাধার কাছে দুঃখ করছিল তার মালিক তাকে ভালভাবে খেতে দেয় না। তার থাকবার জায়গা নেই সে বৃষ্টিতে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঠকঠক করে কাঁপে। তার ওপরে মালিক তাকে দিয়ে ভারি ভারি বোঝা বওয়ায়, বোঝা টানতে না পারলে বেত দিয়ে মারে।

তার এই দুঃখের কাহিনী শুনে গাধা বন্ধুটি বলল, তুমি কেন পালিয়ে যাও না ?'

ধোপার গাধাটি বলল, 'আমি পালাই না শুধু একটি লোভে। আমার একটি বড় আশা আছে। সেটা যে কোনও দিন পূরণ হতে পারে।'

গাধা বন্ধুটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কী আশা ? কী পূরণ হবে ?'

ধোপার গাধা বলল, 'ধোপার একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে। ধোপা তাকেও খুব মারধোর করে, বেত মারতে মারতে বলে, 'একদিন তোর আমি কী করি দেখিস, তোকে আমি ঐ গাধাটার সঙ্গে বিয়ে দেব। বদ মেয়ে! একটু থেমে নিয়ে করুণ হাসি হেসে ধোপার গাধা বলল, 'আমি তো সেই আশাতেই সব কষ্ট সহ্য করে যাচ্ছি।'

সর্বশেষ হল খুশবন্ত সিংকে পাঠকদের প্রেরিত রসিকতা। এগুলোর সংখ্যাই বেশি।

নয়াদিল্লির জে পি সিং কাকা নামে এক ভদ্রলোক এই রসিকতাটি খুশবন্তকে পাঠিয়েছিলেন।

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বাড়ি ফিরে আসায় স্ত্রী স্বামীকে প্রশ্ন করল, 'কী হল আজ এত তাড়াতাড়ি এলে ?'

স্বামী অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'কী বলব, অফিসের বড়সাহেব আমার ওপর রেগে আগুন হয়ে গিয়ে আমাকে বললেন, 'জাহান্নমে যাও'। কী আর করব, বাড়ি চলে এলাম।'

এক সর্দারের গল্প (২)

সর্দার খুশবন্ত সিং তাঁর জোকবুক আরম্ভ করেছেন। যে রসিকতাটা দিয়ে সেটি তাঁর নিজস্ব নয়, এক সর্দারণী তাঁকে সেটা প্রেরণ করেছেন।

গল্পটি এক দাড়িওলা বাঙালি ভদ্রলোক এবং এক সর্দারজিকে নিয়ে।

যেমন হয় এইসব গল্পে, এই দুজনের মধ্যে খুব বাদানুবাদ চলছিল, বাদানুবাদের বিষয় আর কিছু নয়, বাঙালি না পাঞ্জাবি, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কারা বেশি আত্মাহুতি দিয়েছে, শহিদ হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ কলহকোলাহলের পর দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন যে একেকজন তাঁর জাতির একজন করে শহিদের নাম করবেন আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীর গাল থেকে একটা দাড়ি উপড়িয়ে নেবেন।

শুরু হল ভয়ানক দাড়ি ছেঁড়া লড়াই। দাড়িওয়ালা বাঙালি ভদ্রলোকটি প্রথমেই 'ক্ষুদিরাম' বলে সর্দারজির গাল থেকে একটা দাড়ি ছিঁড়ে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজি 'ভকত সিং' বলে বাঙালি ভদ্রলোকের একটি দাড়ি উৎপাটন করলেন।

ভালই চলছিল, হঠাৎ বাঙালি ভদ্রলোকের কি মতিভ্রম হল। এক নিঃশ্বাসে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' বলে একটানে সর্দারজির তিনটে দাড়ি তুলে ফেললেন।

এবং এখানেই হল বাঙালি ভদ্রলোকের প্রকৃত সর্বনাশ। ক্ষিপ্ত সর্দারজি হাতের বিশাল থাবায় বাঙালি ভদ্রলোকের গালের সমস্ত দাড়ি একসঙ্গে ধরে 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' বলে একটানে যথাসাধ্য উপড়িয়ে ফেললেন।

সে এক রক্তারক্তি কাণ্ড। সেদিনের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন।

খুশবন্ত সিং তাঁর দ্বিতীয় গল্পটি পেয়েছেন নয়াদিল্লির প্রেম খান্না নামে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

গল্পটি বেশ জটিল।

এক গোহাটায় এক চাষী গিয়েছেন একটা ভাল গরু কিনতে।

গরুর পাইকার একটা নধরকান্তি যুবতী গাভী দেখিয়ে বলল, 'এর দাম পাঁচ হাজার টাকা। সদ্য যুবতী। বছরে একবার বিয়োবে, দৈনিক দশ কিলো করে ঘন মিষ্টি দুধ দেবে।'

দামটা একটু বেশি মনে হওয়ায় গরুর ক্রেতা চাষী ভদ্রলোক পাশের অন্য একটা গরু দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এটার দাম কত হবে?'

'বিক্রেতা বললেন, 'এর দাম হবে দশ হাজার। এর বেশ বয়েস হয়েছে, বিগতযৌবনাই বলা যায়। এখনও পর্যন্ত কোনও বাচ্চা দেয়নি। দুধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।'

এই শুনে স্তম্ভিত হয়ে ক্রেতা বললেন, 'আপনি কী ধরনের গরুর পাইকার। একটা বাঁজা, বুড়ি গরুর ডবল দাম চাইছেন।'

এই শুনে পাইকার গম্ভীর হয়ে বলল, 'দাদা আপনার কাছে না থাকুক আমার কাছে চরিত্রের তো একটা দাম আছে।'

খুশবন্ত সাহেবের জোকবুকে চরিত্রঘটিত গল্পের ছড়াছড়ি, আসলে সর্দারজির ঝোঁকটা একটু ওই দিকে।

এই বইতেই দুই ব্যক্তির পরলোকে দেখা হওয়ার গল্প। পৃথিবীতে থাকার সময়ে দুজনের মধ্যে স্বল্প পরিচয় ছিল।

এখন ওপারে দেখা হতে একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই, আপনি কি ভাবে মারা গেলেন?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'আমি মারা গিয়েছিলাম অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় জমে। আপনি কী ভাবে মারা গিয়েছিলেন?'

প্রথম ব্যক্তি উত্তর দিলেন, 'সে বড় দুঃখের গল্প। একদিন সন্ধ্যায় একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আমার মনে হল আমার স্ত্রী যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁর ঘরে যেন অন্য কোনও লোক রয়েছে। তারপর আমি তো ঘরে ঢুকে ঘরের আনাচেকানাচে, বারান্দায়, সিঁড়ির নীচে আলমারির পেছনে সব জায়গায় খুঁজতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও কাউকে খুঁজে পেলাম না। তখন আমার মনটা খুব ভেঙে গেল। ছিঃ, ছিঃ আমি আমার স্ত্রীকে চরিত্রহীনা ভেবেছি। মনের দুঃখে হার্টফেল করে মারা গেলাম আমি।'

এই শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'দাদা, একটু বুদ্ধি করে আপনাদের বড় রেফ্রিজারেটারটা যদি একটু খুলে দেখতেন, আমিও ঠাণ্ডায় জমে মারা যেতাম না, আপনিও হার্টফেল করে মারা পড়তেন না।'

চরিত্রের পরে শিক্ষা।

সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের পরবর্তী গল্পটি, তাঁর নিজস্ব, এটা কেউ তাঁকে ধার দেয়নি, তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীযুক্ত হাসিম আলি একদা এক বক্তৃতায় এই গল্পটি বলেছিলেন।

এ গল্পটিও পরলোকের। মৃত্যুর পরে এক উপাচার্য পরলোকে পৌঁছতে চিত্রগুপ্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পৃথিবীতে কী করতেন?'

উপাচার্য বললেন, 'মৃত্যুর আগে অল্প কিছুকাল আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলাম। তার আগে…'

উপাচার্যের কথা শেষ না হতে চিত্রগুপ্ত বললেন, 'তার আগে আর জেনে দরকার নেই। আপনার যথেষ্ট পাপভোগ হয়ে গেছে, আপনি এই সামনের দরজা দিয়ে স্বর্গে চলে যান।'

পিছনেই অন্য এক আগন্তুক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিও চিত্রগুপ্তের নির্দেশ শুনে সামনের উপাচার্য ভদ্রলোকের পিছু পিছু স্বর্গের দরজার দিকে রওনা হলেন।

চিত্রগুপ্ত দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বাধা দিয়ে বললেন, 'একি আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, 'আমিও উপাচার্য ছিলাম। একবার নয়, পর পর

তিনবার তিনটে বিশ্ববিদ্যালয়ে।'

চিত্রগুপ্ত মৃদু হেসে বললেন, 'তা হলে তো আপনার নরক ভোগ অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনি পিছনের দরজা দিয়ে নরকে চলে যান।'

অবশেষে আরেকটি বিশুদ্ধ খুশবন্তীয় গল্প।

ইস্কুলের সবচেয়ে নিচু ক্লাসে একটি ছোট বাচ্চা ভর্তি হতে এসেছে, তার বড় ভাই শিবু ওই ইস্কুলেই ক্লাস টেনে পড়ে। বড় ছেলেটি এই বাচ্চাটিকে নিজের ভাই বলে হেডমাস্টারের কাছে ভর্তি করাতে এসেছে। কিন্তু বাচ্চাটিকে যখন হেডমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিবু তোমার কী হয়?' সে বলল, 'দূর সর্ক্কের আত্মীয়।'

হেডমাস্টার মশায় অবাক হয়ে বললেন, 'শিবু তুমি বলছ আপন ভাই, আর এ বলছে দূর সম্পর্ক।'

শিবু বলল, 'স্যার, কারণ আছে। আমরা হলাম দশ ভাই বোন। আমি সবচেয়ে বড়, এ সবচেয়ে ছোট, আমাদের মধ্যে আর আট ভাইবোন আছে। তাই ও বলছে দূর সম্পর্ক।'

এক সর্দারের গল্প (৩)

অনুমান করি সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের গল্পে এখনও পাঠক-পাঠিকারা ক্লান্ত হয়ে পড়েননি এবং সেই ভরসাতেই আরেকটি কিস্তিতে হাত দিচ্ছি। এবং কথা দিচ্ছি, সর্দার কথামালার এটাই শেষ কিস্তি।

শেষ কিস্তির প্রথম আখ্যানটি এক সর্দারজি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে নিয়ে।

এই ট্যাক্সিওলা সর্দারজি আর খুশবন্ত সিং একই গ্রামের লোক। মাঝে মাঝে দিল্লির রাজপথে দু'জনের দেখা হয়, উভয়ে উভয়ের কুশল বিনিময় করেন।

একদিন ট্যাক্সি ড্রাইভার সর্দারজি খুশবন্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন তুমি কোথায় কাজ করছ? কত মাইনে পাচ্ছ?' সর্দার খুশবন্ত সিং তখন বিড়লা বাড়ির পত্রিকা হিন্দুস্থান টাইমসের সম্পাদক, খুশবন্ত এত কথা না বলে সংক্ষেপে বললেন, 'আমি এখন বিড়লাদের ওখানে কাজ করি।' বলা বাহুল্য মাইনের কথাটা উচ্চবাচ্য করলেন না।

কিন্তু ট্যাক্সিওলা সর্দারজি বিড়লাদের কথা শুনেই বললেন, 'আমি যদি বিড়লা হতাম তাহলে বিড়লাদের চেয়েও বড়লোক হতাম।'

খুশবন্ত সিং এই কথা শুনে অবাক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ভাবে?'

ট্যাক্সির সর্দারজি বললেন, 'বিড়লাদের আয় তো আমার থাকতই, সেই সঙ্গে ট্যাক্সি চালিয়ে আরও কিছু আয় বাড়াতাম। তার মানে বিড়লাদের চেয়ে বড়লোক হতাম।'

জ্ঞানপিপাসা বিষয়ে খুশবন্ত সিংয়ের গল্পটি পুরনো, বেশ পুরনো কিন্তু চমৎকার।

একটি বালক, স্কুলের মাঝারি ক্লাসের ছাত্র, তার বাবার কাছে জানতে চাইছে,

'বাবা, এভারেস্টের চূড়ায় প্রথম যারা উঠেছিল তাদের নামগুলো কি ?'

বাবা দু'চারবার 'তেনজি, তেনজি' করে তারপর বললেন, 'পুরো নামগুলো মনে পড়ছে না।'

ছেলে একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা পাঞ্জাবের পাঁচটা নদী যেন কী কী ?'

বাবা এবারও আমতা আমতা করে বললেন, 'ভুলে গেছি, নর্মদা টর্মদা এইসব কী যেন ?'

ছেলেটির জিজ্ঞাসা এর পরেও থামেনি, এরপর সে জানতে চাইল, 'আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম কী ?' তারপরে, 'কোন্ কোন্ ভারতীয় আজ পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ?' এবং তারও পরে 'কোন্ কোন্ ভারতীয় ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারিয়ে পার হয়েছে ?'

দুঃখের বিষয়, এ সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদান বাবার পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে ছেলের মুখে অসন্তোষের ভাব দেখা দিল, তখন বাবা বললেন, 'কিন্তু তুমি থেমো না, তুমি জিজ্ঞাসা করে যাও, যদি জিজ্ঞাসা না করো, কী করে তুমি জ্ঞান অর্জন করতে পারবে ?'

এগুলি সাদামাটা গল্প। খুশবন্ত সাহেবের এইরকম আরেকটা সাদামাটা পুরনো গল্প হল তাঁর এক স্বজাতির আত্মহত্যা করা নিয়ে।

এক সর্দারজি এক হাতে এক বোতল পানীয় এবং অন্য হাতে খাবার ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে রেললাইনের ওপর বসে আছেন।

তাই দেখে রেললাইনের পাশে পথচারী এক ভদ্রলোক বললেন, 'সর্দারজি, আপনি ওভাবে রেললাইনের ওপর বসে থাকবেন না, যে কোনও সময় রেলগাড়ি এসে গেলে আপনি রেলে কাটা পড়ে মারা যাবেন।'

নিরাসক্ত কণ্ঠে সর্দারজি বললেন, 'আমি মারা যেতেই চাই। আমি আত্মহত্যা করতেই এসেছি।'

বিস্মিত পথচারী তখন বললেন, 'তাহলে আপনার সঙ্গে এত সব খাবারদাবার, পানীয় কী জন্যে ?'

সর্দারজি বললেন, 'দেখ আমি আত্মহত্যা করতে এসেছি ঠিকই কিন্তু অনাহারে মরার আমার কোনও ইচ্ছে নেই।'

এ কথা শোনার পর পথচারীর মুখে জিজ্ঞাসাচিহ্ন দেখে সর্দারজি ব্যাখ্যা করে বললেন, 'দেখ রেলগাড়ি কখন আসে না আসে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। হয়তো দেড়দিন, দুদিন এলই না। শেষে কি আত্মহত্যা করতে এসে উপোস করে মারা যাব নাকি। তাই খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।'

গল্পটা লেখার পর মনে হচ্ছে, গল্পটা আগেও একবার আমি লিখেছিলাম। যা হোক, এবার খুশবন্ত সিং মারফত আরেকবার হল। গল্পটা মূলে আমারও নয়। খুশবন্ত সাহেবেরও নয় ; সেই অজ্ঞাত পরিচয় সুরসিক ব্যক্তিটি যিনি ভারতীয় রেল সম্পর্কে এই চমৎকার পরিহাসটি করেছিলেন, এই সুযোগে তাঁকে নমস্কার জানাই।

এসব গল্প তো আছেই কিন্তু খুশবন্ত সিংয়ের বাহাদুরি হল রাজনৈতিক

টিপ্পনিতে।

জোকবুকের একটা গল্পে আছে, ইংলণ্ডের রানি এলিজাবেথকে এক ধুরন্ধর ব্রিটিশ সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা রানিমা, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডি সাহেব আততায়ীর গুলিতে নিহত না হয়ে যদি সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রুশ্চেভ নিহত হতেন, তা হলে কী হত ?'

হার ম্যাজেস্টি ইংলণ্ডের মহামান্যা রাজ্ঞী সাংবাদিকদের ধারেকাছে সচরাচর ঘেঁষেন না। নিয়ম নেই। কিন্তু সেই সময়টা রাজবাড়ির কয়েকটা মুখরোচক খবর নিয়ে কোনও কোনও সংবাদপত্র কিছু কিছু কেচ্ছা করছিল, যা রাজতন্ত্রের পক্ষে মোটেই সম্মানজনক নয়।

এমতাবস্থায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রানিমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'খবরের কাগজের লোকদের চটাবেন না, একটু হাসিখুশি রাখবেন।'

সুতরাং রানিমা এই সাংবাদিককে ঠোঁট উলটিয়ে, ভুরু কুঁচকিয়ে বিদায় না দিয়ে তার প্রশ্নটি একবার মনোযোগ দিয়ে ভেবে নিয়ে বললেন, 'তুমি বলছ কেনেডি মারা না গিয়ে ক্রুশ্চেভ মারা গেলে কী হত ?'

সাংবাদিকটি উৎসাহ করে বললেন, 'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

রানিমা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'দেখ, আমার মনে হয় ওনাসিস মিসেস ক্রুশ্চেভকে বিয়ে করতেন না।'

সর্দার খুশবন্ত সিংয়ের আর একটি অনুরূপ রাজনৈতিক রসিকতা দিয়ে সর্দার কথামালা শেষ করছি।

রসিকতাটি আসলে একটি প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন ঃ মার্কিন যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মিল কোথায় ?

উত্তর ঃ দু দেশের কোথাওই রুবল দিয়ে কিছু কেনা যায় না।

জল

জলই জীবন।

জলের কথা লিখব না, তা হতে পারে না।

ভাতের কথা যে খুব বেশি লিখেছি তা বোধ হয় নয়। কিন্তু একটা কথা সত্যি যে আজ পর্যন্ত যা কিছু হালকা লেখা লিখেছি সমস্তই ভাতের জন্যে। হয়ত সত্যিতর কথাটা হল ঠিক ভাত নয়, এটা ঘিভাতের জন্যে। শিরায় মজ্জায় রক্তে, নাড়িতে পেশীতে ধমনীতে বহমান নিতান্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত বাসনার এই হল প্রাপ্য।

এ সব বাজে কথা আপাতত থাক। এবারের বিষয়বস্তু জল। জলের কথাই বলি।

কিন্তু জলভাতের জল ঠিক সেই জল নয় যে জলের কথা সপ্তদশ শতকের এক ইংরেজ ধর্ম বিশারদ টমাস কুলার বলেছিলেন, 'জলের মূল্য আমরা কখনই বুঝতে

পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না কুয়ো শুকিয়ে যায়।'

এই মহৎ মন্তব্যের আধুনিক ভাষান্তকরণ হওয়া উচিত, জলের মূল্য তখনই বোঝা যায় যখন গলির মোড়ের নলকূপ ভেঙে যায় এবং সেই সঙ্গে নোটিশ বেরয় খবরের কাগজে 'টালা পাম্প আগামী ছত্রিশ ঘন্টা অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকবে।'

আসল কথায় ফিরে আসি।

এই অনুচ্ছেদ শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা ভাল কিংবা মাঝারি ব্যাকরণ জানেন।

বাংলায় আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি শব্দের অনেক সময় অনেক রকম মানে হয়। স্থাবর সংস্কৃতে কিংবা মন্থর প্রাকৃতে ও সুযোগ ছিল না।

'সর্বনাশ! না বুঝে এ কী লিখে ফেললাম। প্রাণাধিকা পাঠিকাঠাকুরানী, তোমার পড়ার পরে আজকের লেখার পাতা পুড়িয়ে কিংবা ছিঁড়ে ফেলে দিও।

তোমার স্বামী বড় পণ্ডিত, এ সব ছেলেখেলা যেন তাঁর নজরে না আসে।'

এতখানি সাবধানতা অবলম্বন করার পর ভয়ে ভয়ে দুয়েকটা কথা বলি।

জলভাত অর্থাৎ জলের জন্য ভাত, জলের দ্বারা ভাত, যা জল তাই ভাত, জল থেকে ভাত এতসব, এ সব কিছু নয় নিতান্তই জল ও ভাত, জলভাত। আলু পটল, রাম রহিম, শরৎ বঙ্কিম, রেখা অমিতাভর মতো সামান্য দ্বন্দ্ব সমাস।

সেই কতকাল আগে জল বিষয়ে মহামতি শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, 'খুব সম্ভব হেনরি ছয় (Henry VI) কিংবা ওই জাতের কোনও নাটকে, 'জল সেখানেই শান্ত-ভাবে হয়ে যায় যেখানে নদী খুব গভীর।'

এই সামান্য জলভাতে অনিবার্য কারণেই ভাতের পরিমাণ কম জলের পরিমাণ বেশি। গরিব গৃহস্থের নুন আনতে যে পান্তা ফুরোয় সে পান্তায় ভাতের বদলে জলই বেশি থাকে।

বেশি জলের একটা গল্প মনে পড়ছে।

সাবেকি গল্প। যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, তাঁদের ধন্যবাদ। যাঁরা জানেন না বা ভুলে গিয়েছেন কিংবা ভুলে গিয়েছিলেন শুধু তাঁদের জন্যে এই বেশি জলের গল্পটা।

মামা ভাগ্নে একসঙ্গে মদ খেত। সত্যের খাতিরে লেখা উচিত মামার কাছেই ভাগ্নে মদ খাওয়া শিখেছিল।

কিন্তু মামাবাবু ছিলেন সেয়ানা মাতাল, সেই যাকে গ্রামেগঞ্জে বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। তিনি পেগ (পানীয়ের ইউনিট) মেপে প্রয়োজনমত জল সোডা বরফ মিশিয়ে ধীরে ধীরে তারিয়ে তারিয়ে চুক চুক করে নিজের মদটুকু খেতেন।

ভাগিনেয় বাবাজী প্রথম প্রথম মামাবাবুর হাতে খড়ি পেয়ে মামাবাবুর আদর্শই অনুসরণ করেছিল।

কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিন, কয়েক মাস। ধীরে ধীরে তার স্বরূপ প্রকাশিত হল।

এবং তার সেই সুপ্রকাশিত স্বরূপ দেখে মামাবাবু বিচলিত হয়ে পড়লেন।

ভাগ্নে তখন আর বরফ, জল কিংবা সোডার ধার ধারে না।

যাকে সাদা বাংলায় বলে কাঁচা, ইংরেজিতে বলে নিট্ কিংবা 'স্ট্রেইট ফ্রম দি বটল, (Straight from the bottle), ভাগ্নের যাত্রা সেই পথে।

কিন্তু একই গেলাসের ইয়ার হলেও হাজার হলেও মামা হাজার হলেও ভাগ্নে। আপন মায়ের পেটের বোনের আপন ছেলে তার এই পরিণতি মামার পক্ষে মেনে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

যখন ভাগ্নে সামনে বসে পান করে, মামা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন গেলাসে পানীয়ের প্রবেশ মাত্র তার মধ্যে প্রচুর সাদাজল ঢেলে দেওয়া। নেহাতই কর্পোরেশনের কলের জল কিংবা গলির মোড়ের টিউবওয়েলের জল। মুখ বিকৃত করে। দাঁতে দাঁত ঘষে ভাগ্নে মামার প্রতি সামাজিক সম্মান প্রদর্শন করার সূত্রে সেই জোলো পানীয় চোখ এবং নাক বুজে খেয়ে নেয়। শুকনো জিভটাকেও একটু গুটিয়ে রাখে। তার জিভে জোলো পানীয়ের স্বাদ লাগে না। এইভাবে দিনকাল, মামা-ভাগিনেয়ের মদ্যপান ভালই চলছিল। একদিন, শুধু একদিন গোলমাল হল।

ভাগিনেয় বাবাজী সহসা বুকে বিস্তর ব্যথা নিয়ে একদিন গভীর রাতে নিজের বাড়ির এবং প্রতিবেশিদের নিদ্রাভঙ্গ করে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে হাসপাতাল যাত্রা করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে খবর পেয়ে মামাবাবু হাসপাতালে ভাগ্নেকে দেখতে গেলেন।

এর পরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত, কিঞ্চিৎ আলাপ

মামা ঃ তোর কী হয়েছে ?

ভাগ্নে ঃ বুকে জল জমে গেছে।

মামা ঃ কী করে বুকে জল জমলো ?

ভাগ্নে ঃ তুমি সবচেয়ে ভাল জান।

মামা ঃ আমি সবচেয়ে ভাল জানি ?

ভাগ্নে ঃ হ্যাঁ। তুমি জান। তুমি সবচেয়ে ভাল জান। তুমি বার বার আমার ড্রিঙ্কে জল মেশাতে। বলতে, বলতে জল বেশি করে নিতে।

মামা ঃ কিন্তু তাতে কী হয়েছে ?

ভাগ্নে ঃ কী আর হয়েছে। বুকে জল জমে গেছে। এতদিন যা কিছু মদ খেয়েছিলাম সব বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে, শুধু তুমি যে জলটুকু দিয়েছিলে সবটা বুকে বসে গেছে।

একটু আগের জলের গল্পটা বড় নির্জলা। এতক্ষণ পরে একটা জলো জলো গল্প বলি। জলের গল্প তারপরেই শেষ।

গল্পটা অকল্পনীয়। সে কবিও নেই সে দারোগাও নেই।

দারোগা সাহেব মাতাল কবিকে ফুটপাত থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে পরপর দুটি বাটিতে একটায় নিতান্ত পরিচ্ছন্ন গভীর নলকূপের জল অন্যটিতে ভাল রাম ছয় আউন্স রেখে কবিকে বললেন, 'একটা গরুকে যদি বলি তাহলে সে কোনটা খাবে !' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে দারোগা সাহেব বললেন, 'গরুটা

রাম ছোঁবে না, জলটা খাবে।'

কবি মাথা তুলে বললেন, 'সেই জন্যেই সে গরু, আর সেই জন্যেই আমি কবি।'

বইপত্র

সম্প্রতি মার্কিন দেশ থেকে এক সংবাদ প্রচারিচত হয়েছে যে সেখানে বাইবেল চুরির খুব হিড়িক পড়েছে।

বই চুরি যাওয়া খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমাদের অনেকেরই বই চুরি গেছে এবং এখনও যায় এবং আরও বড় কথা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আমরা প্রত্যেকেই বই চুরি করি। আমার বাড়িতে কতগুলি বই আছে তার সমস্তই কি আমার নিজের কেনা।

তবে যতরকম বই চুরি যায় তার মধ্যে বাইবেল চুরির মাত্রাটা একটু বেশি। তার একটা কারণ অবশ্য এই যে বাইবেল গ্রন্থটি চুরি করা বেশ সহজলভ্য খ্রিস্টান সমাজে। এমনভাবে নানা প্রকাশ্য স্থানে রেখে দেওয়া হয় যাতে চুরি করতে বা নিয়ে নিতে ইচ্ছে করে। গির্জা বা খ্রিস্টান সাধুরা হয়তো এ জন্যেই নানা জায়গায় বাইবেল ছড়িয়ে রাখেন লোকেরা যাতে এই ধর্মগ্রন্থটি পাঠ করে এবং তারপরে নিয়ে নিতে চায় তো তাতে আপত্তি নেই।

বহুকাল আগে আমি নিজেও একটি বিলিতি হোটেল থেকে বাইবেল সরিয়েছিলাম। সেই পুণ্য গ্রন্থটি এখনও আমাদের বাড়িতে আছে। তবে আমার এই বাইবেল সরানোর ব্যাপারটা খুব সম্ভব চুরি বলা যাবে না, কারণ হোটেলে আমার ঘরের টেবিলে বইটি রাখা ছিল এবং সুদৃশ্য, সুমুদ্রিত গ্রন্থটির জ্যাকেটে লেখা ছিল, লাল কালির স্ট্যাম্প দিয়ে, 'ইচ্ছে হলে নিতে পার।'

সুতরাং আমার আর দোষ কী?

বাইবেলের পর বেদের কথায় আসি।

বাইবেলের মতো বেদের ছড়াছড়ি নেই আমাদের দেশে, সে কাজ করছে রামায়ণ-মহাভারত।

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে পড়ে। সবাই জানে, বেদ চার রকমের, ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব। এর মধ্যে ঋগ্বেদ সবচেয়ে পুরনো। বেদকে বলা হয় অপৌরুষেয়, অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত।

হিন্দু ব্রাহ্মণের ভাগ ও বেদানুসারে, যথা ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদি।

বেদের পঠনপাঠনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রম প্রয়োজন। দ্বিবেদী, ত্রিবেদী ইত্যাদি উপাধি প্রচলিত আছে।

যে পণ্ডিতপ্রবর মাত্র একটি বেদ জানেন তাঁর কোনও উপাধি প্রাপ্য নয়। কিন্তু যিনি দুটি বেদ জানেন তিনি দ্বিবেদী, অনুরূপভাবে যিনি তিনটি বেদে পণ্ডিত তিনি ত্রিবেদী এবং চারটি বেদেই যিনি সুপণ্ডিত তিনি চতুর্বেদী।

যদিও বাঙালির মধ্যেও কিছু কিছু আছে, তবু এই উপাধিগুলি উত্তর

ভারতীয়।

এই উপাধি সংক্রান্ত একটি হাল্কা গল্প একবার এলাহাবাদে শুনেছিলাম।

এলাহাবাদের একটি পুরনো মাসিক পত্রিকায় সঞ্জয় ত্রিবেদী নামে এক ভদ্রলোকের একটি গল্প ছাপা হয়েছিল। ছাপার ভুলবশত গল্পে লেখকের নাম সঞ্জয় ত্রিবেদী না হয়ে সঞ্জয় দ্বিবেদী মুদ্রিত হয়।

যে কোনও লেখকই দুঃখিত হন তাঁর লেখা ভুল ছাপা হলে। আর সেই লেখকের নিজের নামই যদি ভুল ছাপা হয় তা হলে তো কথা নেই।

একদা মফস্বলের এক লিটল ম্যাগাজিনে আমার নিজেরই নাম ছাপা হয়েছিল তাড়াপদ রায়, জানি না সেই লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের এই নাম ভুল ছাপানো ইচ্ছাকৃত কিনা। আমার প্রতি কোনও কটাক্ষ কিনা, কিন্তু আমি খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম ব্যাপারটায়, সম্পাদককে লিখেছিলাম, তারাপদ বানানে যদি ড় ব্যবহার করলেন, রায় দোষ করল কী? রায় ছাপতে অসুবিধা কী ছিল?'

সে যা হোক সঞ্জয়বাবুর গল্পে ফিরে আসি।

ত্রিবেদী থেকে দ্বিবেদী অধঃপতিত হয়ে দুঃখিত সঞ্জয়বাবু ওই পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সম্পাদক মহোদয় এই মুদ্রণ প্রমাণের কথা শুনে বললেন, 'ও এই ব্যাপার। এতে কী হয়েছে? কোনও দুঃখ করবেন না। দিন, আমাকে তাড়াতাড়ি আরেকটা গল্প দিন। সব পুষিয়ে দিচ্ছি।'

এক সপ্তাহের মধ্যে সঞ্জয় ত্রিবেদী আর একটি গল্প দিয়ে এলেন এবং সেই মাসিক পত্রিকার পরের সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হল।

কিন্তু এবার ঘটনা আরও মারাত্মক। সঞ্জয় ত্রিবেদীর নাম এবার সঞ্জয় চতুর্বেদী ছাপা হয়েছে।

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আগে দ্বিবেদী ছাপা হয়েছিল এবার চতুর্বেদী ছেপে ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই পুষিয়ে দিয়েছেন বিজ্ঞ সম্পাদক মহোদয়।

সঞ্জয়বাবু এবারেও প্রতিবাদ জানাতে সম্পাদক সরল অঙ্ক করে দেখিয়ে দিলেন,

দ্বিবেদী + চতুর্বেদী = ত্রিবেদী + ত্রিবেদী

* * * *

সঞ্জয় ত্রিবেদীর গল্পের পরে এবার একটু নিজের কথাও লিখি। আমিও একজন সামান্য লেখক, নিতান্ত গ্রন্থকার। বইপত্র নিবন্ধে নিজেকেও একটু ঢুকিয়ে রাখি।

বইমেলার গল্প। বইপত্রে খুব বেমানান হয়তো হবে না।

যেমন হয় বইমেলার ধুলোওড়া জনঅরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। দৃশ্যত আমার মুখাবয়ব বহু পরিচিত নয় ফলে ভিড়ের মধ্যে সহজে মিলে যেতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না, হওয়ার কথাও নয়, আমি তেমন নামজাদা লোক নই।

কিন্তু সেদিন বইমেলায় সহসা এক ভদ্রমহিলা আমার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনার নাম তারাপদ রায় না?'

ভদ্রমহিলা নতুন যুগের ছিমছাম আধুনিকা তরুণী, চোখে কৌতুক, ওষ্ঠে

হাসি। আমারও কেমন যেন কৌতুক করতে ইচ্ছে হল, আমি বললাম, 'না, দেখুন আমি তারাপদ রায় নই তবে আমি অনেকটা দেখতে তারাপদ রায়ের মতো। অন্তত কেউ কেউ তাই ভাবে।'

ভদ্রমহিলা স্মিত হাস্যে বিদায় নিচ্ছিলেন, সহসা আমার খেয়াল হল ভদ্রমহিলা হয়তো আমার কোনও অনুরাগিণী, মুগ্ধা পাঠিকা। আমার ভাগ্যে এ রকম তো খুব বেশি হয় না, তাই ভদ্রমহিলার পথ আগলিয়ে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেখুন আপনি কি তারাপদ রায়ের কোনও অনুরাগিণী পাঠিকা?'

ঝলমল করে হেসে উঠলেন তিনি, তারপর চপল কণ্ঠে বললেন, 'না। আমি তারাপদ রায়ের কোনও অনুরাগিণী পাঠিকা নই, তবে তারাপদ রায়ের কোনও অনুরাগিণী পাঠিকার মতো আমি দেখতে।'

তারপর ধূলিধূসর অপরাহ্নে তাঁর রঙিন শাড়ির আঁচল বিস্তার করে লোক-জনের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যেতে যেতে তিনি আবার বললেন, 'অনেকটা তারাপদ রায়ের পাঠিকার মতো। অন্তত কেউ কেউ তাই ভাবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন

জলভাত একেক সময় খুব হালকা আর তরল হয়ে যাচ্ছে। জলের পরিমাণ বেশি হলে জোলো হবে এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তবু এবার আমরা একটু রাস্তা বদল করছি, এবার আমাদের পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভরসা।

সংস্কৃত সাহিত্যের টিকাকারেরা বলেছিলেন, 'উপমা কালিদাস্য'। একালের অবিস্মরণীয় লেখক, রামকৃষ্ণ জীবনীকার স্বর্গত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'উপমা রামকৃষ্ণস্য।'

সরাসরি রামকৃষ্ণদেবের দুয়েকটা চিরচেনা সরস গল্প দিয়ে শুরু করি।

মায়াকে যদি চিনতে পার আপনি লজ্জায় পালাবে। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল।

যাকে ভয় দেখাচ্ছে, সে বললে, 'আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে।' তখন সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

পরের গল্পটি আরও চমকপ্রদ।

ছুতোরদের মেয়েরা চিঁড়ে বেচে। তারা কতদিক সামলে কাজ করে।

ঢেঁকির পাট পড়ছে। এক হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে। আর এক হাতে ছেলেকে কোলে কোরে মাই দিচ্ছে।

আবার খদ্দের এসেছে। ঢেঁকি এদিকে পড়ছে, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও চলছে। খদ্দেরকে বলছে, তাহলে তুমি যে কয় পয়সা ধার আছে, সে কয় পয়সা দিয়ে যেয়ো আর জিনিস নিয়ে যেয়ো।

ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢেঁকি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলা একসঙ্গে করছে।

কিন্তু পনর আনা মন ঢেঁকির পাটের দিকে রয়েছে পাছে হাতে পড়ে যায়।

আর বাকি এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া, খদ্দেরের সঙ্গে কথা কওয়া।

না হলে সর্বনাশ।

ঢেঁকির পাটে হাত পড়ে যাবে।

শুধু উপমা বা গল্প নয়, কথনভঙ্গি, বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা সেখানেও রামকৃষ্ণ অতুলনীয়, বিশ্বের সেরা কথাসাহিত্যিক রামকৃষ্ণের কাছে শিখে নিতে পারেন কী করে কী ভাবে কিসের কথা বলতে হয়। কী ভাবে বললে লোকে বুঝবে, শুধু বুঝবে তাই নয় কথাটা লোকের হৃদয়ঙ্গম হবে।

একাধিক সংক্ষিপ্ত উদাহরণ হাতের কাছেই উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী শান্তরূপানন্দের 'উপদেশাবলী' পুস্তিকায় রয়েছে।

যেমন,

ক) যদি গঙ্গার কাছে গিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে কেউ বলে—গঙ্গা দর্শন স্পর্শন করে এলাম, তা হলেই হলো। সব গঙ্গাটা হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁতে হয় না।

খ) যতক্ষণ না হাটে পেঁছিনো যায় ততক্ষণ দূর হতে শুধু হো হো শব্দ। হাটে পেঁছালে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট দেখতে পাবে, শুনতে পাবে।

'আলু নাও।' 'পয়সা দাও।' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

গ) এক মার পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছের নানা রকম ব্যঞ্জন করেছেন—যার যা পেটে সয়। কারো জন্যে মাছের পোলোয়া, কারো জন্যে মাছের অম্বল, মাছের চচ্চড়ি, মাছ ভাজা, এই সব করেছেন। যেটি যার ভাল লাগে। যেটি যার পেটে সয়—বুঝলে?

* * *

ঈশ্বর ব্যাপারটা আমি ভাল বুঝি না। অল্প বয়সে হালকা কবিতায় ঈশ্বরকে নিয়ে অল্পবিস্তর ঠাট্টা তামাশা করেছি, তবে সেও অনেকদিন আগের কথা।

ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় রামকৃষ্ণ কথায় ঈশ্বরকে উল্লেখ না করে উপায় নেই।

কিন্তু এ ঈশ্বর (রামকৃষ্ণের ঈশ্বর) সে ঈশ্বর নয়। এ ঈশ্বর পাশের বাড়ির মেয়ে, অকালমৃত বাল্যবন্ধু। ভালবাসার আত্মীয়।

দুয়েকটা উদাহরণ অবান্তর হবে না।

প্রথম উদাহরণে ঈশ্বর বা ভগবান বড়লোকের মেয়ে।

রামকৃষ্ণ বলেছেন,

'চিকের ভেতর বড়লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখতে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখতে পায় না।

ভগবান ঠিক সেই রূপে বিরাজ করছেন।

অন্য এক জায়গায় বলেছেন, যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না তেমনি মনস্থির না হলে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না।

এই সূত্রে অপ্রাসঙ্গিক, তবুও রামকৃষ্ণের একটা অবিস্মরণীয় নির্দেশ আবার স্মরণ করছি।

'সংসারে নষ্ট মেয়ের মত থাকবে। মন উপপতির দিকে, কিন্তু সে সংসারের সব কাজ করে।'

শুধু রামকৃষ্ণের উপমাই পারে ঈশ্বরকে উপপতির সঙ্গে তুলনা করতে।

অতঃপর রামকৃষ্ণ কথিত একটি গুরুশিষ্য সংবাদ উপস্থাপন করি একটু কাটছাঁট করে কথিকার আকারে—

শিষ্য ঃ কেমন করে ভগবানকে পাবো ?

গুরু ঃ আমার সঙ্গে এসো।

গুরু শিষ্যকে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন এবং খানিকটা পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন।

গুরু ঃ তোমার জলের ভেতর কেমন হয়েছিল ?

শিষ্য ঃ প্রাণ আটুবাটু করছিল—যেন প্রাণ যায়।

গুরু ঃ দেখ, ভগবানের জন্যে যদি তোমার প্রাণ এরকম আটুবাটু করে তবেই তুমি তাকে লাভ করবে।

কথিকার পরে রামকৃষ্ণের একটা চমৎকার গল্প বলি, প্রায় হুবহু স্বামী শান্তরূপানন্দের ভাষায়।

একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল। কুটুমবাড়ি তত্ত্ব করতে হবে, কী কী জিনিস লেখা ছিল।

জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি তখন খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন।

অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে চিঠিখানা পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নেই।

কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানা হাতে নিলেন আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে।

লেখা এই, 'পাঁচ সের সন্দেশ পাঠাইবে। একখানা কাপড় পাঠাইবে,…' আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নেই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরোলেন।

চিঠির দরকার কতক্ষণ ?

যতক্ষণ সন্দেশ, কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তার পরই পাবার চেষ্টা।

শেষ

আমাদের প্রকাশিত

এই লেখকের

চারাবাড়ি পোড়াবাড়ি

খাঁচাছাড়া

রস ও রমণী